BARDAN

by Prem Chanda

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ ১৩৬৬

প্রচ্ছদ : সমীর আইচ

পত্রপুট

প্রকাশিকা / সান্ত্বনা দে, পত্রপুট, ৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক / বিজয় চক্রবর্তী, মুদ্রণায়ন, ৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রতিটি সাহিত্যপ্রেমীর উদ্দেশ্যে—

বরদান প্রসঙ্গে ছুটি কথা

হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম এবং বস্তুনিষ্ঠ কথাশিল্পী, যিনি তাঁর কালকে অতিক্রম করে আগামী কালকেও গভীর মমতা এবং বোধ নিয়ে স্পর্শ এবং আলোড়িত করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন প্রেমচন্দ। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'জীবনসার'-এ লিখেছেন, "উপন্যাস তো আমি লিখতে শুরু করি ১৯০১ থেকে। আমার প্রথম উপন্যাস ১৯০২-এ এবং দ্বিতীয় উপন্যাস ১৯০৪-এ প্রকাশিত হয়। ১৯০ সালের আগে আমি কোন দিন গল্প লিখিনি।"

কিন্তু তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে ১৯০২ এবং ১৯০৪ সালে প্রকাশিত এই উপন্যাস ছুটির কোন নাম উল্লেখ করেননি।

'বরদান' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ দীর্ঘ দিন পরে ১৯৫৫ সালে সরস্বতী প্রেস, বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকের যে বক্তব্য এই সংস্করণে ছাপা হয়, তা থেকে জানা যায় এই উপন্যাসের রচনাকাল ১৯০৫ থেকে ১৯০৬-এর মধ্যে। কিন্তু প্রকাশক এই উপন্যাসের প্রকাশকাল সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

ডঃ রামরতন ভটনাগর 'বরদান'-এর রচনাকাল সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোন বক্তব্য হাজির করেননি। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'প্রেমচন্দ'-এ 'বরদান'-এর প্রকাশ কাল ১৯০২ বলেছেন। কিন্তু তাঁর অন্য একটি গ্রন্থ 'কলাকার প্রেমচন্দ' গ্রন্থে বলেছেন, ১৯০১ সালে প্রকাশিত 'প্রতাপচন্দ-ই পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯০ সালে 'বরদান' নামে প্রকাশিত হয়।

প্রখ্যাত বামপন্থী কথাশিল্পী ও প্রাবন্ধিক হংসরাজ রহবর 'প্রেমচন্দ: জীবন ও কৃতিত্ব'—এই গ্রন্থে 'বরদান' সম্পর্কে, বিশেষ করে তার রচনাকাল সম্পর্কে বিতর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন, খুব সম্ভব এই উপন্যাস ১৯০৫ থেকে ১৯০৬ সালের মধ্যে লেখা হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাস কখন প্রকাশিত হয়, সে সম্পর্কে তিনি কোন রকম বক্তব্যই রাখেননি।

হরস্বরূপ মাথুরের মতে, বরদান (১৯০৪) হচ্ছে প্রেমচন্দর প্রথম দিককার রচনা। কালক্রম অনুযায়ী এই উপন্যাস প্রেমা বা প্রতিজ্ঞার পর প্রকাশিত হয়। প্রতিজ্ঞার পরিমার্জিত যে রূপ, সেই রূপের সঙ্গে যদি বরদানের তুলনা করা যায়, তবে দেখা যাবে এই উপন্যাসের যে প্রৌঢ়ত্ব, সেই প্রৌঢ়ত্ব বরদানের

তত বেশী নয়। প্রেমচন্দর উপন্যাসের কাঠামো, গতি-প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুর বিকাশকে যদি অধ্যয়ন করা যায়, তবে অনায়াসে বোঝা যায় 'বরদান' প্রতিজ্ঞার আগে লেখা।

প্রেমচন্দর পুত্র এবং শক্তিমান কথাশিল্পী অমৃত রায় 'বরদান'-এর রচনা-কালকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, 'বরদান'-এর প্রকাশকাল, ১৯২১।

তিনি বলেন, 'বরদান' প্রেমচন্দর উর্দু উপন্যাস 'জলবএ-ইসার'-এর হিন্দি রূপান্তর। এই রূপান্তর তাঁর লিখিত অন্যান্য উপন্যাসের মতো তিনি নিজেই করেন। উর্দু সংস্করণের প্রকাশকালের প্রায় বারো বছর পর, ১৯২১ সালে এই উপন্যাস গ্রন্থভাণ্ডার, বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়।

লেখকের পক্ষ থেকে প্রকাশককে যে অনুমতিপত্র দেয়া হয়, তার তারিখ, ১৮ অক্টোবর, ১৯২০। মে, ১৯২১-এ প্রকাশিত অন্য একটি গ্রন্থের Back Cover-এ 'বরদান'-এর বিজ্ঞাপন ছিল। সুতরাং এর থেকে 'বরদান'-এর প্রকাশকাল এবং রচনাকালের একটা সময় কিছুটা অনুমান করা যায়।

'বরদান'-সম্পর্কে এই কথাগুলি বলা একান্ত প্রয়োজন। কারণ 'বরদান' প্রেমচন্দর প্রথম দিককার লেখা। তাই তিনি তখনও দক্ষ ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেননি। কিন্তু তা সত্বেও বলা যায়, 'বরদান'-এ তিনি সমসাময়িক কাল, এবং সেই কালের মধ্যবিত্ত সমাজকে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে যে খামতি আছে, সে খামতি প্রেমচন্দর নয়। খামতি সমসাময়িক কালের যে অনুভব এবং বোধ, সেই অনুভব এবং বোধের।

'বরদান' হচ্ছে সমসাময়িক কালের মধ্যবিত্ত সমাজের আংশিক রূপ। এই আংশিক বা খণ্ডিত রূপ থেকে, সমসাময়িক কালের সমাজ, তার দ্বন্দ্ব এবং প্রজ্ঞাকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। তিনি সমসাময়িক কালের সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত এবং তার সার্বিক অভীপ্সাগুলি তেমন ভাবে তুলে না ধরে বরং গল্পের আমেজের ওপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। সমস্যাগুলিকে তিনি শুধু আলতোভাবে স্পর্শ করেছেন, কিন্তু তার গভীরে প্রবেশ করেননি। তিনি সমস্যাগুলির দিকে ইঙ্গিত করে কর্তব্য এবং আদর্শকেই মহান করে তুলেছেন।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, তা হচ্ছে শহরের মধ্যবিত্ত সমাজকে তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবন, গ্রামীণ সমাজ এবং গ্রামীণ মানুষগুলি। পড়তে পড়তে বিস্মিত হতে হয়। বোঝা যায়, এই জীবনের সঙ্গে তিনি কতো গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

গ্রামীণ জীবনের হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের মধ্যেও তিনি এই জীবনের যে সত্যিকার আদল এবং ব্যথা তা 'বরদান'-এ অল্প হলেও ,অত্যন্ত গভীর মমতা এবং বোধ নিয়ে উপস্থিত করেছেন।

'বরদান' উপন্যাসকে প্রেমচন্দ তাঁর কাহিনীর দেহের মধ্যে—কর্তব্য এবং প্রেমের যে স্বাভাবিক দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বকেই অত্যন্ত সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন। প্রেমের উপর কর্তব্যের সুমহান বিজয় পতাকা ওড়ানোই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সেই অভিপ্রায় অত্যন্ত সার্থক ভাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন।

হিন্দি সাহিত্য জগতের সমালোচকরা এই উপন্যাসকে মধ্যবিত্ত সমাজের খণ্ডিত জীবন-চিত্র বলে যথার্থ ভাবে উল্লেখ করে প্রেমচন্দর সাহিত্যসাধনার সত্যিকারের যে মূল্যায়ণ, সেই মূল্যায়ণই করেছেন।

কমলেশ সেন

নিবিড় অন্ধকারে বিশাল বিন্ধ্যাচল পর্বত কালদেবের অবয়ব ধারণ করেছে। পর্বতের গায়ে জন্মে আছে অসংখ্য গুল্ম। পর্বতের ওপরের দিকে অষ্টভুজা দেবীর মন্দির। মন্দিরের চুড়োর কলসের ওপর শ্বেত-পতাকাগুলো হাল্কা হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে। মনে হচ্ছে গুল্মগুলো কালদেবের জটাজুট আর মন্দিরের চুড়োটি ওঁর মস্তক। মন্দিরের মধ্যে একটা প্রদীপ ঝিকমিক করে জ্বলছে—যেন দূর আকাশের গায়ে এক অস্পষ্ট তারকা।

অর্ধরাত্রি পার হয়ে গেছে। চারিদিক ঘিরে ভয়াবহ স্তব্ধতা। গঙ্গার কালো তরঙ্গ নীচে সমুদ্র প্রবাহে সপাটে আছড়ে পড়ছে। আর এই দুই প্রবাহের সঙ্গমে উঠছে এক অনবদ্য মনোহর ধ্বনি। জলের বুকে এদিক ওদিক নোঙর করা নৌকোগুলোর ও তীরের আশেপাশে মাঝিমাল্লাদের উনুনের আগুন ঝিলিক দিচ্ছে। অষ্টভুজা দেবীর মন্দিরের সামনে এই সময় এক নারীকে হাত জোড় করে বসে থাকতে দেখা গেল। পরনে শুভ্র বসন। প্রৌঢ় মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে। হাবেভাবে সদ্বংশীয়া বলেই মনে হচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে মাথা নুইয়ে বসে থাকার পর স্ত্রীলোকটি কথা কইলেন—মাগো, আজ বিশ বছরে এমন একটি মঙ্গলবারও যায়নি যেদিন আমি তোমার চরণের সেবা করিনি। তুমি জগত্তারিণী মহারাণী। তোমার এত সেবা করার পরও আমার মনের অভিলাষ আজও পূর্ণ হল না। তোমায় ছেড়ে আমি আর কোথায় যাবো মা? শতশত ব্রতপূজা করেছি। হেন দেবতা নেই যাঁর আরাধনা আমি করিনি। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি পাগলের মতো। তবু আমার মনোরথ পূর্ণ হয়নি। শেষে তোমার চরণে এসে ঠাঁই নিয়েছি। আর তো কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই। শুনেছি সদাই তুমি

তোমার ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আমি তোমার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হব মা?

অনেকক্ষণ ধরে সুবামা একইভাবে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। হঠাৎ ওর সমস্ত চেতনাকে শিথিল করে অচৈতন্যের লক্ষণগুলো ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠল। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। কানের মধ্যে বেজে উঠল এক অলৌকিক ধ্বনি:

—সুবামা, তোমার প্রার্থনায় আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। যা বর চাও প্রার্থনা কর।

সুবামা—যা বর চাই তাই পাব মা আমি?

—হ্যাঁ, তাই পাবে।

সুবামা—কঠিন তপস্যা করেছি আমি। তাই বেশ বড় রকমেরই বর প্রার্থনা করব।

—কি বর চাইবি? কুবেরের ধন?

—না।

—ইন্দ্রের বল?

—না।

—সরস্বতীর বিদ্যা?

—না।

—তবে, কি চাস তুই?

—সংসারে যা উত্তম বস্তু, তাই।

—সেটা কি?

—সুযোগ্য পুত্রসন্তান।

—যে কুল আলো করবে?

—না।

—যে পিতা-মাতার পরম সেবক হবে?

—না।

—তাহলে, সুযোগ্য পুত্র তুই কাকে বলিস?

—যে নিজের দেশের উপকার করবে।

—ধন্য তোর বিচার, ধন্য তোর বুদ্ধি। তোর ইচ্ছা পূর্ণ হবে মা।

২

মুন্সী শালিগ্রাম কাশীর বনেদী বড়লোক। প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী শালিগ্রাম পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ওকালতি। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে তাঁর আকাশচুম্বী প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বার্ষিক আয় পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা হওয়া সত্ত্বেও উদারহৃদয় অমিতব্যয়ী শালিগ্রামের ব্যায়সঙ্কুলান হত না। সাধু-ব্রাহ্মণদের প্রতি উনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ওঁর অর্জিত অর্থের সিংহ ভাগই স্বয়ং ব্যয় করতেন ব্রাহ্মণভোজন, সাধু সৎকার এবং সৎকর্মে। শহরে কোন সাধুসজ্জনের আগমন ঘটলেই যেন স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি হতেন মুন্সী শালিগ্রামের অতিথি। সংস্কৃত সাহিত্যে ওঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের যাথার্থ্যের কাছে তাবড় তাবড় পণ্ডিতেরাও পরাজয় মানতেন। বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের অনুরাগী শালি-গ্রামের বৈরাগ্য সাধনই ছিল প্রবৃত্তি।

স্বভাবগত কারণেই শালিগ্রাম ছোট ছেলেমেয়ের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। পাড়ার প্রত্যেকটি ছোট ছেলেমেয়েই তাঁর অকৃপণ স্নেহের শরিক। বাড়ি থেকে বেরুলেই একদল ছোট্ট ছেলে তাঁর সঙ্গ নিত। যতদূর সম্ভব তাঁর পেছন পেছন ছুটত। একবার এক নির্দয় মা তার কোলের ছেলেটিকে বেদম প্রহার করছিল। ছেলেটি ডুকরে ডুকরে কাঁদছে দেখে তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মায়ের সামনে মাথা নুইয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লজ্জায় স্ত্রীলোকটি সেদিন থেকে তার ছেলেকে না মারার শপথ নিয়েছিল। অন্যের সন্তানের প্রতি যে মানুষটির এত স্নেহ—নিজের সন্তানের জন্য তাঁর যে কতখানি ভালবাসা তা অনুমানের অতীত।

ঘর আলো করে যেদিন তাঁর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল, মুন্সী শালিগ্রাম সেদিন থেকে তাঁর সব কাজ থেকে দূরে সরে, ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন। কখনো তাকে দোলনায় দোলাতে দোলাতে প্রসন্নমুখে

তার দিকে অপলক চেয়ে থাকেন। আবার কখনো তাকে একটা খেলনার রেলগাড়িতে চাপিয়ে নিজেই তা টানতে থাকেন। একটি মুহূর্তও তাকে কাছছাড়া করেন না। পুত্রস্নেহে তিনি যেন আকণ্ঠ ডুবে গেছেন।

ছেলের নাম রেখেছিল সুবামা, প্রতাপচন্দ্র। নামের মতোই ছেলে গুণের আধার। প্রতিভাশালী। কন্দর্পকান্তি। ওর সুন্দর মুখের সুমধুর বোল শ্রোতাদের মন কাড়ে। উজ্জ্বল ললাট ওর অমিত তেজেরই পরিচায়ক। অদ্ভুত এক আকর্ষণী শক্তি এই এতটুকু শিশুর। যে দেখে সেই-ই মুগ্ধ হয়।

হেসে খেলে ছটা বছর পেরিয়ে গেল। প্রতাপচন্দ্রের বয়স এখন ছয়। সুখের দিন হাওয়ার মত কোথা দিয়ে ভেসে যায় কেউ তা টেরও পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের দিন, আর বিপত্তির রাত। ও যেন কেটেও কাটতে চায় না। কদিনই বা হল প্রতাপের জন্ম হয়েছে। গৃহে নবজাতকের শুভাগমনে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে যে মঙ্গলধ্বনি সেদিন বেজে উঠেছিল তার মনোহারিণী সুর আজও যেন কানে বাজছে। ছটা বছর শেষ হতে না হতেই, শুরু হল দুর্দিনের।...মুন্সী শালিগ্রামের সাংসারিক সম্পর্কটা ছিল একেবারেই লোকদেখানো বাইরের ব্যাপার। আসলে তিনি নিষ্কাম এবং সম্পর্কহীন জীবন যাপনই করতেন। বাইরে থেকে তাঁকে দেখে মনে হত সংসারের সুখেদুঃখে আর পাঁচজন গৃহী মানুষের মতোই তিনি সমান ভাগীদার। আসলে তিনি কিন্তু এমনই এক মহান আনন্দময় শান্তির সুখে সদাই ডুবে থাকতেন, যেখানে দুঃখের ক্লেশ সুখের আনন্দ কোন কিছুরই প্রভাব পড়ত না। সংসারে থেকেও তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী।

মাঘ মাস। প্রয়াগে কুম্ভমেলা শুরু হয়েছে। রেলগাড়িতে মানুষ পঙ্গপালের মত ঝাঁক বেঁধে প্রয়াগে চলেছে। অশীতিপর বৃদ্ধ, সুদূর হিমালয় থেকে ছুটে আসা সাধু-সন্ন্যাসীর দল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গঙ্গার পবিত্র তরঙ্গে অবগাহন করার জন্য মানুষের এই মহামিলন তীর্থ কুম্ভমেলায় ছুটে চলেছে।...মুন্সী শালিগ্রামের মনেও প্রয়াগে

যাবার বাসনা তীব্র হয়ে উঠল। সুষমাকে ডেকে বললেন—কাল মহাস্নান। জান কি তুমি?

সুষমা—হ্যাঁ, সারা পাড়া একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। জনমানুষের সাড়া মেলা ভার।

মুন্সী—তুমি তো রাজি হচ্ছ না কিছুতে। হলে বড় আনন্দ পেতাম। এতবড় মেলা তুমি কখনো দেখেছ বলে তো মনে হয় না।

সুষমা—দেখেও আমার কাজ নেই। এমন মেলায় যেতে আমার বড় ভয় করে।

মুন্সী—আমার মন কিছুতে মানছে না সুষমা। যখন থেকে শুনেছি স্বামী পরমানন্দজী মেলায় এসেছেন সেই থেকে ওঁর দর্শন-ইচ্ছায় আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সুষমা প্রথমে স্বামীর যাওয়ার ব্যাপারটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। আমলও দেয়নি। কিন্তু যখন দেখল হাজার বাধা দিলেও বাধা তিনি মানবেন না কিছুতেই, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল। সম্মতি পেয়ে সেইদিনই রাত এগারটার ট্রেনে শালিগ্রাম প্রয়াগ যাত্রা করলেন। যাবার সময় প্রতাপকে চুমো খেয়ে স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সুষমা দেখল স্বামীর চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছে। চৈত্র মাসের শেষে কালবোশেখীর ঝড়ে কৃষকের বুক যেমন কেঁপে ওঠে তেমনি স্বামীর সজল চোখ সুষমার বুকে কাঁপন ধরালো। অশ্রুর এক কণা, ত্যাগ আর বৈরাগ্যের যেন অগাধ সমুদ্র। শুধু এক ফোঁটা চোখের জল, তবু তা গভীর আর সুদূরপ্রসারী। মুন্সী শালিগ্রাম বাড়ির বাইরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস পড়ে সুষমার। কে যেন ওর অন্তস্তল থেকে বলে উঠল—ইহজনমে স্বামীর দর্শন আর তুই পাবি না সুষমা।

প্রথম দিন কাটল, তারপর দ্বিতীয় দিন। চতুর্থ দিন এল, রাতও কেটে গেল। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় পুরো সপ্তাহটা পার হয়ে গেল—তবু স্বামীর দেখা নেই। সুষমা আকুল হল। লোকজন রাতদিন ছুটোছুটি করতে লাগল ওঁর খবর আনার জন্য। কিন্তু কাকস্য

পরিবেদনা। খবরই মেলে না কোন। পরের সপ্তাহও পার হল খোঁজ-খবরে। মুন্সীজীর ফিরে আসার শেষ আশাটুকুও শেষে নির্বাপিত হল। ওঁর এই হঠাৎ নিরুদ্দেশে শুধু আত্মীয়বর্গ ই নয়, শহরের পরিচিত সকল মানুষই শোকাকুল হয়ে উঠেছে। হাটে বাজারে শহরের সর্বত্র এবং অন্দরমহলে শালিগ্রামের নিরুদ্দেশের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। বাচ্চারা যে পথে তাঁর সঙ্গে ছুটে বেড়াত, শূন্য পড়ে আছে। অবোধ বালকদের কে বোঝাবে তাদের সুখের দিন আজ গত হয়েছে। ওরা শুধু কাঁদে আর মায়েদের কাছে বায়না ধরে ওঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য। ওদের সঙ্গে মায়েরাও মুখে আঁচল চেপে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। যেন তাদেরই আপনজন কেউ হারিয়ে গেছে।

মুন্সীজীর বিয়োগব্যথায় যে কান্না সে তো সবাই কাঁদছে—কিন্তু আড়তদার আর মহাজনদের কান্না, ও যেন আর বাধা মানে না। শুধু অবিরাম অঝোর ধারায় ঝরছে। কারণ, এদের সঙ্গে মুন্সীজীর ছিল লেনদেনের সম্পর্ক। তাঁর হঠাৎ অন্তর্ধান ওদের ব্যবসায়িক ভিতে নাড়া দিয়েছে। লেনদেনের ব্যাপারটা মুখেমুখেই ছিল—কাগজে-কলমে তার প্রমাণ কই। যাই হোক, দশ-বারো দিন কোনরকমে কাটানোর পর উপযুক্ত প্রমাণসাপেক্ষে কাগজপত্র তৈরী করে একে একে পাওনাদাররা এসে হাজির হল। কোন ব্যাপারীর কাছ থেকে শ'খানেক টাকার ঘি আনা হয়েছে তার দাম দেওয়া হয়নি। কোন দোকানে দুশো টাকার আটার দাম বাকী। হাজার টাকার মত কাপড় ধারে এসেছে কোন আড়তদারের কাছ থেকে। মন্দির তৈরীর সময় মুন্সীজী কুড়ি হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন এক মহাজনের কাছ থেকে, আজও তা তেমনিই পড়ে আছে। পাওনাদারদের পাওনাগণ্ডার হিসেবের অঙ্কর যে বিপুল পরিমাণ, সে তুলনায় মুন্সীজীর অর্থসামর্থ্য অতি সামান্য। থাকার মধ্যে আছে ওঁর এই বৃহৎ অট্টালিকা আর গৃহের আসবাব সামগ্রী। তার অতিরিক্ত তিনি এমন কিছুই রেখে যাননি যা দিয়ে তাঁর এই বিপুল ঋণ পরিশোধ করা যায়। ভূ-সম্পত্তি বেচা ছাড়া তাঁর ঋণ পরিশোধ করার আর অন্য কোন পথ খুঁজে পায়

না সুবামা।

চাটাইয়ের ওপর মাথা নীচু করে সুবামা বিরস বদনে বসেছিল। সামনের উঠোনে কাঠের ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে খটখট করে ঘোড়া ছোটাচ্ছিল প্রতাপচন্দ্র। এমন সময় কুলপুরোহিত মোটারাম শাস্ত্রী হাসতে হাসতে বাড়ির ভেতর পা রাখলেন। শাস্ত্রীমশাইকে খুশী হয়ে ঢুকতে দেখে ত্বরিতে সুবামা সচকিত হয়ে উঠল। নিশ্চয় উনি কোন সুসংবাদ এনেছেন। শাস্ত্রীজীর বসার জন্য তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিয়ে আশাভরা চোখে ওঁর দিকে চাইল। আসন গ্রহণ করে খুব মোলায়েম স্বরে শাস্ত্রীজী সুবামাকে জিগগেস করলেন—পাওনাদারদের কাগজ পত্র সব দেখেছ?

আশাহত সুবামা ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল—হ্যাঁ দেখেছি।

মোটারাম—পাওনাদাররা কাগজ-পত্র যা দিয়েছে তাতে করে ঋণের বোঝা তো প্রায় পর্বতপ্রমাণ। এদিকে মুন্সী শালিগ্রাম ভূত-ভবিষ্যৎ কিছুই চিন্তা না করে প্রমাণযোগ্য কাগজপত্রও কিছু রেখে যাননি। এ টাকা সেদিন অবাধে খরচ হয়েছে। আজ অনেক মনে হচ্ছে।

মোটা—সব দিন কি সমান যায় মা। কি যে হবে কিছুই বুঝছি না।

সুবামা—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই হবে। আমি সামান্য নারী কি করতে পারি।

মোটা—হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছাই সব। তবু, তুমি কি এ ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?

সুবামা—হ্যাঁ, জমি যেটুকু আছে বেচে দেব ঠিক করেছি।

মোটা—রাম! রাম! জমিই যদি বেচে দিলে তো কইবার মতো আর রইল কি?

সুবামা—এ ছাড়া আর তো কোন পথ নেই।

মোটা—বাছা, জমি হাত থেকে চলে গেলে বাকী জীবনটা তোমাদের চলবে কি করে? সেকথা কি ভেবে দেখেছ?

সুষামা—না। এখন ঈশ্বরই আমাদের রক্ষাকর্তা। তেমন কোন বড় বাধা এলে উনিই পার করে দেবেন।

মোটা—না না, এ ঠিক কথা নয়। এতবড় একজন উপকারী সজ্জনের পুত্র পরিবার ঋণের দায়ে সবকিছু বিকিয়ে দিয়ে কায়ক্লেশে দিন চালাচ্ছে এ আমাদের কাছে বড় অনুতাপের বিষয় হবে মা।

সুষামা—ঈশ্বরের ইচ্ছে যদি এই হয় অপরে আর কি করতে পারে।

মোটা—এ ব্যাপারে আমি তোমাকে একটা যুক্তি দিতে পারি, অবশ্য তাতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবেই···যাতে সাপও মরবে আর লাঠিও ভাঙবে না।

সুষামা—আমার কেন আপত্তি থাকবে—আমাদের উপকারই তো চাইছেন আপনি।

মোটা—তাহলে, সর্বপ্রথম একটি দরখাস্ত লিখে কালেক্টার সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও। চিঠির বয়ানে তুমি লিখবে যাতে তিনি তোমার সব খাজনা মুকুব করে দেন। বাকি টাকার বন্দোবস্তের ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। যা ভাল মনে করব সে ভাবেই যোগাড় হবে—অথচ লোকে তার আঁচটিও পাবে না।

সুষামা—কিছু দেনা তো বেশ মোটা রকমের। এত টাকা আপনি যোগাড় করবেন কি করে?

মোটা—তুমি চাইলে টাকা পয়সা যোগাড় করা কি খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার? মুন্সীজীর নামে হাজার পঞ্চাশ টাকা বিনা দস্তখতে ধার পাওয়া কঠিন কাজ কিছু নয়। ধরে নিতে পার টাকা যোগাড় করাই আছে, দেরী যেটুকু, সে তোমার সম্মতির।

সুষামা—শহরের গণ্যমান্য লোকেরা একত্র হয়েই নিশ্চয় এই বন্দোবস্তের কথা ভেবেছেন।

মোটা—তা তো বটেই। আলাপ-আলোচনাতেই এ বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। আর কালেক্টার সাহেবেরও এতে ভাল রকমই সায় আছে।

সুবামা—না, খাজনা মুকুব করার জন্যে প্রার্থনা-পত্র লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমি এও চাই না শাস্ত্রীজী আমার স্বামীর নাম ভাঙিয়ে ঋণ গ্রহণ করে তাঁকে ঋণমুক্ত করি। আমার গাঁয়ের জমি বেচে প্রত্যেকের পাওনা টাকা আমি একটি একটি করে শোধ করে দেব।

কথাগুলো একনাগাড়ে বলে বেশ রূঢ় ভাবেই সুবামা মুখ ঘুরিয়ে নিল। ওর শোকসন্তপ্ত মুখের ওপর ক্রোধের আগুন ঝলকে উঠেছে। মোটারাম দেখলেন উল্টো বিপত্তি। পরিস্থিতি সামলে নিতে গলা নামিয়ে মোলায়েম স্বরে বললেন—তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর-জবরদস্তি চাপিয়ে দেবার কোন ব্যাপার নেই। তুমি ক্রোধ সংবরণ কর মা। তবে একটা কথা, যদি কোনদিন দেখি ঋণের বোঝা নামাতে গিয়ে তোমরা কষ্টের পথ বেছে নিয়েছ, সেদিন কিন্তু প্রলয় কাণ্ড বাধাব। কথাটা মনে রেখ মা।

সুবামা—তাহলে আপনি কি চান আমি আমার স্বামীকে ঋণ-মুক্ত করতে গিয়ে অপরের দয়ার আশ্রয় গ্রহণ করি? না শাস্ত্রীজী, সে আমি কিছুতেই পারব না। এ ভিটেয় আমি জ্বলেপুড়ে মরব, না খেয়ে শুকিয়ে মরব তবু অন্যের ভিক্ষের অন্নে বেঁচেবর্তে থাকতে চাই না।

মোটা—ছিঃ ছিঃ! এ কী বলছ মা! কারো করুণার পাত্রী হবে এমন দুঃসাহস কার আছে? তুমি এমন কথা ভাবলে কি করে? ঋণ গ্রহণে লজ্জার কোন কারণ নেই। কে এমন ধনী মহাজন আছে, যার ঘাড়ে লাখ দু-লাখ টাকার ঋণের বোঝা নেই?

সুবামা—আমার বিশ্বাস হয় না শাস্ত্রীজী যে এই ঋণ দানে অন্যের করুণার লেশমাত্র নেই।

মোটা—এমন বুদ্ধিবিভ্রম ঘটল কেমন করে তোমার? সর্বরকম দুঃখের বোঝা নিজের মাথায় চাপিয়েছ, তা নিয়ে বলার কিছু নেই। কিন্তু এই শিশুটির কথা কি একবার ভেবে দেখেছ—ওর প্রতি কি তোমার দয়াও হয় না এতটুকু?

মোটারামের কথাগুলো সুবামার আঁতে ঘা দিল। চোখ ভরে জল

এল। ছেলের দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইল অপলক।···কত তপস্যা করে এই ছেলেকে পেয়েছিল কোলে। এর কপালে কি শুধু দুঃখই লিখেছ ভগবান। প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্ঝার দাপট যার গায়ে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারেনি—সূর্যের প্রখর তাপ যাকে সইতে হয়নি কোনদিন, স্নেহের সাগরে যে সদাই ডুবে থাকত আনন্দে, আজ তাকে দারিদ্র্যের আগুন গ্রাস করবে তার মায়েরই চোখের সামনে।···চুপ করে ভাবছিল সুবামা কথাগুলো। ওকে অনেকক্ষণ নিরুত্তর দেখে মোটা-রাম মনে মনে বেশ প্রসন্নই হলেন। যাক, ঘা দিয়ে কথা বলায় শেষ পর্যন্ত মোক্ষম কাজ হয়েছে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, মোটারামের খুশীতে বাদ সেধে সুবামা সোচ্চার হল—শাস্ত্রীজী, যার বাবা একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষকে খাইয়েছে, পরিয়েছে—তার সন্তানের অন্যের আশ্রিত হওয়া শোভা পায় না, আর তা উচিতও নয়—যদি ওর বাবার ধর্ম ওর সহায় হয় তাহলে ও-ই দশজনকে খাইয়ে নিজে খাবে। আর কথা বাড়তে না দিয়ে ছেলেকে ডেকে বলল—এদিকে এস তো বাবা। প্রতাপ কাছে আসতে বলল—কাল থেকে তোমার দুধ, মিষ্টি, ঘি সব বন্ধ। কি, কাঁদবে না তো? ছেলেকে আদর করে কোলে বসিয়ে ওর গোলাপী গালের ঘাম মুছিয়ে চুমো খেল সুবামা।

প্রতাপ—কাল থেকে মিষ্টি বন্ধ হবে কেন মা? ময়রার দোকানে কি মিষ্টি নেই?

সুবামা—থাকবে না কেন। কিন্তু কেনার পয়সা পাব কোথায়?

প্রতাপ—আমি যখন বড় হব, অনেক পয়সা দেব ওদের।···এই ঘোড়া, চল্ হট্ হট্। দেখেছ মা, কি তেজী ঘোড়া আমার!

সুবামার চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠল। এই সুন্দর আর কোমল শরীরের ওপর এবার দারিদ্র্যের অত্যাচার শুরু হবে।···না না, নিজে আমি সব কিছু সইতে রাজি আছি কিন্তু প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের ওপর দারিদ্র্যের এতটুকু ছায়াও পড়তে দেব না।···সন্তানের দুরবস্থার কথা ভেবে মা এদিকে আকুল হচ্ছে—আর প্রতাপ তখন তার জবরদস্ত ঘোড়ার ওপর সওয়ার হওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেক ভাবে জাল বেছালেন মোটারাম। বিবিধ বাক্‌চাতুর্যে সুবামাকে পরাস্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুবামা স্থির-প্রতিজ্ঞ। 'না' যে একবার করেছে তাকে 'হ্যাঁ' করানো গেল না কিছুতে। পরে সুবামার এই আত্মমর্যাদা রক্ষা করার কথা শুনে সবাই ধন্য ধন্য করেছে। মানুষের হৃদয়ে ওর প্রতি শ্রদ্ধা আরো দ্বিগুণ বাড়ল। পরোপকারী উদারহৃদয় সজ্জন ব্যক্তির স্ত্রীর যা করা উচিত সুবামা তাই করেছে। মুন্সী শালিগ্রামের যোগ্য সহধর্মিণীই বটে।

এই ঘটনার দিন পনের বাদে গৃহের সংলগ্ন জমি নিলামে চড়ল। পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়া গেল তা থেকে। তা দিয়ে ওদের ঋণ যা ছিল শোধ হল। গৃহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা জিনিস ছিল, বেচে দেওয়া হল। বাড়ির ভেতরে আধাআধি উঁচু পাঁচিল দিয়ে বাড়িটাকে দু অংশে ভাগ করা হল। এক অংশে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করে অন্য অংশ ভাড়া দিয়ে দিল সুবামা।

৩

সুবামার নতুন ভাড়াটে মুন্সী সঞ্জীবলাল অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং সজ্জন মানুষ। আগে উনি এক সরকারী দপ্তরে বেশ প্রতিষ্ঠিত পদেই নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু চাকুরি বজায় রাখতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রসন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেষে বিরক্ত হয়েই একদিন তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দেন। চাকুরি করা কালীন কিছু পুঁজি করেছিলেন। চাকুরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে উনি ঠিকাদারী শুরু করলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কিছু টাকা রোজগার করলেন। বর্তমানে ওঁর মাসিক আয় চার-পাঁচশো টাকার অধিক বই কম নয়। ওঁর তীক্ষ্ণ মননশীল মেধা ওঁকে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে। যাতেই তিনি হাত দিয়েছেন তাতে লাভ বই লোকসান হয়নি কোনদিন।

সঞ্জীবলালের পরিবার খুব বড় নয়। ভগবানের কৃপায় বেশ কয়েকটি

সন্তান লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু বর্তমানে মা-বাবার নয়নের মণি শুধুমাত্র একটি কন্যাসন্তান জীবিত। মেয়েটির নাম ব্রজরাণী। এই মেয়েই আজ মুন্সী-দম্পতীর বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়স্থল।

প্রথমদিনেই ব্রজরাণী আর প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে সখ্যতা গড়ে উঠল। দেখা হওয়ার পর আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই দুজনে পাখির মতো কলকলানি শুরু করে দিল। বিরজন আনল ওর পুতুল, খেলনা আর বাজনা। বই খাতা আর ছবি নিয়ে এল প্রতাপ। এরপর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় ওরা দুটিতে একসঙ্গে খেলা করত। দেখে মনে হত যেন দুটি ভাই-বোন। সুশীলা দুজনকে একসঙ্গে কোলে বসিয়ে আদর করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনের পরিচর্যা করত। কোন কোনদিন বিরজনও প্রতাপদের ঘরে আসত। দুঃখকষ্টের ভারে ন্যুব্জ সুবামা ওদের দুটিকে দেখে নিজের সব দুঃখকষ্টের কথা ভুলে যেত। ওদের বুকে জড়িয়ে ধরে, ওদের ছেলেমানুষি কথা দিয়ে ভুলিয়ে রাখত নিজেকে।

সঞ্জীবলাল একদিন বাইরে থেকে ফিরে এসে দেখেন অফিস-ঘরের চেয়ারে মুখোমুখি বসে আছে প্রতাপ আর বিরজন। প্রতাপ কি একটা বই পড়ছে আর বিরজন একমনে তা শুনছে। সঞ্জীবলালকে দেখতে পেয়েই দুজনে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বিরজন দৌড়ে গিয়ে বাবার কোলে চেপে বসল। প্রতাপ একপাশে দাঁড়িয়ে রইল মুখ নিচু করে। সঞ্জীবলাল প্রতাপচন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখলেন। কি গুণবান ছেলে! কতটুকুই বা বয়েস! তবু ভাবীকালের এক প্রতিভাধরের দীপ্তি ছড়িয়ে আছে ওর সারা মুখে। দিব্যকান্তি মুখমণ্ডল, রক্তাভ গাল, পাতলা ঠোঁট, দীপ্তিময় চোখ, ভ্রমর-কালো চুল আর পরনে পরিচ্ছন্ন শুভ্র বসন। সঞ্জীবলাল স্নেহভরে ডাকলেন —এ দিকে এস প্রতাপ।

সঙ্কুচিত হয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল প্রতাপ। আদর করে ওকে কোলে বসালেন সঞ্জীবলাল। বললেন—কি বই পড়ছিলে?

প্রতাপ উত্তর দেওয়ার আগেই বিরজন বলে উঠল—সুন্দর সুন্দর

গল্পের বই পড়াছিল বাবা। আচ্ছা বাবা, পাখিরা কি আগে আমাদের মতো কথা কইত?

হেসে সঞ্জীবলাল বললেন—কইত বইকি। খুব কথা কইত।

এরই মধ্যে আগের সঙ্কোচ অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছে প্রতাপ। সঞ্জীবলালের পুরো কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ও বলল—তোমাকে উনি ভোলাচ্ছেন বিরজন। এ তো সব বানানো গল্প।

প্রতাপের নির্ভীক সমালোচনায় হাসতে থাকেন সঞ্জীবলাল।

এবার প্রতাপ তোতাপাখির মতো বকবক শুরু করল। আমাদের ইস্কুলটা এতবড় যে শহরের সব লোক চাইলে একসঙ্গে বসতে পারবে। আর পাঁচিলটা তাল গাছের মতো উঁচু। বলদেব প্রসাদ ওর বলটা এমন জোরে ছুঁড়েছিল যে একেবারে আকাশে উঠে গিয়েছিল। আমাদের হেডমাস্টার মশাইয়ের টেবিলের ওপর সবুজ ঢাকনা পাতা। তার ওপর গেলাস ভর্তি ফুল। জান তো বিরজন গঙ্গার জল নীল। এমন জোরে সেই জল বয়ে যায় যে তার মাঝখানে যদি কোন পাহাড় পড়ে তো তাও ভেসে যাবে কুটোর মতো। ওখানে এক সাধুবাবা আছে। রেলগাড়ি সন্ সন্ করে দৌড়য় আর ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে ভক্ ভক্। ইঞ্জিনে ভাপ হয়। সেই ভাপেই তো রেলগাড়ি চলে। জানতো, গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দুপাশের গাছগুলোও দৌড়য়।

এসব আবোলতাবোল ছেলেমানুসি কথাগুলো একনাগাড়ে বকে যাচ্ছিল প্রতাপ। আর বিরজন চিত্রবৎ নিশ্চুপ বসে ওর কথাগুলো শুনছিল। বিরজনও দু-তিনবার রেলগাড়ি চেপেছে। কিন্তু আজও ওর অজানা কে এই রেলগাড়ি তৈরী করেছে আর কেমন করেই বা তা চলে। অনেকবার মাস্টারমশাইকে জিগগেস করেছে ও, কিন্তু উনি বার বার এড়িয়ে গেছেন এই বলে যে ঈশ্বরের অপার মহিমা তাই এমন হয়। আর বিরজনও বুঝেছে ঈশ্বর এক বিরাট শক্তিমান ঘোড়া যে অনায়াসেই এতগুলো গাড়িকে একসঙ্গে হাওয়ার মতো টেনে নিয়ে যায়।

প্রতাপ চুপ করার পর বিরজন ওর বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বলল—আমিও প্রতাপের বই পড়ব বাবা?

সঞ্জীব—তুমি সংস্কৃত পড়। আর এগুলো হল সাহিত্যের বই।

বিরজন—তাহলে আমি সাহিত্যের বই-ই পড়ব। কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে এতে। আমার বইয়ে একটাও গল্প নেই। হ্যাঁ বাবা, পড়া কাকে বলে?

মেয়ের এই আচম্কা প্রশ্নে ফাঁপরে পড়েন সঞ্জীবলাল। পড়া কি বস্তু এ-ব্যাপারে আজ পর্যন্ত নিজেই ভাবেননি কোনদিন—মেয়েকে উত্তর দেবেন কি! উত্তর খুঁজতে মাথা চুলকোতে লাগলেন—প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আমাকে তো বই পড়তে দেখ বিরজন—ওকেই পড়া বলে।

বিরজন—আমিও তো সংস্কৃত পড়ি। তাকে কি পড়া বলে না?

প্রতাপ—ওটা আবার পড়া নাকি! শুধু তোতাপাখির মতো শব্দরূপ মুখস্থ করা।

৪

দিন কয়েক হল সুবামা ওর রাঁধুনী বামুনীকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে জনমজুর আর দুজন পালকি-বেহারাকেও বিদেয় করেছে। কারণ এখনকার এই অবস্থায় ওদের প্রয়োজন নেই, তাছাড়া ওদের পোষণের ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্যও তার বর্তমানে নেই। কাজের লোক বলতে টিঁকে আছে শুধু একটি বুড়ি ঝি। রান্নাবান্না সুবামা নিজেই করে—আর বাকী সব যাবতীয় কাজ সামলায় ওই বুড়ি। এত কঠিন পরিশ্রম করার অভ্যাস কোনদিনই ছিল না সুবামার। হঠাৎ এত কাজের চাপ একসঙ্গে পড়ায় তার ধকল সইতে পারল না। রোজ সন্ধ্যের দিকে জ্বর হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থা হল যে জ্বর সর্বক্ষণ লেগেই থাকে। শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। ক্ষিদে নেই, তেষ্টা নেই—কোন কাজে মনও লাগে না। শুধু ছককাটা নিয়মে কাজ করে যায় কোন রকমে। প্রতাপ যতক্ষণ বাড়িতে থাকে সুবামার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই যে তার শরীরে এত কষ্ট—কিন্তু প্রতাপ ইস্কুলে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে কোঁকাতে

শুরু করে।

প্রতাপ অত্যন্ত বুদ্ধিমান। মায়ের শরীরের হাল দিনদিন খারাপ হচ্ছে। ও বুঝতে পারল নিশ্চয় ওঁর কোন কঠিন অসুখ হয়েছে। একদিন স্কুল থেকে সোজা ও বাড়ি ফিরে এল। অসময়ে ছেলেকে আসতে দেখে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতে গেল সুবামা। বসা আর শরীরে কুলোল না। মাথা ঘুরে এলিয়ে পড়ল। হাত পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মাকে সামলে নিয়ে মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বলল প্রতাপ—তোমার অসুখ করেছে? এত দুর্বল হয়ে পড়লে কি করে? দেখ তো, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে। এত তাত, হাত দিতে পারছি না।

সুবামা হাসার চেষ্টা করে। নিজের অসুখের কথা বলে কচি ছেলেটাকে কষ্ট দেবে কেমন করে। নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রতিমূর্তি সুবামা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—না বাবা, অসুখ কোথায়। সামান্য একটু জ্বর এসেছিল, ও সন্ধ্যেবেলাতেই ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে রাগ করার কি আছে? যাও আলমারীতে হালুয়া রেখেছি, বার করে খাও। পারবে তো, না বার করে দেবো? তুমি বরং এসে বস, আমিই বার করে আনছি।

প্রতাপ—মা, তুমি কিন্তু আমায় সত্যি কথাটা বলছ না। অসুখ তো তোমার আলবাৎ হয়েছে নইলে একদিনের জ্বরে কেউ এত দুর্বল হয়ে পড়ে?

সুবামা—(হেসে) তুমি বলছ আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।

প্রতাপ—ডাক্তারবাবুর কাছে যাচ্ছি। চুপ করে শুয়ে থাক।

সুবামা—(প্রতাপের হাত ধরে) তুমি কি জান নাকি, উনি কোথায় থাকেন?

প্রতাপ—জিগগেস করতে করতে ঠিক চলে যাব।

সুবামা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আবার মাথাটা ঘুরে গেল। চোখ দুটো পাথরের মতো স্থির হয়ে গেছে। মায়ের অবস্থা দেখে

প্রতাপ ভয় পেল খুব। কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে দৌড়ে বিরজনদের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। প্রতিদিন ঠিক এই সময়ই প্রতাপ বিরজনদের বাড়িতে আসে। আজ আসতে দেরী হচ্ছে দেখে বিরজন আকুল হয়ে এদিক ওদিক খুঁজছিল ওকে। হঠাৎ দরজায় উঁকি দিতে দেখল প্রতাপ দরজার সামনে দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিল মজা করে ও এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এসে মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিতেই দেখল প্রতাপ কাঁদছে। চেঁচিয়ে উঠল বিরজন—লাল্লু, কাঁদছ কেন ? বল লাল্লু, কাঁদছ কেন ?

কোন উত্তর না দিয়ে প্রতাপ ফোঁপাতে লাগল।

বিরজন জিগগেস করল—বলবে না ? কাকী কি কিছু বলেছেন তোমায় ? ঠিক আছে, বলবে না তো বোল না।

এবার প্রতাপ মুখ খুলল—না বিরজন, মা বকেননি। জান মায়ের খুব অসুখ।

একথা শুনেই ব্রজরাণী একদমে ছুটে এসে সুবামার শিয়রে দাঁড়াল। নিঃসাড়ে পড়ে আছে সুবামা। চোখ দুটো বন্ধ। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। বিরজন সুবামার গা আস্তে করে ঝাঁকিয়ে বলল—কাকী, ও কাকী, শরীর কেমন লাগছে এখন ? চোখ খোল কাকী, চোখ খোল। কোন সাড়া নেই। বিরজন তাড়াতাড়ি তাক থেকে তেল পেড়ে এনে সুবামার মাথায় ঘষতে লাগল। মাস খানেক ধরে মাথায় তেলটুকু দেবারও সময় পায়নি। তেল পেয়ে মাথা একটু ঠাণ্ডা হতেই সুবামা চোখ মেলল।

বিরজন—কেমন লাগছে কাকী ? ব্যথা নেইতো এখন ?

সুবামা—না মা, কোথাও ব্যথা নেই। একেবারে ঠিক হয়ে গেছি। ভাই কোথায় ?

বিরজন—ও তো আমাদের বাড়িতে। খুব কাঁদছে।

সুবামা—যাও, গিয়ে ওর সঙ্গে খেলা কর।

ঠিক এই সময় সুশীলা এল। সুবামার সঙ্গে দেখা করার জন্য

অনেক দিন ধরেই ও ছটফট করছিল—কিন্তু ফুরসতই মেলেনি। দুচারটে ভাল মন্দ কথা বলে সুবামাকে সান্ত্বনা দেবে এই মনে করেই সুশীলার ওর কাছে আসা। মাকে দেখতে পেয়েই বিরজন আনন্দে লাফাতে শুরু করল। হাততালি দিয়ে বলতে লাগল—মা এসেছে, আমার মা এসেছে।

সুবামার কাছে সুশীলা এসে বসতে, দুই রমণী পরস্পর আলাপ জুড়ে দিল। কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে এল। এতক্ষণ প্রতাপের কথা কারুরই খেয়াল পড়েনি। ওদিকে, প্রতাপ তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে রওনা দিল। মুন্সী শালিগ্রামের বন্ধুবর্গের মধ্যে ডাক্তার কিচ্‌লুও একজন। শালিগ্রামের গৃহে যখনই ডাক পড়েছে ডাঃ কিচ্‌লু হাজির। প্রতাপ শুধু এটুকুই জানত ডাক্তারবাবু বরনা নদীর ধারে একটা লাল বাংলোয় থাকেন।

নিজের পাড়া ছাড়া আজ পর্যন্ত কোথাওই যাওয়ার সুযোগ পায়নি প্রতাপ। কিন্তু ওর মায়ের অসুস্থতা আর মায়ের প্রতি ওর অচলা ভক্তি আজ ওকে এই অচেনা পথে আসতে সাহস জুগিয়েছে। একবারও মনে হয়নি নিজের অক্ষমতার কথা। একটা এক্কা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ছুটে এক্কাওয়ালার কাছে গিয়ে বলল—লাল-বাংলো যাবে? লাল-বাংলো সবারই চেনা। এক্কাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে যেতে রাজী হল।···আটটার মধ্যেই ডাক্তারবাবুর ফিটন সুবামাদের বাড়ির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। প্রতাপ ছুটে বাড়ির ভেতর ঢুকে বলল—ডাক্তারবাবু আসছেন, ঠিক হয়ে নাও মা।

সুবামা এবং সুশীলা দুজনেই চমকে উঠল। প্রতাপ যে এতক্ষণ ডাক্তারবাবুর খোঁজেই গিয়েছিল বুঝতে পারল। সুবামা স্নেহভরে ছেলেকে কোলে বসিয়ে সজল চোখে বলল—একলা কেন গিয়েছিলে? চিনলেই বা কেমন করে? ভয় লাগেনি? কাউকে না বলে কয়ে চলে গেলে, যদি হারিয়ে যেতে কি করতাম আমি? আর তোমায়ই বা আদর করত কে? ছেলেকে চুমো খেল বারবার। প্রতাপ খুব খুশী। ওর মনে হচ্ছে যেন এক কঠিন পরীক্ষায় ও

সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। সুষমা ঢেকেঢুকে ঠিক হয়ে শুয়ে পড়তেই ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকলেন। তারপর ওর নাড়ী টিপে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ভাববার তেমন কোন কারণ নেই। প্রতাপকে কাছে বসিয়ে কথা বললেন খানিকক্ষণ। ওষুধ উনি সঙ্গে করেই এনেছিলেন। সেগুলো সময়মতো খাওয়াতে বলে প্রায় ন'টা নাগাদ উঠলেন।

পুরানো জ্বর, তাই সুষমাকে প্রায় মাসখানেক ধরে ওষুধ খেতে হল। এর মধ্যে রোজই নিয়ম করে দুবেলা ডাক্তারবাবু এসেছেন। সুষমার প্রতি ডাক্তারবাবুর যত্নের অন্ত নেই। দেখে মনে হয় যেন সহোদর বোন। একদিন সুষমা খুব ভয়ে ভয়ে টাকাসুদ্ধ একটা রেকাবি ওনার সামনে রাখল। ডাক্তারবাবু তা স্পর্শও করলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, টাকাটা আমার নাম করে প্রতাপকে দিয়ে দেবেন। পায়ে হেঁটে স্কুলে যায়, একটা সাইকেল কিনে দেবেন।

সুষমার সেবাশুশ্রূষার জন্য হয় বিরজন নয় সুশীলা কেউ না কেউ সব সময়ই হাজির থাকত। মায়ের আসতে যদি বা কোন সময় দেরী হত, বিরজন একটি মুহূর্তের জন্যও সুষমার কাছছাড়া হত না। ওষুধ খাওয়াত। পান সেজে দিত। শরীর একটু ভাল বোধ করলে মিঠে মিঠে কথা বলে ওকে ভুলিয়ে রাখত। খেলাধুলো সব ওর গেছে। হয়তো যখন সুষমা খুব রাগারাগি করত, বাগানে গিয়ে প্রতাপের সঙ্গে খানিকটা খেলে আসত। আবার সন্ধ্যেবাতি জ্বলতে না জ্বলতেই ফিরে এসে সুষমার মাথার গোড়ায় বসত। তারপর যতক্ষণ না ঘুমে ঢুলে পড়ে, নাগাড়ে বসে থাকত একই ভাবে। অনেকদিন ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত্রে চাকর এসে কোলে করে বাড়ি নিয়ে গেছে, এমনও হয়েছে। কোথা থেকে এমন একাগ্রতা যে পেয়েছিল মেয়েটা, কে জানে।

একদিন সুষমার মাথার শিয়রে বসে বাতাস করতে করতে কি যেন এক গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে বিরজন। দেওয়ালের এক জায়গায় ওর দৃষ্টি আটকে গেছে। গাছের ওপর ফুল যেমন খেলে বেড়ায়

ওর অধরে তেমন হাসি খেলছিল। সুবামা যে ওকে আড়চোখে দেখছে সে খেয়ালও নেই ওর। আচম্‌কা ওর হাত থেকে পাখাটা খসে পড়ল। পাখাটা তোলার জন্যে মুখ নীচু করতেই সুবামা জড়িয়ে ধরল ওকে। তারপর মুখে চুক্‌চুক্ করে আওয়াজ করে বলল—সত্যি করে বল্ তো মা, কি চিন্তা করছিলি এতক্ষণ ?

লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করল বিরজন। মুখ না তুলেই বলল—কিছু না। তোমায় বলব না।

সুবামা—আমার লক্ষ্মী বিরজন—বল্ না মা, কি ভাবছিলি ?

বিরজন—(লজ্জাভরে) ভাবছিলাম কি···। আহাঃ! হাসছ কেন ? যাও, বলব না তোমায়।

সুবামা—আচ্ছা, এবার আর হাসব না। বল্, নইলে আবার চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ব। ভাল হবে তো তখন ?

বিরজন—কাউকে বলবে না বল ?

সুবামা—কাউকে বলব না।

বিরজন—ভাবছিলাম, যখন প্রতাপের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যাবে কি মজাটাই না হবে···কেমন আনন্দে থাকব তখন।

বিরজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুবামা বলল—ও যে তোমার ভাই হয় মা।

বিরজন—হ্যাঁ, ভাই হয়। ভাই হয় না ছাই। বুঝতে পেরেছি, তুমি আমাকে বউ করতে চাও না। এই তো ?

সুবামা—তা কেন। ঠিক আছে। লাল্লু আসুক আজ। ওকেই জিগগেস করে দেখব, ও কি বলে।

বিরজন—না না। লাল্লুকে কিছু ব'ল না। তোমার পায়ে পড়ি, ওকে ব'ল না।

সুবামা—(হাসতে হাসতে)—বলব তো বটেই।

বিরজন—আমার দিব্যি রইল। ওকে বলে দেখ।

৫

দিন চলে যায় স্রোতের মত। দেরী লাগে না। কোথা দিয়ে দুটো বছর পেরিয়ে গেল। পণ্ডিত মোটারাম নিত্য ভোরবেলা এসে সিদ্ধান্ত কৌমুদী পড়ান। কিন্তু ওনার আসাটা যেন একটা নিয়ম পালনের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ এসব বই পড়াতে বিরজনের একেবারেই মন নেই। একদিন সঞ্জীবনলাল ইঞ্জিনীয়ারদের অফিস থেকে ফিরে নিজের ঘরে বসে আছেন। চাকর জুতোর ফিতে খুলে দিচ্ছিল। এই সময় রাধিয়া-ঝি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। সঞ্জীবনলালের হাতে একটা খাম দিয়ে ও মুখ ঘুরিয়ে হাসতে লাগল। খামের ওপর লেখা—শ্রীমান বাবা মহাশয়ের সেবায়…।

মুন্সী—আরে! এ কার চিঠি নিয়ে এসেছিস! আমার নয় এটা।

ঝি—খুলেই দেখুন না ঠাকুর। আপনারই চিঠি।

মুন্সী—কে দিল তোকে এটা? বাইরে থেকে কি কেউ এসেছিল?

হেসেই জবাব দিল ঝি—খুললেই সব বুঝতে পারবেন।

বিস্ময় ভরে খামটা খুলে ফেললেন উনি। খামের ভেতর থেকে যে চিঠিটা বেরল তার বয়ান এরকম—

বাবার চরণে বিরজনের প্রণাম। আপনার কৃপায় এখানে সব কুশল। বিশ্বনাথের কাছে সর্বদাই আপনার কুশল কামনা করি। প্রতাপের কাছে আমি ভাষা শিক্ষা করছি। ও ইস্কুল থেকে ফিরে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাকে পড়ায়। এবার থেকে আপনি বাড়িতে ফেরার সময় আমার জন্যে ভালো ভালো বই আনবেন। কারণ অধ্যয়নই মানুষের জীবনে শ্রেয় বস্তু। আর বিদ্যা হল অমৃত। বেদ পুরাণে এর মাহাত্ম্য লেখা আছে। মানুষের উচিত, বিদ্যাধনকে দেহে মনে গ্রহণ করা। বিদ্যাই মানুষের সকল দুঃখ দূর করতে পারে। কাল আমি কাকীকে বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প পড়ে শুনিয়েছি। তার জন্যে উনি আমাকে একটা পুতুল উপহার দিয়েছেন। খুব সুন্দর! আমি ওটার বিয়ে দেব। তখন আপনার কাছ থেকে টাকা নেব।

পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে আর পড়ব না। আমি যে সাহিত্য পড়ছি মা জানেন না।

আপনার প্রিয় বিরজন

প্রশস্তি দেখেই সঞ্জীবনলালের বুকের মধ্যে গুড়গুড় করছিল। প্রায় এক নিঃশ্বাসেই চিঠিটাকে পড়ে ফেললেন। আনন্দের অতিশয্যে খালি পায়েই দৌড়লেন অন্দরমহলে। প্রতাপ আর বিরজন বসেছিল। প্রতাপকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করলেন। তারপর ওদের দুজনের হাত ধরে সুশীলার কাছে গেলেন। ওকে চিঠিটা দেখিয়ে বললেন—বল তো, কার চিঠি এটা?

সুশীলা—হাতে দাও দেখি। তবে তো বলব।

মুন্সী—না, ওখানে বসেই বলতে হবে। কই, তাড়াতাড়ি বল!

সুশীলা—ঠিক বললে কি দেবে?

মুন্সী—পঞ্চাশ টাকা। একেবারে করকরে নোট।

সুশীলা—কত টাকার?

মুন্সী—পঞ্চাশ টাকার। হাতে নিয়ে দেখতে পার।

সুশীলা—সত্যি নিয়ে নেব কিন্তু।

মুন্সী—নেবে তো বটেই। কিন্তু না বললে নেবে কেমন করে?

সুশীলা—লাল্লুর চিঠি। কই নোটটা দাও এবার। আর শুনছি না কিছু।

সুশীলা উঠেই সঞ্জীবনলালের হাতটা ধরে ফেলল।

মুন্সী—আরে এ যে একেবারে দিনে ডাকাতি। নোট কেড়ে নিচ্ছ কেন?

সুশীলা—কথা দাওনি? এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

মুন্সী—ভুলব কেন। কিন্তু ঠিক বললে তবে তো। যা বলেছ তার সবটাই যে ভুল।

সুশীলা—যাও যাও! সব সময়েই শুধু ছুতো। টাকা না দেওয়ার মতলব আর কি। কি লাল্লু, তোমার চিঠি নয়?

প্রতাপ একবার আড়চোখে সঞ্জীবলালের দিকে তাকিয়ে মিন্‌মিন্‌

করে বলল—আমি আবার কখন লিখলাম।

মুন্সী—ছিঃ ছিঃ। লজ্জার কথা, বলতে পারলে না তো?

সুশীলা—ও মিথ্যে কথা বলছে। ওরই চিঠি ওটা। তোমরা সবাই যুক্তি করে এসেছ না—? বুঝি না কিছু?

প্রতাপ—সত্যি বলছি। আমার চিঠি নয়। বিরজন লিখেছে চিঠিটা।

সুশীলা—কি বললে! বিরজনের চিঠি! তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল বারবার। বিশ্বাসই হচ্ছে না, বিরজন চিঠি লিখেছে! মেয়েকে জিগগেস করল—হ্যাঁ মা, সত্যিই তুমি এটা লিখেছ?

মাথা হেঁট করে বিরজন বলল—হ্যাঁ।

জবাব শুনে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল সুশীলা।

এদিন থেকেই বিরজনের এমন অবস্থা হল, যখনই দেখা যায় ও কলম দিয়ে সাদা পাতায় আঁচড় কাটছে। ঘরের কোথায় কি হচ্ছে সে ব্যাপারে জানার আগ্রহ ওর কোনদিনই ছিল না। তার ওপর এখন নতুন উপসর্গ। লিখতে পেলে আর কথাটি নেই। যেন সোনায় সোহাগা। মেয়ের তন্ময়তা মাকে মুগ্ধ করে। বাবার খুশীর সীমা নেই। নিত্য নতুন বই এনে জমাতে শুরু করেছেন। মেয়ে একটু সেয়ানা হলেই পড়তে পারবে। কোন কাজই করতে হয় না বিরজনকে। তবু কখনো যদি মুখ ধোওয়ার জলটুকু নিজের হাতে নিয়ে ঢালে, মায়ের চোখে পড়লে আর রক্ষে নেই। ঝি-চাকরদের বকে একসা করে।

এমনি ভাবে নানান ঘটনার মধ্য দিয়েই দিনগুলো কাটছিল। বিরজন এখন দ্বাদশ বর্ষীয়া। হলে হবে কি, চালটুকু পর্যন্ত ফোটাতে শেখেনি। আর শিখবেই বা কেমন করে—উনুনের ধারে যেতে দিচ্ছে কে ওকে। কিছু শেখারও তো একটা সুযোগ চাই।

দেখে দেখে সুবামা একদিন সুশীলাকে ডেকে বলল—বোন, বিরজন বেশ বড়টি হয়েছে। এখনো কি ওকে সংসারে চলার আদপ-কায়দাগুলো শেখাবে না?

সুশীলা—কি আর বলি ভাই। ইচ্ছে তো করে সব শেখাই। কিন্তু একটা কথা ভেবে আর এগুতে পারি না।

সুবামা—কি কথা ভেবে?

সুশীলা—তেমন একটা কিছু নয়। আসলে কুড়েমী ধরে যায় আর কি।

সুবামা—তাহলে এ কাজটা তুমি আমার হাতেই সঁপে দাও। রান্না-বান্না করা মেয়েদের প্রধান কর্ম। আর প্রয়োজনও তার খুব।

সুশীলা—কতটুকুই বা বয়েস—এরই মধ্যে ও উনুনের ধারে বসবে কেমন করে।

সুবামা—কাজ করতে করতেই কাজ শেখে।

সুশীলা—আগুনের তাপে ওর ফুলের মতো গালগুলো শুকিয়ে যাবে না? খানিকটা রেগে গিয়েই কথাগুলো বলল সুশীলা।

সুবামা—ফুল না শুকোলে তাতে কি ফল ধরে বোন।

পরের দিন থেকেই বিরজনের রন্ধন শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হল। প্রথম পাঁচ দশ দিন উনুনের তাতের সামনে বসতে খুব কষ্ট হত ওর। আগুন নিভে গেলে ধরাতে পারত না কিছুতে। ফুঁ দিয়ে ধরাতে গেলে চোখ ফেটে জল আসত। জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠত চোখ দুটো। আগুনের ফুল্‌কির শিকার হল বেশ কয়েকটা দামী রেশমী শাড়ি। হাতে ফোস্কা পড়ল। তবু ক্রমশ সব কষ্ট দূর হল বিরজনের। সুবামা তার শান্ত প্রকৃতি আর অসীম ধৈর্য নিয়ে প্রতিদিন ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে ওকে কাজের করে তুলল।

বিরজনের রন্ধন শিক্ষার দু-মাসও পুরণ হয়নি, এমন সময় ও একদিন প্রতাপকে বলল—জান লাল্লু, আমি এখন বেশ রাঁধতে পারি।

প্রতাপ—সত্যি!

বিরজন—সত্যি। কাল আমি নিজের হাতে রান্না করে কাকীকে খাইয়েছি। খুব খুশী হয়েছেন।

প্রতাপ—তাহলে এবার আমাকেও একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াও।

বিরজন খুশীতে ডগমগ হয়ে বলল—বেশ, কালই তাহলে তোমার নেমন্তন্ন রইল।

পরের দিন ঠিক ন'টার সময় প্রতাপকে খেতে ডাকল বিরজন। প্রতাপ গিয়ে দেখল, রান্নার জায়গা মাটি দিয়ে সুন্দর করে লেপা হয়েছে। নতুন মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভেসে আসছে। মেঝেতে টানটান করে আসন পাতা। থালায় ভাত বাড়া। রুটিও আছে তার সঙ্গে। ডাল-তরকারী থালার চার পাশে আলাদা আলাদা বাটিতে সাজানো। আসনের পাশে চকচকে গ্লাস আর জল ভর্তি ঘটি। সব কিছু বেশ পরিচ্ছন্ন আর পরিপাটি করে গোছানো। প্রতাপ আর দাঁড়াল না। ছুটে গিয়ে সঞ্জীবনলালকে ঘর থেকে ধরে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে এল। সব দেখে শুনে উনি আহ্লাদে একেবারে আটখানা। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে, হাত পা ধুয়ে প্রতাপের আসনের পাশে বসে পড়লেন। বেচারী বিরজন ভাবতেও পারেনি যে পিতা-মহাশয় বিনা আমন্ত্রণে ওর অতিথি হবেন। প্রতাপের মতোই শুধু রান্না করেছে। খুব লজ্জায় পড়ল ও। করুণ চোখে মায়ের দিকে চাইল। সুশীলা হেসে বলল—তোমার জন্যে তো আলাদা খাবার আছে। ছেলে-পুলেদের মধ্যে তুমি আবার নাক গলাতে এলে কেন?

খুব লজ্জা পেল বিরজন। লজ্জায় মাথা হেঁট করে তাড়াতাড়ি দুটো থালাতে ভাত আর রুটি নিয়ে এল।

মুন্সী—অতি উত্তম রুটি বানিয়েছে বেটী। যেমন নরম তেমনি সাদা ধবধবে। আর কি মিষ্টি স্বাদ।

প্রতাপ—কেমন সুন্দর ভাত রেঁধেছে দেখুন। ছড়িয়ে দিলে খুঁটে তোলা যাবে।

মুন্সী—এমন মিষ্টি রুটি কখনো খাইনি। তরকারীরই বা কি চমৎকার স্বাদ।

বিরজন, কাকাবাবুকে আর একটু আলুর ঝোল দাও। হেসে বলল প্রতাপ।

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে বিরজনের মুখ। থালা শুকিয়ে যাচ্ছে

দেখে সুশীলা তাড়া দিল—এবার ওঠ তো, ঢের হয়েছে। সবই তো শেষ করেছ—তবে আবার আলসের মতো বসে আছ কি করতে?

মুন্সী—কেন, তোমার কি জিভে জল আসছে নাকি?

যাহোক, শেষ পর্যন্ত মা-মেয়ের দুই ঘরেরই রান্না আত্মসাৎ করে তবেই সঞ্জীবলাল আসন ছাড়লেন। ওঠার সময় পকেট থেকে একটা টাকা বার করে বিরজনকে দিলেন। চমৎকার রান্নার জন্য পুরস্কার।

৬

সারা শহর জুড়ে ডেপুটি শ্যামাচরণের নাম ডাক। এমন কোন হাকিম শহরে নেই যে শ্যামাচরণের মত খ্যাতি যশ কুড়িয়েছে। তার প্রধান কারণ, তাঁর স্বভাব। তিনি যেমন সদালাপী তেমনই সহনশীল, তদুপরি উৎকোচ গ্রহণে তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে উনি ন্যায়বিচার করতেন যে বিগত দশ-বারো বছরে মাত্র দু-চারটে মামলার রায় পুনরায় বিবেচনা করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। ইংরাজীর ছিটেফোঁটা অক্ষরজ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও তাবড় তাবড় উকিল-ব্যারিস্টার ওঁর নৈতিক বোধ আর সূক্ষ্ম-বিচারের ফলাফলে অবাক মানত। স্বভাবের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছিল ওঁর স্বাধীন চেতনা। গৃহ আর গৃহের বাইরে আদালত। এ ছাড়া কোথাও কেউ তাঁকে কোনদিন যেতে দেখেনি। যতদিন মুন্সী শালিগ্রাম জীবিত ছিলেন অর্থাৎ যতদিন এ শহরে উনি বর্তমান ছিলেন, মাঝে মাঝে শ্যামাচরণ তাঁর গৃহে চিত্তবিনোদনের জন্য যেতেন। ওনার অন্তর্ধানের পর থেকেই গৃহের বাইরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। বছর কয়েক আগে একবার এক শ্যামাচরণ কালেক্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যান। খানসামা এসে বলল—সাহেব স্নান করতে গেছেন, অপেক্ষা করতে হবে।···প্রায় ঘন্টা দুই বারান্দায় মোড়ার ওপর বসে অপেক্ষা করার পর হাতে ব্যাট নিয়ে সাহেব বারান্দায় এল। শ্যামাচরণকে অপেক্ষা করতে দেখে বলল—বাবু, আমি খুবই দুঃখিত যে আপনাকে আমার ব্যাট দেখাতে হচ্ছে। আজ একেবারেই

সময় নেই। ক্লাবে যাচ্ছি। পরে যে কোনদিন সময় করে আসবেন।

সামান্য একটা কথা। তবু সাহেব বাহাদুরকে সেলাম ঠুকে সেই যে তিনি পেছন ফিরলেন, জীবনে আর কখনো কোন গোরা-সাহেবের দোরগোড়ায় হাজির হননি। তীব্র বংশমর্যাদবোধ ও জাত্যভিমানই ওঁকে এতটা দৃঢ়চেতা করেছিল। অথচ মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত রসিক। কথায় কথায় হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন। সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানায় আড্ডা বসলে তাঁর অট্টহাসির রেশ অন্দর মহলেও পৌছত। বাড়ির চাকরবাকরদের সঙ্গেও উনি আন্তরিক ব্যবহার করতেন। এমন সহজ সরল ব্যবহার যে, ওরা ওনার পাশে বসে গল্প করতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করত না। অথচ শাসনও ছিল এমন কড়া যে, তাঁর সজ্জনতার ফায়দা উঠিয়ে তারা কখনো অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করার সাহস পেত না। ওঁর সাজপোশাক খুবই সামান্য। মনেপ্রাণে উনি সাহেবী পোশাককে ঘৃণা করতেন। বোতাম দেওয়া উঁচু গলা লম্বা চাপ্কান, তার ওপর রেশমী কাজ করা চাদর, কালো শিমলা, ঢোলা পাজামা, দিল্লীর ছুঁচালো মুখ জুতো। এই ছিল ওঁর প্রধান পোশাক। গোলাপী গায়ের রঙ আর মাঝারি মাপের দোহারা গড়নে এই দেশী পোশাক যে শোভা দিত তা ওই বিলাতী কোট-প্যান্টুলুনের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সারা শহর ওনার প্রতাপে তটস্থ, কিন্তু গৃহের চার দেওয়ালের চৌহদ্দিতে তা একেবারেই অচল। সেখানে তাঁর সুযোগ্যা অর্ধাঙ্গিনী প্রেমবতীর একছত্র সাম্রাজ্য। ওনার অধিকৃত এলাকায় উনি নিজের খেয়াল মোতাবেকই শাসন চালাতেন। বেশ কয়েক বছর হবে ডেপুটি সাহেব একবার একজন স্ত্রীলোককে বাড়ির রান্নার কাজে বহাল করেছিলেন। মেয়েটির চালচলন তেমন ভাল ছিল না। স্বামীর এই অন্যায় কর্মে প্রেমবতী এমনই রুষ্টা হয়েছিল যে, বেশ কিছুদিন গোঁসা করেই কাটিয়ে দেয়। শেষে বাধ্য হয়েই ডেপুটি সাহেব মানে মানে স্ত্রীলোকটিকে বিদায় করেন। এরপর কোনদিনই আর তিনি গৃহের

কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি।

ডেপুটি সাহেবের দুই পুত্র, এক কন্যা। বড়টি রাধাচরণ। গত বছর ডিগ্রী পেয়ে বর্তমানে রুড়কী কলেজে পড়ছে। ফতেপুর সিক্রীর এক বনেদী পরিবারে ওর বিবাহ হয়েছে। মাঝে, কন্যা সেবতী। ওরও বিবাহ প্রয়াগের এক ধনী পরিবারে হয়েছে। ছোট পুত্র, কমলাচরণ। প্রেমবতীর অত্যধিক আদরে ছেলেটি একেবারে উচ্ছনে গেছে। পড়াশোনায় একেবারেই মন নেই। পনের বছর বয়স হল এখনো চিঠিটুকু পর্যন্ত লিখতে শেখেনি। এক মাস্টারমশাই তাকে পড়ানোর জন্য বহাল হয়েছিল। বাছাধন মাস-খানেকের মধ্যেই তাকে বিদায় করে তবে হাঁফ ছেড়েছে। এরপর ওকে পাঠশালায় দেওয়া হল। পাঠশালায় যাবার সময় হলেই ওর গায়ের জ্বর হু হু করে বেড়ে যেত। তা নইলে মাথায় এমন যন্ত্রণা শুরু হত যে পাঠশালে পাঠানো দায়! কাজেই অচিরেই পাঠশালার পাঠও ওর শেষ হল। এবার গৃহেই পড়াশোনার পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হল। বেশ হোমরাচোমরা মাস্টার এলেন। কিন্তু ইনিও তিন মাসের বেশী টিঁকতে পারলেন না। এই তিন মাসে কমলাচরণ অত্যন্ত কষ্টসাধনে তিনটি মাত্র পাঠ গ্রহণ করতে পেরেছে। শেষে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই শ্যামাচরণ নিজেই ছেলের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্যামাচরণের মতো রাশভারী মানুষও এক সপ্তাহের মধ্যে বারকয়েক কমলাচরণকে শাস্তি দিতে বাধ্য হন। ছেলেকে শিক্ষা দিতে গিয়ে দুঁদে ডেপুটি সাহেব এ কথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন যে, সাক্ষীদের বয়ান ও উকিলী বক্তব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বোঝানো অতটা দুরূহ কর্ম নয় যতটা দুরূহ একটি অনিচ্ছুক নিরুৎসাহী বিদ্যার্থীর মনে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ছেলের পড়া নিয়ে প্রেমবতী নিয়তই অত্যন্ত জ্বালাতন শুরু করল। শেষকালে বিরক্ত হয়েই এক সময় ডেপুটি সাহেব কমলাচরণের শিক্ষকতার পদে ইস্তফা দিলেন। কমলাচরণের সুন্দর চেহারা, ছেলেমানুষী স্বভাব আর মধুর কথার জন্য প্রেমবতী সন্তানদের মধ্যে ওকেই বেশী পছন্দ করত। তাই তার প্রতি মায়ের স্নেহের আধিক্য ছিল

লাগাম ছাড়া। আর এই স্নেহাধিক্যের প্রাবল্যে যত রকম বদ নেশা, কমলাচরণের স্বভাবে দেখা দিল।

পাখি পোষা, পায়রা ওড়ানো, এই ধরনের বিদ্‌ঘুটে সব সখ ওকে পেয়ে বসল। কিছুদিন যেতে না যেতেঁ জুয়া খেলাতেও ও বেশ চৌকস হয়ে উঠল। আয়না-চিরুনী আর সুগন্ধি তেল ওর এখন জান-প্রাণ।

প্রেমবতী একদিন সুবামার বাড়ি বেড়াতে এল। ওখানেই বৃজ-রানীকে দেখে এসেছিল। সেদিন থেকে প্রেমবতীর মনের বাসনা বৃজরানীকে ছেলের বউ করে ঘরে নিয়ে আসে। কারণ বৃজরানীর মত মেয়ে যদি এ বাড়ির বউ হয় তো এ বাড়ির ভাগ্যই ফিরে যাবে। সুযোগমতো একদিন সুশীলার কাছে তার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করল। বিরজন তের পেরিয়েছে। তাই ওকে পাত্রস্থ করার কথাবার্তা প্রায়ই হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। এর মধ্যে প্রেমবতীর ইচ্ছার কথা জেনে মুন্সী দম্পতী যেন হাতে স্বর্গ পেল। একে তো পরিচিত পাল্টি ঘর। তার ওপর ওঁরা হলেন কুলীন বংশ আর যোধকরি ছেলেও নিশ্চয় বুদ্ধিমান আর শিক্ষিতই হবে। সঙ্গে বিপুল পরিমাণ পৈতৃক সম্পত্তি। আপনা থেকে অনায়াসে যদি এমন পাত্র দোরগোড়ায় এসে হাজির হয় তো তার ওপর কি আর কোন কথা চলে! বিলম্ব না করে তখনি সামাজিক রীতি অনুযায়ী সম্মতির সংবাদ পাঠানো হল পাত্রের বাড়ি।

এই যোগাযোগের সূত্র ধরে যে বিষবৃক্ষের বীজ সেদিন বপন করা হয়েছিল, তিন বছরের মধ্যে তা মহীরুহের আকার ধারণ করল। ভবিষ্যৎ মানুষের দৃষ্টিতে কেমন রহস্যের জালে আবৃত থেকে যায়!

পাত্রীর বাড়ি থেকে সংবাদ আসার সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী, ননদ আর ছেলের বৌ আলোচনা করতে বসল।

বৌ (চন্দ্রা)—মা, এ বছরই কি ছেলের বিয়ে দেবেন?

প্রেম—তাই তো ভাবছি। এখন তোমার শ্বশুরের মত পাওয়ার অপেক্ষাটুকু

বৌ—পাওনা-গণ্ডা আর পণের ব্যাপারে কিছু কি ঠিক করেছেন?

প্রেম—পাওনা-গণ্ডা আর পণ এমন মেয়ের বেলায় খাটে না।

দাঁড়িপাল্লায় মেয়ে যখন ছেলের বরাবর না হয় তখনই পণের কথা পেড়ে মেয়েকে ছেলের বরাবর করা হয়। বৃজরানী আমাদের কমলের চেয়ে অনেক বেশী যোগ্য।

সেবতী—বিয়ের কদিন আগে থেকেই কিন্তু বেশ ধুম্‌ধাম্‌ শুরু করতে হবে। বৌদি গান গাইবে আর আমি ঢোল বাজাব। কি বৌদি, গাইবে তো?

চন্দ্রা—আমার বাবা ওসব নাচ-গান আসে না।—চন্দ্রার গলার স্বর অনেকটা ছেলেদের মতো ভারী। গলা চড়াবার সময় আবার তা ভেঙে যেত। তাই গাইবার ব্যাপারে ওর খুব আপত্তি।

সেবতী—এ তো তুমি নিজের গাওনা নিজেই গাইছ। বাড়ির সবাই কিন্তু তোমার গানের খুব প্রশংসা করে।

সেবতীর কথা শুনে চন্দ্রা প্রায় জ্বলে উঠল। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলল—নেচে গেয়ে অন্যকে আকৃষ্ট করা যার কম্ম, নাচ গান সেই শেখে—

সেবতী—ঠাট্টা বোঝ না! একটুতে ক্ষেপে যাও কেন বল তো? ওই গানটা একবার গাও না বৌদি—তুমি তো শ্যাম বড় বেয়াক্কেলে···। গাও না, বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে। কতদিন তোমার গান শুনিনি বল তো?

চন্দ্রা—কোকিল-কণ্ঠি, তুমিই গাও।

সেবতী—ওহ্! বুঝেছি, এভাবে সাধাটা তোমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না—আচ্ছা, এবার বলি, লক্ষ্মী বৌদিমণি আমার, একটিবার গাও।

চন্দ্রা—এখন তো গাইবই না। তুমি কি আমায় ডোম্‌নি ঠাউরেছ নাকি—! সময় নেই অসময় নেই গাইলেই হল?

সেবতী—গান না শোনানো অবদি আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ছি না।

সেবতীর গলার স্বর খুব মধুর আর আকর্ষণীয়। রূপ আর দেহের গড়নও মনোহর। সোনার বরণ মুখে চলচলে দুটো চোখ। পেঁয়াজী রঙের শাড়িখানা ওর গায়ে মানিয়েছেও দারুণ। ও আপন মনে গুণ-

গুণ করে গেয়ে উঠল—

তুম্ তো শ্যাম বড়ে বে-খবর হো…তুম তো শ্যাম…।

আপ তো শ্যাম পীয়ো দুধ কে কুলহড় মেরী তো পানী পে গুজর

পানী পে গুজর হো…। তুম্ তো শ্যাম।

দুধ কে কুলহড়, গানের পদে এসে সেবতী হেসে গড়িয়ে পড়ল। প্রেমবতীও হাসছিল—কিন্তু চন্দ্রা গেল ক্ষেপে।—কারণ নেই, অকারণে অমন হেসে গড়িয়ে পড়া আমার ধাতে নেই। এতে হাসার কি ছিল?

সেবতী—রাগ করনা বৌদিমণি…এস আমরা দুজনে গাই।

চন্দ্রা—কোকিল আর কাক। এক সঙ্গে।

সেবতী—ওহ্। রাগ যেন তোমার সদাই নাকের ডগায়।

চন্দ্রা—আকারে ইঙ্গিতে অমন ঠেস দিচ্ছ কেন? তোমার কাছে তো আমার কেউ নিন্দে গাইতে যায়নি, যে আমি গাইতে পারি না।

"কেউ" বলতে এখানে রাধাচরণকেই ইঙ্গিত করেছে ও। যাহোক, চন্দ্রমার আর কোন গুণ না-ই থাক, স্বামীর সেবা সে মনপ্রাণ উজাড় করেই করত। স্বামীর সামান্য একটু মাথা ব্যথা করলে ও চোখে অন্ধকার দেখত। বাড়িতে ফিরতে দেরী হলে ব্যাকুল হয়ে ঘর-বার করত। রাধাচরণ রুড়কী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর হাসিখুশী, কথা বলা সবই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ওর সব আনন্দ যেন স্বামীর সঙ্গ ধরেই চলে গেছে। চন্দ্রমার অকৃত্রিম ভালবাসা, সেবাযত্নে রাধাচরণ ক্রমশ স্ত্রৈণ ই হয়ে পড়েছে। প্রেম, রূপ গুণ সব কিছু অভাবেরই পরিপূরক।

সেবতী—"কেউ" তোমার নিন্দে করবে কি করে। ও তো দেহে মনে তোমার বশই হয়ে গেছে ভাই!

চন্দ্রা—হ্যাঁ, বশ না ছাই! তাই তো এতদিনেও একখানা চিঠি লিখলে না।

সেবতী—তা প্রায় তিন চার দিন হল, কি বল?

চন্দ্রা—কত হাতজোড় করলাম…পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছি।

তবু কি চিঠি লিখে দিলে কিছুতে ?

সেবন্তী—রোজ রোজ একই কথা লিখতে কার ভাল লাগে বলো ? নতুন কথা কিছু থাকলে তবেই না লিখতে ইচ্ছে করে।

চন্দ্রা—আজ এই বিয়েব আলোচনা দিয়ে একটা চিঠি লিখে দাও না, এটা তো নতুন কথা ?

সেবন্তী—লিখব, কিন্তু একটি সর্তে।

চন্দ্রা—বল কি সর্ত ?

সেবন্তী—সর্তটা হল, তোমাকে শ্যামের গানটা একবার গাইতে হবে।

চন্দ্রা—ঠিক আছে, গাইব। হাসতে ইচ্ছে করছে তো। প্রাণ ভরে হেস। তবে চিঠিটা···

সেবন্তী—হ্যাঁ হ্যাঁ লিখবো। আগে গাও তো।

চন্দ্রা—তারপর তুমি ছুতো ধরবে আর লেখাটিও হবে না।

সেবন্তী—তোমার দিব্যি, ঠিক লিখব। গাও না।

চন্দ্রা গাইতে শুরু করে।···

তুম্ তো শ্যাম বড়ে বেখবর

তুম্ তো পীয়ো দুধ্ কে কুল্হড়, মেরী তো পানী পে গুজর্
মেরী তো পানী পে গুজর। তুম্ তো শ্যাম বড়ে বেখবর হো।

গানের শেষের কলিটা এমন বেসুরো গাইল যে সেবন্তীর পক্ষে হাসি আটকানো দায়। অনেক চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারল না ও। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবার উপক্রম যখন চন্দ্রা গানের শেষের ভাগ গাইতে আরম্ভ করল···

আপ তো শ্যাম রক্খো দো-দো লুগাইয়া
মেরী তো আপী পে নজর—আপী পে নজর হো
তুম্ তো শ্যাম···

"লুগাইয়া" শব্দের ওপর হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সেবন্তী। গান শেষ করে চন্দ্রা সজল চোখে বলল—অনেক তো হাসলে ভাই···এবার কাগজ কলম আনব ?

সেবতী—না, না, এখনই না। আরো খানিকক্ষণ হেসে নিই, তবে।

সেবতী দম ফাটিয়ে হাসছে, এমন সময় সেখানে কমলাচরণের আবির্ভাব ঘটল। পনের যোল বছরের তরুণ। পাকা গমের মত গায়ের রঙ্। দোহারা চেহারা। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। পরনে কিম্ভূত এক পোশাক। গায়ে সুগন্ধি আতরের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করছে। চোখে সুর্মা, মুখে মুচকি হাসি আর হাতে বুল্‌বুল নিয়ে চৌকিতে এসে বসল। হাসি থামিয়ে সেবতী বলল—কম্‌লু, মিষ্টি যদি খাওয়াস তো তোকে একটা এমন সুখবর দেব যে শুনেই তুই চমকে উঠবি।

কমল—মিষ্টি তোমাকে আজ আমি নিজে থেকেই খাওয়াব দিদি। তাতে তুমি সুখবর শোনাও চাই না-ই শোনাও। আজ এই ওস্তাদ খেল্ দেখিয়ে এমন জেতা জিতেছে না, যে শহরের প্রায় সব লোক একেবারে থ' মেরে গেছল। এই বলে কমলাচরণ হাতের বুল্‌বুলটাকে আঙ্গুলের ওপর চড়াল।

সেবতী—এই কথা! আর আমার খবরটি শুনে তুমি একেবারে আনন্দে ধেই ধেই করে নাচবে চাঁদ।

কমল—তবে আজ আর ও কথা শুনিয়ে কাজ নেই। একে নিয়ে সারাদিনটা এমনিতেই নেচে এসেছি। ওহ্, খুব মান যাহোক রেখেছে পাখিটা আজ। খেল্ যা দেখিয়েছে না, রীতিমত কসরৎ! নবাব মুন্না খাঁ বহুৎ মেজাজ দেখিয়ে এসেছিল এতদিন। আজ দিয়েছি ব্যাটার মুখের ওপর জবাব। জান দিদি, মাসখানেক আগে নবাবের মহল্লার কাছ দিয়ে আসছিলাম। আমায় দেখতে পেয়েই মস্করা করে কি বললে জান, বললে—কি মিঞা, আছে নাকি পাখি-টাখি তৈরী? থাকলে লড়ে যাও, হয়ে যাক এক হাত ছুয়ে-ছুয়ে পাঁচ! এই বলে ওর ধেড়ে ঘাগু বুল্‌বুল্‌টাকে হাতে তুলে দেখিয়েছিল। আমিও ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নই। বললাম, এখন নয় করুণানিধান, তবে ঈশ্বর যদি চান তো এক মাসের মধ্যেই আপনার সঙ্গে বাজি লড়ব। আজ ছিল

সেই দিন।...আগা শের্‌আলীর আখড়ায় বাজির জায়গা ঠিক হল। লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েৎ হয়েছে মাঠে। পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকার বাজি। নবাব সাহেবের বুল্‌বুল, বুলবুল তো নয়, বিশ্বাস কর, যেন একটা খেড়ে পায়রা। মাঠে নামল যেন নবাব বাহাদুর! কিন্তু আমার ছোট্ট বুল্‌বুল্‌ এমন প্যাঁচ মারল বাছাধন একেবারে মাটিতে কুপোকাৎ! সে কী কস্‌রৎ দিদি। সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল—দুচার ঘায়েই বাজি মাৎ। লোকজন আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল—হাউই উড়ল আকাশে। বেচারী নবাব সাহেব মুখ কালো করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। টাকা হেরেছেন বলে ওনার কোন দুঃখ নেই। টাকা তো ওঁর অঢেল আছে। কিন্তু সম্মান! সম্মানটি গেল তো একেবারে মাঠে মারা! পরে শুনলাম বাড়িতে ফিরে নবাব সাহেব নাকি ওঁর বুলবুলটাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছেন। এই বলে কমলাচরণ খল্‌খল্‌ করে হাসতে লাগল।

সেবতী—তাহলে আর দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন। আগরওয়ালার দোকানে লোক পাঠা।

কমল—তোমার জন্যে কি আনব বৌদি?

চন্দ্রা—দুধের ননী।

কমলা—আর দাদার জন্যে?

সেবতী—জোড়া-জোড়া গোপিনী।

এই বলে দুজনে মস্করা করে হেসে উঠল।

৭

সুবামা মন প্রাণ দিয়ে বিয়ের যোগাড়যন্ত্র করে চলেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওই একই কাজে সর্বদা ব্যস্ত। যোগ্য সহকারিণীর মত সুশীলা ওর আজ্ঞা পালন করে চলেছে প্রয়োজন মত। আর বিরজন! যার জন্য এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন, সে নিজের ঘরে একলাটি বসে মুখ লুকিয়ে সারাক্ষণ কাঁদছে! কারো হাতে বাড়তি এতটুকু সময় নেই যে খানিকক্ষণের জন্য হলেও ওকে গিয়ে শান্ত করে। বুঝিয়ে শুঝিয়ে ওর কষ্ট কমানোর চেষ্টা করে। এমনকি

প্রতাপকেও আজকাল কেমন নিষ্ঠুর মনে হয় বিরজনের। প্রতাপের মনও ভাল নেই এতটুকু। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যের সময় মুখ কালো করে ফিরে এসে নিজের ঘরে ঢোকে। তারপর চুপচাপ বসে থাকে আপনমনে। বিরজনের সঙ্গে দেখা না করার প্রতিজ্ঞা করেছে ও। দৈব্যাৎ যদি দেখা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সরে যায় সেখান থেকে। বিরজন কথা বলতে এলে এমন দুর্ব্যবহার করে যে ওর চোখ ভরে জল আসে। কতদিন কাঁদতে কাঁদতে সুবামার কাছে ছুটে গিয়েছে বিরজন...বলেছে, কাকী! লাল্লু আমার সঙ্গে কথা বলেনা কেন? ডাকলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। চল, তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে দেখবে চল। সুবামা ওকে নিয়ে প্রতাপের ঘরে ঢুকলেই প্রতাপ পালিয়ে যায়। বিরজন আবার কাঁদতে শুরু করে...তুমি বল কাকী, কি অপরাধ করেছি আমি ওর কাছে যে ও আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে? বল কাকী?...কি বলবে সুবামা...। ছেলের এই নিষ্ঠুরতার কারণ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে সে। কিন্তু কিছুতো করার নেই...আর তা বিরজনকেও বলার মত নয়।

বিয়ের আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। দূরের কাছের আত্মীয় কুটুম্বরা সব আসতে শুরু করেছে। উঠোনের মাঝখানে সুন্দর করে মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। কনের হাতে মঙ্গল সূত্র বাঁধা হয়েছে। এই সূত্র ধর্মের পবিত্র বেড়ী...যা, কখনও হাত থেকে খুলে যাবে না। আর বিবাহের মণ্ডপ হল প্রেম এবং দয়ার সেই প্রতীক যা সারা জীবন বর-বধূর মাথার ওপর ছায়ার মত ঘিরে থাকবে। আজ সন্ধ্যায় সুবামা আর সুশীলা দাসীকে নিয়ে মন্দিরে গেছে দেবীর পূজো দিতে। চাকর-বাকররা যে যার কাজে ব্যস্ত।...বিরজন আকুল হয়ে প্রতাপের ঘরে এসে ঢুকল। চারদিক নিঃশব্দ। সন্ধ্যের আবছা আলোয় প্রতাপকে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে এল ও। টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা টিম্‌টিম্ করে জ্বলছে। খাটে মুখ গুঁজে পড়ে আছে প্রতাপ। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় ওর মুখটা মলিন দেখাচ্ছে। ঘরের জিনিস-পত্র সব অগোছাল। মেঝের ওপর বইগুলো অবহেলায় পড়ে আছে

৮

ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সব দেখে মনে হচ্ছে মাসের পর মাস কেউ যেন এঘরে পা দেয়নি। আর প্রতাপ। একি সে-ই, সব কিছু যার থাকত সাজানো গোছান। প্রত্যেকটি জিনিস যার ছিল প্রাণের মত প্রিয়। বিরজনের ইচ্ছে হল ওকে জাগিয়ে দেয়। কিন্তু কি যেন ভেবে হঠাৎ মেঝের থেকে বইগুলো তুলে আলমারীতে গুছিয়ে রাখতে লাগল। বই গুছানো হলে দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো মুছে ঘর ঝাঁট দিল। হঠাৎ প্রতাপ পাশ ফিরে শুয়ে ককিয়ে উঠল···তোমায় ভুলবো কেমন করে বিরজন, ভুলতে তো তোমায় পারব না। একটু থেমে আবার বলতে লাগল···আমার বিরজন, কোথায় যাচ্ছ তুমি? আমার পাশটিতে এসে বসো! বসবে না তো? আচ্ছা, না বসলে, আমিও আর তোমার সঙ্গে কথা বলব না কোনদিন। একটু দম নিয়ে আবার বকতে শুরু করল। আচ্ছা যাও···, দেখি তুমি কোথায় যেতে পার···কথা বলতে বলতেই ও খাট ছেড়ে উঠে যেন বিরজনকে ধরার জন্য দরজার দিকে ছুটে গেল। ঘুমের ঘোরে বিরজনের হাতটা ধরতেই ঘুমের ঘোর কাটল প্রতাপের। সামনে বিরজনকে দেখে মিনিট খানেক শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর চমকে উঠে ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল—তুমি কখন এলে বিরজন? এতক্ষণ তোমারই স্বপ্ন দেখছিলাম। কথা বলতে চাইল ও, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে প্রতাপ জিগ্‌গেস করল—এসব বুঝি তুমি পরিষ্কার করলে? খুব কষ্ট হয়েছে তো তোমার? এবারও বিরজন নিরুত্তর।

প্রতাপ—আমায় ভুলে যাচ্ছ না কেন?

আর্দ্র চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বিরজন উত্তর দিল—আমায় কি তুমি ভুলে গেছ?

লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করল প্রতাপ। খানিকক্ষণ কি এক চিন্তার মগ্ন হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। এবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বিরজন—আমার ওপর রাগ করে আছ কেন? কোন্ অপরাধ করেছি আমি তোমার কাছে?

প্রতাপ—জানি না, তবে আজকাল তোমাকে দেখলেই শুধু মে
হয় কোথাও চলে যাই—যেখানে হোক।

বিরজন—আমার জন্যে তোমার কি একটুও মায়া হয় না? দি
রাত আমি শুধু কাঁদছি। আমার ওপর দয়া হয়না! আমার সঙ্গে কথ
সুদ্ধু বল না। কি অন্যায় করেছি বল, বল প্রতাপ?

প্রতাপ—তোমার ওপর আমি থোড়াই রাগ করেছি।

বিরজন—তাহলে আমার সঙ্গে কথা বল না কেন?

প্রতাপ—তোমাকে শুধু ভুলে যেতে চাই। তোমরা বড়লোক
আমি অতি সামান্য একজন অতিথি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কট
কি?

বিরজন—এতদিন তো এসব ছুতো করনি। হঠাৎ কি এখ
বড়লোক হয়ে গেলাম নাকি?

বিরজন কাঁদছিল। প্রতাপ থমকে গিয়ে ফের বকতে শুরু করল···
তুমি আমি, অনেকদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি। এবারে ছাড়াছাড়ির সম
হয়েছে। আর কদিনের মধ্যে এখানকার সবাইকে ছেড়ে তুমি তোমা
শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। এ কদিনের মধ্যে নিশ্চয় তুমি আমাকে ভুলে
যাবে। এজন্য আমি খুব চাইছি এই সময়টুকুর মধ্যে তোমাকে ভুলে
যেতে। কিন্তু যতই ভাবি তোমার কথা আর মনে আনব না তং
বেশী করে যেন মনে পড়ে। কিছুতে ভুলতে পারছি না। এই দেখ না
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমারই স্বপ্ন দেখছিলাম।

ডেপুটি শ্যামাচরণের গৃহ আজ সুন্দরী সমাবেশে ইন্দ্রপুরী হয়ে
উঠেছে। সেবতীর চার সখী, রুক্মিনী, সীতা, রামদই আর চন্দ্র কুঁয়
যথেচ্ছ সাজগোজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ডেপুটি সাহেবের ভগিনী জানকী
কুঁয়র ইতিমধ্যেই দুই কন্যাসহ এটোয়া থেকে এসে হাজির হয়েছে
উমা দেবী কুমারী। মণ্ডপের তলায় বিবাহ-সংগীত আর বাক্যালাপ
দুইই সমান তালে চলছে। গুলাবিয়া নাপ্‌তানী আর যমুনী কাহারনী

দুজনেই চটকদার শাড়ী পরেছে। মাথাভর্তি সিঁদুর লাগিয়ে, গিল্টি করা বালা পরে ছম্‌ছম্‌ পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। গুলাবিয়া চপলা, নবযৌবনা। যমুনা পড়তির মুখে। সেবতীর কথা আর বলার কি আছে! আজত ওর নতুন ছটা! রসালো চোখ আমোদের আধিক্যে মাতোয়ারা। তার ওপর গোলাপী শাড়ী পরায় ওর চাঁপার বরণ গোলাপী দেখাচ্ছে। সঙ্গে ধানী রঙের মখমলের কুর্তী দারুণ মানিয়েছে। সগু স্নান করে আসার জন্য পিঠের ওপর চুলগুলো ছড়ানো। যেন সহস্র নাগিনীর ফণা! এর ওর পেছনে লেগে ছট্‌ফট্‌ করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে চুলটা বাঁধার আর সময় পাচ্ছিল না।

রুক্‌মিনী সেবতীকে বলল, সিত্তো? তোর বৌদি কোথায় রে? দেখছি না তো? আমাদের বেলায়ও পর্দা নাকি?

রামদই (হেসে)—পর্দা হবে না কেন? আমাদের নজর লেগে যাবে না?

সেবতী—ঘরে শুয়ে আছে বোধহয়। ছাখ না, এক্ষুণি হিড়হিড় করে টেনে আনছি।

সেবতী—ছুটতে ছুটতে চন্দ্রার ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটা আটপৌরে শাড়ী পরে দরজার দিকে অপলক চেয়ে পালঙ্কে শুয়ে ছিল চন্দ্রা। সেবতীকে ঢুকতে দেখেই উঠে পড়ল। সেবতী জিজ্ঞেস করল—এখানে পড়ে আছ যে! একলা মন খারাপ করছে না?

চন্দ্রা—উঁহু। কে আর যায়। এখনও কাপড়ই তো পালটাইনি।

সেবতী—তা পাল্টাওনি কেন? ওদিকে তোমার জন্যে আমার বন্ধুরা পথ চেয়ে বসে আছে।

চন্দ্রা—এখন পাল্টাব না।

সেবতী—তোমার এই জেদ আমার ভাল লাগে না বৌদি। আমার বন্ধুরা সবাই কি ভাবছে বলতো?

চন্দ্রা—তুমি তো চিঠিটা পড়েছিলে। আজই আসবে লিখেছিল না?

সেবতী—আচ্ছা! আচ্ছা! এ তারই প্রতীক্ষা…তাই বল! আর

তাই তার যোগ সাধনা হচ্ছে ?

চন্দ্রা—দুপুর তো হয়ে গেল, তাহলে বোধ হয় আজ আর আসবে না।

এর মধ্যে কমলা আর উমা দেবী এসে হাজির হল। ওদের দেখে চন্দ্রা ঘোমটা টেনে মেঝেতে গিয়ে বসল। কমলা সম্পর্কেওর বড় ননদ।

কমলা—আরে! এখন পর্যন্ত কাপড়টাও পাল্টাওনি ?

সেবতী—দাদার পথ চেয়ে বসে আছে। তাই এই বেশ।

কমলা—তুই একটা মুখ্যু। ওর যদি গরজ থাকে তবে নিজেই আসবে।

সেবতী—এর কথা ভিন্ন দিদি।

কমলা—পুরুষদের সঙ্গে যত ইচ্ছে প্রেম কর, মুখে একটাও সুখের কথা বলবি না, না হলেই মিথ্যে পিছে লেগে জ্বালাবে। যদি ওদের উপেক্ষা করিস, কথা বন্ধ করিস, তাহলে দেখবি তোকে মাথায় করে নাচছে। খাতির তোর কত বেড়ে যাবে! তোর পায়ে প্রাণ সঁপে দেবে। যদি কোন রকমে একবার টেরটি পায় তুই ওর প্রেমে মজেছিস তাহলেই হল, সেদিন থেকেই ওর দৃষ্টি অন্য দিকে ছুটবে। বাইরে যদি বেরুলো তো নির্ঘাৎ রাত করে ফিরবে। খেতে বসে দু-গরাস মুখে দিয়েই উঠে পড়বে। কথায় কথায় রেগে যাবে। তুই যদি কাঁদিস, মিছে কথা বলে তোর মন ভোলাবে। কিন্তু, ফন্দি এঁটে তোকে জব্দ করতে পেরেছে বলে মনে মনে বেশ খুশীই হবে; তোর সামনে অন্য মেয়েদের ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশংসা করবে। সোজা কথা মেয়েদের জ্বালানতেই পুরুষদের আনন্দ। এই আমার ব্যাপারটাই ছাখ্ না। প্রথম প্রথম এত ভালবাসত যে কি বলব। সারাক্ষণ গোলামের মত হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকত। পাখা দিয়ে বাতাস করত। খাইয়ে দিত নিজের হাতে। এমনকি (হেসে) পা টিপে দিতেও সঙ্কোচ করত না। মুখ দিয়ে একটা কথা বার করলেই হল, সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হয়ে যেত। আমি যে কি বোকা ছিলাম সে সময়ে। পুরুষদের ছল চাতুরীর কিই বা বুঝি ? ওর ফাঁদে পা দিলাম। মিথ্যে বলছি না, সেদিন থেকেই

ওর মেজাজ গেল পাল্টে। ঝামেলা করতে শুরু করল। একদিন রাগ করে বেরিয়ে গেল। গলায় মালা ঝুলিয়ে, গায়ে আতর মেখে বাবু মাঝরাতে বাড়ি ফিরলেন। ভেবেছিল, জোড় হাতে ওর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকব। আমিও কি কম যাই। রাতভর দেয়ালের দিকে মুখ করে পড়ে রইলাম। পরের দিনও কথা বললাম না। শেষে মহাশয় সিধে হলেন। পায়ে ধরল! কেঁউ কেঁউ করল। তখন থেকে এ-কথা বুঝে নিয়েছি, আর যাই কর পুরুষকে ভালবাসার কথা কখনও জানিও না।

সেবতী—জামাইবাবুকে আমি দাদার বিয়েতে দেখেছি। বেশ হাসি খুশি মানুষ কিন্তু।

কমলা—তখন পার্বতী পেটে। তাই আসতে পারিনি। ফিরে গিয়ে তোর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। তুই নাকি ওকে পান দিতে গিয়েছিলি। বলেছিল, তোর নাকি হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে কত গল্প করেছে।

সেবতী—মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে কথা। গুলাবিয়া আর যমুনী কি কাজে বাইরে গেছিল। মা বললেন পান তৈরী আছে জামাইবাবুকে দিয়ে আসতে। পান নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি বাবু তক্তাপোষে শুয়ে আছেন। পান দিতে হাত বাড়িয়েছি, কনুইটা খপ করে ধরে বললেন—একটা কথা আছে শোন। আমি তক্ষুনি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। বলে কিনা পাশে বসিয়ে গল্প করেছে? কি মিথ্যুক রে বাবা!

কমলা—তবে···! মিথ্যে কথাটা কেমন বেরিয়ে গেল! তাই তো বলি! এগার বার বছরের একটা পুঁচকে মেয়ে তার সঙ্গে এত গল্প কিসের হবে! পুরুষদের যত লম্বা চওড়া কথা! তোর জামাইবাবু ভাবখানা এমন দেখিয়েছিল, যেন কথাটা একেবারে নির্জলা সত্যি। শুধু বড় বড় বাৎ···এই করেছি, সেই করেছি। শুনতে শুনতে গা যেন আমার একেবারে জ্বলে যায়। নিজেদের মিথ্যে অপবাদ দিয়ে ওরা যে কি সুখ পায় কে জানে বাবা! করবে এতটুকু, বলবে এতটা! আমি তারপর থেকে কোন দিনই ওর একটা কথাও সত্যি বলে

ধরি না।

ইতিমধ্যে গুলাবিয়া সেবতীকে এসে খবর দিল উঠানে ওর বন্ধুরা ওকে ডাকছে।

সেবতী—দেখ বৌদি আর দেরী করো না। গুলাবিয়া, তোরঙ্গ থেকে বৌদির কাপড় বের করে দে তো?

সেবতী বন্ধুদের কাছে চলে যেতে কমলা চন্দ্রাকে সাজাতে বসল। সেবতী আসতে রুক্‌মিনী বলল—বাঃ বোন্ বেশ! ওখানে গিয়ে গল্প করতে বসলি—তোদের দেয়ালের সঙ্গে কথা বলব নাকি?

সেবতী—নারে, কমলা দিদি এসে হাজির হল। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল। দুজনে এই এল বলে।

রুক্‌মিনী—ওঁর ছেলেপুলে আছে না?

সেবতী—হ্যাঁ, তিন ছেলে।

রামদই—যাই বল্, শরীরের বাঁধুনী কিন্তু খুব ভাল।

চন্দ্রকুঁয়র—আমার কিন্তু ওর নাকটা ভারি সুন্দর লাগে। ইচ্ছে করে কেড়ে নিই।

সীতা—দুই বোনই খুব সুন্দরী।

সেবতী—সীতাকে ভগবান ভাল বর দিয়েছে। ও যে সোনার গরুর পুজো করে ছিল।

রুক্‌মিনী (ঈর্ষা ভরে)—ধলা চামড়া হলেই হয় না।

সীতা—তোর হয়তো কালোই পছন্দ।

সেবতী—আমার যদি কালো বর হত, বিষ খেতাম।

রুক্‌মিনী—যা মন চায় তোদের, বল। আসলে কিন্তু সুখ পাওয়া যায় কালো বরে।

সেবতী—সুখ? না ধুলো ময়লা? গ্রহণের মতো এসে ঝাপটে ধরে।

রুক্‌মিনী—এই তো তোদের ছেলেমানুষি। তোরা তো জানিস না, সুন্দর পুরুষরা শুধু নিজেদের সাজগোজেই মেতে থাকে। নিজেকে ছাড়া ওদের বৌ-এর দিকে নজর দেবার সময় কোথায়? বৌ যদি

পরমা সুন্দরী হয় তো তরে গেল। না হলেই ব্যস্, পুরুষটি ভাবতে শুরু করে অতি অনায়াসেই ও সুন্দরী মেয়েদের মন কাড়তে পারে, আর তখনই ওর নজর যায় বাইরের দিকে। এদিকে ঘরের বৌ এক কোণে একলাটি পড়ে থাকে অনাদরে। আর পুরুষ যদি সুন্দর না হয় তাহলে সুন্দুরী বৌ পেয়ে ভাবে হীরের খনি বুঝি বা হাতে পেয়ে গেছে। বেচারা কালো মানুষ, নিজের রূপের খামতি ভালবাসা আর আদর দিয়ে পূরণ করে। সব সময়ই তো ভয়ে প্রাণ ধুক্পুক্ করছে, বৌ-এর এতটুকু অনাদর হলে যদি তাকে ঘেন্না করে!

চন্দ্রকুঁয়র—সেই বরই সব চেয়ে ভাল, মুখ দিয়ে কথা বার করতে না করতে যে তা পূরণ করে!

রামদই—থাক্ থাক্! তোর কথা আর বলিস না। কেবল ভাল ভাল গয়না পেলেই হল, তা বর সে যেমনই হোক না কেন।

সীতা—আমার তো ওঁকে দেখলেই মন ভরে যায়। কাপড় গয়নার কথা মনেই আসে না।

এই সময় আর এক সুন্দরী এসে হাজির হল। গয়নায় সর্বাঙ্গ মোড়া। পায়ে সুন্দর জুতো! সুগন্ধে ম ম করছে দেহ। দুচোখে চাপল্য উথলে উঠছে।

রামদই—আরে রাণী! আয় আয়! তোর অভাবেই ঠিক জমছে না।

রাণী—কি করবো! নিগোড়ী নাপ্তানী ছাড়ছিলই না। শেষে কুসুমের মা এল তারপর খোঁপা বাঁধল।

সীতা—তোর জ্যাকেটটার ভাই বলিহারি!

রাণী—এটার কথা আর বলিস না ভাই। এক মাস হল কাপড় দিয়েছি। দরজি দশবার সেলাই করে আনল। কিন্তু ঠিক আর হয় না কিছুতে। কখনো বা আস্তিন ঢিলে—কখনো আবার বেঢপ মাপ। শেষমেশ এই অবস্থায় দিয়ে গেল।

এইসব কথা হচ্ছিল। এমন সময় মাধবী চেঁচাতে লাগল—দাদা এসেছে, দাদা এসেছে। সঙ্গে জামাইবাবুও এসেছে। ওহো! কি মজা!

রাণী—রাধাচরণ এল নাকি ?

সেবতী—হ্যাঁ। যাই বৌদিকে সুখবরটা দিয়ে আসি। কিরে, কোথায় বসেছে ওরা ?

মাধবী—ওই বড় ঘরেই। জামাইবাবু মাথায় পাগড়ি বেঁধেছে। জান, দাদা গায়ে কোট পরেছে ! আমাকে টাকা দিয়েছে জামাইবাবু। এই বলে হাতের মুঠো খুলে দেখাল মাধবী।

রাণী—সিত্তো, এবার মুখমিষ্টি করা।

সেবতী—কেন, আমি কি মানত করে ছিলাম নাকি ? এই বলতে বলতে সেবতী চন্দ্রার ঘরে ঢুকল। চন্দ্রা বসেছিল। সেবতী বলল—নাও বৌদি, এবার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হল।

চন্দ্রা—উনি এসে পড়েছেন ? ওঁকে একবার ভেতরে ডেকে দাওনা ভাই।

সেবতী—হ্যাঁ, পুরুষদের মাঝখানে যাই···তোমার নন্দাইও এসেছেন যে !

চন্দ্রা—বাইরে বসে কি করছে ? কাউকে পাঠিয়ে ডেকে নিতে, না হলে অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে লেগে যাবে।

হঠাৎ খড়মের শব্দ শোনা গেল রাধাচরণ ঘরের দিকেই আসছে। বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে না। হাসিখুশি মানুষ। গৌর-বর্ণ, ইংলিশ কাট চুলের ছাঁট, ফ্রেঞ্চ দাড়ি। পাতলা রেশমী জামা গায়ে। ঘরে ঢুকে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে সেবতীকে বলল,—কিরে সিত্তো ! এক সপ্তাহ ধরে চিঠি লিখিসনি কেন ? ভেবেছিলাম এবারেও কয়েক দিনের মধ্যেই তো এসে যাবে। খামকা আর চিঠি লিখি কেন। কথা শেষ করেই সেবতী চলে গেল ঘর থেকে।

চন্দ্রা ঘোমটা উঠিয়ে বলল—ওখানে গেলেই ভুলে যাও।

রাধাচরণ—(চন্দ্রাকে বুকে জড়িয়ে ধরে) তাই তো কয়েক শ' ক্রোশ থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি।

বিরজনের বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকেই প্রতাপচন্দ্র ওর ঘরে আসা বন্ধ করেছিল। বিয়ের কোন কাজেই ও যোগ দেয়নি। এমন কি বিয়ের মজলিসেও অনুপস্থিত রইল। বিষণ্ণ মনে মুখ কালো করে নিজের ঘরেই কাটিয়ে দিল পুরো সময়টা। মুন্সী সঞ্জীবনলাল, সুশীলা, সুষমা সবাই মিনতি করে করে হার মানল। বরযাত্রীদের দিকে মুখও ফেরাল না প্রতাপ। দেখে শুনে মুন্সীর মন ভেঙে গেল, পুনরায় আর এ নিয়ে কোন কথাই বলেননি তিনি। বিয়ে পর্ব না চোকা পর্যন্ত ঠিক এমনি ভাবেই কাটাল প্রতাপ। বিয়ে মিটে যাবার পর প্রতাপ ও বাড়ির রাস্তা ত্যাগ করল। স্কুল যায় তো এমন ভাবে এক ধার দিয়ে যেন ও মুখে কোন বাঘ বসে আছে! কিম্বা কোন খাতক মহাজনের চোখ এড়িয়ে সরে পড়ছে। বিরজনের ছায়া দেখলেই ও সভয়ে পালিয়ে যায়। কখনো যদি নিজের ঘরে বিরজনকে দেখতে পায় তো ঘরে পা পর্যন্ত রাখে না। সুষমা কত বুঝিয়েছে, বাবা বিরজনের সঙ্গে এমন নির্দয় ব্যবহার কর কেন? কেন ওর ওপর রাগ করে আছ? ও এখানে এসে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু কাঁদে। ওর অপরাধ কি, যে তুমি ওর ওপর রাগ করে আছ? দেখো বাবা, তোমরা দুটিতে কতদিন এক সঙ্গে বড় হয়েছ, থেকেছ। তুমি তো ওকে কত ভালবাসতে। হঠাৎ তোমার কি হল? যদি তুমি এমন রাগ করে থাক বেচারী মেয়েটার একেবারে প্রাণের ওপর উঠে যায়। ওকে দেখে আমার বড় মায়া হয়। তোমাকে ছাড়া ও তো আর অন্য কোন কথাই ভাবে না।

মুখ নীচু করে চুপচাপ সব কথা শোনে প্রতাপ। তারপর কোন উত্তর না দিয়েই নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে যায়।

প্রতাপ আর এখন অবোধ বালক নয়! ওর জীবনবৃক্ষে যৌবন-পুষ্পের বিকাশ ঘটেছে অনেকদিন হল। যৌবনপুষ্পোদ্গমনের প্রদোষ থেকেই ওর নিজের জীবন বিরজনের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছিল ওতপ্রোত ভাবে। কঠিন বাস্তবের নির্দয় কঠোরতায়, বিরজনকে ঘিরে ওর সব মধুর স্বপ্ন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। ওর

কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হল। নিজের বিচার অনুযায়ী যে বিরজনকে তার সর্বস্ব ভাবত তারই কেউ হল না। আর যে ক্ষণমাত্রেও বিরজনকে তার মনে স্থান দেয়নি, তারই হল ও সর্বস্ব! এই ভাবনায় প্রতাপের হৃদয় ক্রমশ ব্যাকুল হতে লাগল। প্রতাপ চাইছিল যারা ওর এই সুন্দর স্বপ্নের সৌধকে ধ্বংস করে তার জীবনের সমস্ত আশাকে মাটিতে মিলিয়ে দিয়েছে, তাদের সব কিছু ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। সবচেয়ে যার ওপর ওর রাগ হত, সে বেচারী সুশীলা।

ধীরে ধীরে এমন অবস্থা হল যে প্রতাপ স্কুল থেকে ফিরেই কমলা-চরণ সম্বন্ধে কোন না কোন ঘটনার কথা অবশ্যই বর্ণনা করত। সুশীলা যদি সামনে উপস্থিত থাকত তাহলে তো আর কথাই নেই। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বেশী করেই কমলাচরণের ব্যাখ্যান করত, যাতে সুশীলা কষ্ট পায়। কারণ সুশীলাকে কষ্ট দিতে পারলেই ও খুশী হত। মিথ্যে কথা বলতে প্রতাপ ঘৃণা করত তাই যা কিছু ও বলত সত্য কথাই বলত। তবুও ওর কথা বলার ধরণটা ছিল এমন হৃদয়বিদারক যে সুশীলার বুকে তা শেল হানত। প্রতাপ বলত—এই তো সেদিন কমলাচরণকে তিন পায়ার ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল, মাথা প্রায় আকাশ ছুঁই ছুঁই। তবু কি ওর লজ্জা আছে। বাইরে বেরিয়ে নির্লজ্জের মত হাসতে লাগল। আজ জোর তামাশা হয়েছে। ক্লাশে কমলাচরণ একটা ছেলের ঘড়ি গায়েব করল। ছেলেটা মাস্টারের কাছে নালিশ করল। কেননা কমলা ওর পাশেই বসেছিল। মাস্টার খোঁজ করে মশাইয়ের ফেট্টি থেকেই ঘড়িটা বার করলেন। এর পর আর কি, হেড্ মাস্টারের কাছে রিপোর্ট করা হল। শাস্তি হিসেবে তিন ডজন বেত খেল মাস্টার মশাই-এর কাছে। সারা স্কুল এই কাণ্ড দেখেছে মজা করে। বেত চলছিল যখন কমলাবাবু তার স্বরে চেঁচাচ্ছিল—কিন্তু বাইরে বেরিয়ে আসতেই গোঁফে তা দিয়ে বেহায়ার মত হাসতে লাগল। কাকী শুনছ? আজ স্কুলের ফটকের কাছে ছেলেরা কমলাচরণকে আচ্ছা করে পিটিয়েছে? মারতে মারতে বাছাধনকে একেবারে বেঁহুশ করে দিয়েছে? সুশীলা এসব কথা যত শুনত ভেতরে ভেতরে ততো গুমরে মরত। তবে

বিরজনের সামনে এসব কথা প্রতাপ কোনদিনও বলেনি।

সঞ্জীবনলাল মাঝে কয়েকবার প্রতাপের কথা সত্য কিনা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। মিথ্যে প্রতাপ বলেনি। কখনও কমলাচরণকে হাটের মাঝে বুলবুলের লড়াই করতে দেখেছেন। কখনও বা গুণ্ডাদের সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে অভব্যের মত সিগারেট ফুঁকতে দেখেছেন। জামাতা বাবাজীবনের এই অশালীন আচরণ লক্ষ্য করে মুন্সীজী ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর ওপর রাগে ফেটে পড়তেন। বলতেন—সব তোমারই কীর্তি। তুমিই বলেছিলে ঘর বর দুইই ভাল। এখানে বিয়ে দেবার জন্যে তুমিই তো ক্ষেপেছিলে। দোষারোপ করার সময় সঞ্জীবনলাল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। একবারও তাঁর মনে হত না দোষ যদি হয়ে থাকে সে দোষের ভাগী তিনিও সমান ভাবে। তিনিও তো ছেলের বাপের কৌলিন্য আর বৈভব দেখে ভুলেছিলেন। ছেলেটির সম্পর্কে খোঁজ খবর করার কোন তৎপরতাই তো তিনি দেখাননি? মেয়েরা ঘরে বন্দী থাকে। বাইরের জগতের কতটুকু খবর তারা রাখে! রাজী তো তিনিও হয়েছিলেন এ বিয়েতে।

পুরুষ হিসেবে অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অকর্মণ্যতা আর আলস্যে মুন্সীজী ভাল করে খোঁজটুকু পর্যন্ত করেননি। এই ভারত-বর্ষে মুন্সীজীর অগণিত বন্ধুবর্গ বিদ্যমান, যারা তাঁদের প্রিয় কন্যাদের ঠিক এই ভাবেই চোখ বন্ধ করে কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন।

সুশীলার কাছে, জগতে বিরজনের চেয়ে প্রিয় আর কিছুই ছিল না। বিরজন ওর প্রাণ, বিরজন ওর ধর্ম, আর বিরজনই ছিল ওর কাছে সত্য। ওই ছিল ওর প্রাণাধার, ওর নয়নের জ্যোতি আর হৃদয়ের উদ্যম। সুশীলার জীবনের একমাত্র অভিলাষ ছিল ওর প্রাণাধিক প্রিয় বিরজন ভাল ঘরে পড়ুক। ওর শাশুড়ী, শ্বশুর হোক দেব সমতুল্। পতি হোক শিষ্টতার প্রতিমূর্তি। আর শ্রীরামচন্দ্রের মতো হোক সুশীল। ওর আদরের বিরজনের জীবনে কষ্টের ছায়াপাতও যেন না ঘটে। অনেক গুলোকে হারিয়ে, অনেক মানত করে ও এই

মেয়েকে পেয়েছিল। সুশীলার এক মাত্র কামনা ছিল ওর এই সহজ সরল কন্যাকে মরণ পর্যন্ত চোখের আড়াল হতে না দেওয়া। জামাই ওকে মা বলে ডাকবে। সেও জামাইকে নিজের ছেলের মতই স্নেহের আড়াল দিয়ে রাখবে। যার হৃদয়ে এই তীব্র কামনা তিল তিল করে জমেছে, তার প্রতি এই নিদারুণ হৃদয়বিদারক আচরণের কি প্রভাব যে পড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

হায় ভাগ্য! বেচারী সুশীলার সকল মনোরথ মাটিতে মিলিয়ে গেল। কুয়াশায় ঢাকল ওর সারা আকাশ। কি ভেবেছিল আর কি হয়ে গেল। তবু বার বার মনকে সান্ত্বনা দিত সুশীলা, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমলাচরণ এসব বদঅভ্যাসগুলো নিজেই ত্যাগ করবে একদিন। কমলাচরণ সম্পর্কে কুবাক্য শুনতে শুনতে সুশীলার মন ভেঙে যেতে লাগল। একটি ঘা শুকোতে না শুকোতে নতুন করে আবার আঘাত এসে পড়ে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত সুশীলা ভাবে···হায়, জানি না, বিরজনের ভাগ্যে কি লেখা আছে। ওই গুণের প্রতিমূর্তি আমার আঁধার ঘরের দীপ্তি, আমার প্রাণ, এই অসৎ মানুষটার সঙ্গে জীবন কাটাবে কেমন করে? আমার শ্যামা (পাখী) কি শেষে ওই শকুনের শিকার হবে। এইসব নানান কথা ভেবে সুশীলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাঁদত। প্রথম প্রথম বিরজনকে সে কখনো কখনো বকাঝকা করত। এখন ভুলেও কিছু বলে না। ওর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে পুরানো সব কথা যেন মনে পড়ে সুশীলার। এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে তাই চোখের আড়ালও হতে দিত না। খানিকক্ষণের জন্যেও যদি বিরজন সুবামার ঘরে যেত ত' সুশীলাও সেখানে হাজির হত। ওর মনে হত কেউ যেন ওর মেয়েকে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঘাতকের ছুরির নীচে নিজের বাছুরকে দেখে গাভীর প্রতিটি লোম যেমন খাড়া হয়ে ওঠে সে রকম বিরজনের দুঃখের চিন্তা অহরহ সুশীলাকে সন্ত্রস্ত করে রাখত। সংসারের সব কিছুই ওর চোখে শূন্য হয়ে পড়েছে। নীড় থেকে নিজের শাবক হারিয়ে গেলে পাখীর মনের যেমন অবস্থা হয় তেমনি আজকাল ক্ষণকালের জন্যেও

বিরজনের অদর্শন সুশীলার মনে দুর্ভাবনার ঝড় তোলে। ব্যাকুল হয়ে ওঠে ও।

এমনই ত' সুশীলার রোগজীর্ণ শরীর, তারওপর ভবিষ্যতের এই দুশ্চিন্তা আর জ্বালা ওর শরীরটাকে আরো জীর্ণ ও দুর্বল করে দিল। কমলাচরণের বিদ্রূপ সমালোচনায় ওর বুকটা চালুনির মতো ঝাঁঝরা হয়ে গেল। ছ'মাসও গেল না শরীরে ক্ষয় রোগের লক্ষণ দেখা দিল। কিছুদিন সাহস করে নিজের দুঃখকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল সুশীলা। কিন্তু সে আর কতদিন! রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। শরীরে রোগের লক্ষণ আরো প্রকট হল। একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়ল সে। ডাক্তার বৈদ্যের চিকিৎসা চলল অবিরাম, সঙ্গে বিরজন আর সুবামার রাত্রদিন নিরলস সেবা। সর্বদা ওরা দুজনে সুশীলার শয্যা পাশে বসে থাকে। বিরজনকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া করে না। কোন সময় যদি কাছে দেখতে না পায় ব্যাকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। প্রথম প্রথম অসীম ধৈর্য আর অটুট মনোবল নিয়ে মুন্সী সঞ্জীবনলাল স্ত্রীর চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। কিন্তু সুশীলার শারীরিক অবস্থার ক্রমঅবনতি ওঁকে ক্রমশ হতাশ করল। সঞ্জীবনলাল সব উদ্যম সব সাহস হারিয়ে রুদ্ধবাক হয়ে পড়লেন। আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন সুবামা রোগাক্রান্ত হয় সুশীলা তখন অক্লান্ত সেবা শুশ্রূষা করে সুবামাকে সুস্থ করে তোলে। এবার সুবামার পালা। আর সুবামাও অক্লান্ত সেবায় প্রতিবেশী এবং ভগিনীর ধর্ম যথাযথ পালন করে চলেছে। রোগীর সেবায় নিজের গৃহকর্ম ভুলেছে। এমনও অবস্থা গেছে পর পর দু তিন-দিন প্রতাপের সঙ্গে কথা বলারও অবসর তার মেলেনি। অনেকদিন না খেয়েই স্কুলে চলে গিয়েছে প্রতাপ। কিন্তু কখনও কোন অপ্রিয় শব্দও মুখ দিয়ে বের হয়নি ওর। সুশীলার রুগ্ন অবস্থা প্রতাপের ক্রোধ ও ঈর্ষার আগুনকে অনেক কমিয়ে দিয়েছিল। দ্বেষের আগুন যার কারণে, তার উন্নতি আর দুর্দশার সঙ্গে তাল রেখে যেন এই আগুন তীব্র ভাবে জ্বলে ওঠে আবার যখন তার জীবনদীপ প্রায়

নির্বাপিত তখন তা শান্ত হয়ে আসে।

সুশীলা সুস্থ থাকাকালীন কতদিন এমন হয়েছে, প্রতাপ না খেয়ে স্কুলে যাচ্ছে শুনে বৃজরানী তাকে খেয়ে যাবার জন্য কত জোর করেছে কিন্তু প্রতাপ তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি, কথা সুদ্ধ না বলে অবহেলায় চলে গেছে ওকে কাঁদিয়ে। নিঃসন্দেহে ও বিরজনকে পুরোপুরিই নির্দোষ মনে করত। কিন্তু যে সম্পর্ক মাস কয়েকের মধ্যেই ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাবে অবধারিত ভাবেই, ও তাকে আগেই ভেঙে দিতে চেয়েছে। একা বসে অসহায়ের মত প্রতাপ ওর সব হারিয়ে ফেলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। কিন্তু বাইরে এই প্রেমের প্রকাশ ও কথনো হতে দিত না।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে প্রতাপ নিজের ঘরে চুপচাপ বসেছিল। এমম সময় বিরজন ঘরে ঢুকল। ওর গাল অশ্রুসিক্ত, জোরে জোরে ফোঁপাচ্ছে। হতাশাতাড়িত মুখ, করুণ দৃষ্টি। বিরজনের এ-দুরবস্থা প্রতাপ সহ্য করতে পারছিল না। ওর চোখেও জল ভরে এল। —বলল, কি হয়েছে বিরজন? কাঁদছ কেন? উত্তর দিতে পারেনি বিরজন—বরং আরো জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে দিল। নিজেকে আড়াল করে রাখার সব গাম্ভীর্য দূর হয়ে গেল প্রতাপের। নিঃসঙ্কোচে ও বিরজনের চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগল। বিরজন নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—মা আর বাঁচবে না লাল্লু। আমি কি করব? এই বলতে বলতে ও আবার ফোঁপাতে লাগল।

একথা শুনে প্রতাপ স্তব্ধ হয়ে গেছিল। দৌড়ে বিরজনদের বাড়ি গিয়ে সুশীলার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

আমাদের অন্তিম কাল কি মহান! যে কিছুদিন আগেও আমাদের সুখ সহ্য করতে পারত না, তাকেই আমাদের কাছে টেনে আনে। এই শক্তির অতিরিক্ত সংসারে অন্য কোন শক্তি তাকে পরাজিত করেছিল। কিন্তু এই চরম ক্ষণটি এমনই সবল যে শক্তিশালী শত্রুকেও আমাদের অধীনস্থ করে। যার ওপর আমরা কখনও বিজয়ী হতে পারিনি তাকেই আমাদের কাছে পরাজিত করে। যে শত্রুর

ওপর কখনও অধিকার স্থাপন করা ছিল দুঃসাধ্য এই মুহূর্তে শরীর শক্তিহীন হয়ে গেলেও তাঁর ওপর আমাদের বিজয়ী করে দেয়। আজ পুরো এক বছর বাদে প্রতাপ এই ঘরে পদার্পণ করল। সুশীলার চোখ বন্ধ ছিল, কিন্তু মুখমণ্ডল এমন উদ্ভাসিত যেন প্রভাতের সদ্য ফোটা পদ্মফুল। আজ সকাল থেকেই সুশীলা বারবার প্রতাপকে দেখতে চেয়েছে। এইজন্যই সুবামা বিরজনকে প্রতাপের কাছে পাঠিয়েছিল।

সুবামা বলল—বোন চোখ খোল, লল্লু এসেছে।

সুশীলা চোখ খুলল আর দুই হাত আন্তরিক ভালবাসায় প্রতাপের দিকে বাড়িয়ে দিল। প্রতাপের মনে যেটুকু বিরোধ ছিল তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত বিলীন হল। এই সময়ও যদি কেউ মনের ময়লা রেখে দেয় তবে সে মানুষ হিসেবে পরিচয় দেবার যোগ্য নয়। প্রতাপ সত্যি সত্যিই সন্তানবৎ এগিয়ে গিয়ে ভালবাসায় ভরা বাহু দুটিকে জড়িয়ে ধরল। আধঘন্টা ধরে কাঁদল দুজনে। সুশীলা ওকে এমন আঁকড়ে ধরেছিল যেন ও কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে। প্রতাপ এই সময় নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল—মনে মনে—আমিই এই দুঃখিনীর প্রাণহরণকারী। হিংসা দ্বেষের বশীভূত হয়ে এঁকে এই পরিণামে আমিই ঠেলে দিয়েছি। আমিই এই ভালবাসার প্রতিমূর্তির নাশক। এসব কথা যতই ওর মনে আসছিল ততই ওর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। খানিক বাদে সুশীলা বলল—লাল্লু, আমি আর মাত্র কয়েক দিনের অতিথি। যা কিছু বলেছি তার জন্যে আমায় ক্ষমা করো বাবা।

প্রতাপের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল। এ কথার জবাব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুশীলা আবার বলল—জানি না, কেন তুমি আমার ওপর রাগ করেছিলে। আমার ঘরে আসনি, আমার সঙ্গে কথা বলনি। যে তোমাকে ভালবাসার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে মরেছে তার খোঁজটুকুও নাওনি এতদিন। বল বাবা? তোমার এই দুঃখিনী কাকীর ওপর কেন রাগ করেছ। ভগবানই জানেন, আমি তোমাকে সর্বসময়ে নিজের ছেলের মতই মনে করেছি। তোমাকে দেখে আমার বুক ফেটে যেত।

মাটি ছেড়ে আকাশের বিশাল বিস্তারে উড়ে যাওয়া পাখীর কূজন প্রতিক্ষণে বিলীয়মান হয়ে শুধু যেমন শব্দের রেশটুকু থেকে যায় তেমনি ভাবেই দুর্বলতার কারণে সুশীলার কথার স্বর কমতে কমতে সাঁই সাঁই শব্দটুকু থেকে গেল।

১০

আরও তিনটে দিন কাটল। সুশীলার বাঁচার শেষ আশাটুকুও এখন নির্বাপিত। এই তিনদিন মুন্সী সঞ্জীবনলাল অহোরাত্র তার পাশে বসে থেকে তাকে শুধু নানান ভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। কোন অতি প্রয়োজনীয় কাজে ক্ষণেকের জন্যে উঠে গেলে সুশীলা ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছে—আমাকে ছেড়ে উনি চলে যাচ্ছেন। স্বামীকে চোখের সামনে দেখেও স্বস্তি নেই। উৎকণ্ঠায় হাত ধরে রেখে নিরাশ হয়ে জিগগেস্ করেছে—আমাকে ছেড়ে কোথাও চলে যাবে না তো? মুন্সীজী অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ, তবু সুশীলার এমন কথা শুনে ওঁর চোখেও জল আসছিল। খানিক পর পরই মূর্ছা যাচ্ছিল সুশীলা। আবার চমকে উঠে সম্বিৎ ফিরে পেতেই শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠছিল—উনি কোথায় গেলেন? চলে গেলেন নাকি আমাকে ছেড়ে। এক এক সময় মূর্ছার প্রকোপ এমন হচ্ছিল যে মুন্সীজী—আমি এখানে আছি, এই তো তোমার পাশেই, ঘাবড়িও না, বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর। মুন্সীজীর দিকে তাকিয়েই জিগগেস্ করছিল—কোথায় তুমি, এখানে তো নেই, কোথায় চলে গেলে? জ্ঞান ফিরে এলে চুপ করে গিয়ে কাঁদতে শুরু করছিল। এই তিন দিনে ও, বিরজন, সুষামা, প্রতাপ, কারো কথাই জিগগেস্ করেনি। ওরা সবাই সব সময় ওর পাশে পাশে থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছিল ও মুন্সীজীকে ছাড়া আর যেন কাউকেই চেনে না। অধৈর্য হয়ে বিরজন যখন মায়ের গলা জড়িয়ে কাঁদছিল তখন শুধু ক্ষণেকের জন্য চোখ খুলে জিগগেস করছিল—কে, বিরজন? ব্যাস্ এইটুকুই। আর কোন কথা নয়। কৃপণের হৃদয় যেমন মৃত্যুর সময় নিজের গ'ড়ে

তোলা ধন সম্ভার ছাড়া আর কিছুই চিন্তা করে না, সেরকমই হিন্দু নারী অন্তিম সময়ে পতির অতিরিক্ত আর কারো ধ্যান করতে পারে না।

কখনও কখনও সুশীলা চমকে উঠে অবাক হয়ে জিগগেস্ করছিল—আরে! এ কে দাঁড়িয়ে আছে? পালিয়ে যাচ্ছে ও কে? ওকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? না, না, আমি ওকে যেতে দেব না, কথাগুলো বলতে বলতে মুন্সীজীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরছিল। খানিক পরে জ্ঞান ফিরে আসতে লজ্জা পেয়ে বলছিল—স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন কেউ তোমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার দিব্যি রইল, কোথাও যেন চলে যেও না। না জানি তোমায় কোথায় নিয়ে যাবে। তোমাকে তাহলে পাব কি করে? মুন্সীজীর হৃদয় মথিত হচ্ছিল—সুশীলার দিকে করুণাভরে তাকিয়ে বললেন—কোথাও যাব না আমি। আর তোমায় ছেড়ে যাবই বা কোথায়? ওর অবস্থা দেখে সুবামা কেঁদে ওঠে—এবার ওর জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে চাইছে। এই মুমূর্ষু অবস্থা ওর সকল লজ্জা, সকল সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছে।

চতুর্থ দিন সুশীলার অবস্থার উন্নতি হল। মুন্সীজী বুঝতে পারলেন শেষ মুহূর্ত হাজির হয়েছে। প্রদীপ নেভার আগে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সকালে মুখ ধুয়ে উনি যখন ঘরে এলেন, সুশীলা ইশারায় ওঁকে কাছে ডাকল। পাশে এসে বসতে বলল—নিজের হাতে আমাকে একটু জল খাইয়ে দাও। আজ ওর বেশ জ্ঞান আছে। বিরজন, সুবামা, প্রতাপ সকলকে ভালভাবে চিনতে পারল। অনেকক্ষণ ধরে বিরজনকে বুকে আঁকড়ে ধরে কাঁদল। জল খাওয়া হলে সুবামাকে বলল—দিদি, আমাকে একটু উঠিয়ে বসিয়ে দাও, স্বামীর চরণ স্পর্শ করে নিই। আবার না জানি কবে এই চরণে আশ্রয় পাব। সুবামা কাঁদতে কাঁদতে ওকে উঠিয়ে বসালো। প্রতাপ আর বিরজন সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সুশীলা মুন্সীজীকে বলল—আমার কাছে এস। পত্নীপ্রেমে বিহ্বল হয়ে মুন্সীজী গাঢ় স্বরে বললেন—ঘাবড়িও না, ঈশ্বর চাইলে তুমি ঠিক ভাল হয়ে যাবে। সুশীলা নিরাশ হয়ে বলল—

হ্যাঁ, আজ একেবারে ভাল হয়ে যাবো। তোমার পা-টা এগিয়ে দাও, মাথা রাখি। মুন্সীজী ইতস্তত করতে লাগলেন। সুবামা কাঁদতে কাঁদতে বলল—পা এগিয়ে দিন। ওর শেষ ইচ্ছে পূরণ হয়ে যাক্। পা এগিয়ে দিলেন মুন্সীজী। সুশীলা হাত দিয়ে পা দুটো ধরে কয়েক-বার চুমু খেল। তারপর পায়ে হাত রেখে কাঁদতে লাগল। কয়েক মুহূর্তেই চোখের উষ্ণ জলে পা দুটো ভিজে গেল। পতিব্রতা স্ত্রী, তার প্রেমের মুক্তি বিন্দু স্বামীর চরণে নিবেদন করল। কান্না সামলে নিয়ে সুশীলা বিরজনের একটা হাত মুন্সীজীর হাতে দিয়ে অতি ক্ষীণ স্বরে বলল—স্বামী, অনেক দিন তোমার সঙ্গে থাকলাম, জীবনের পরম সুখ ভোগ করেছি। এবার আমাদের ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হতে চলেছে আমি আজ ক্ষণিকের অতিথি। আমার যাবার বেলায় প্রাণাধিক প্রিয় আমার আদরের বিরজনকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। এ আমার ভালবাসার প্রতীক। সর্বসময় এর ওপর সদয় দৃষ্টি রেখ। আমার আদরের মেয়ের সুখ দেখা আমার ভাগ্যে নেই। ওকে আমি কখনও কটু কথা বলিনি, কোনদিন কঠোর দৃষ্টিতেও দেখিনি। এ আমার জীবনের ফল। ভগবানের দোহাই, একে তুমি কখনও অবহেলা করো না। কথা বলতে বলতেই থেমে গেল সুশীলা। তারপর আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল।

কিছুটা সময় আর যখন বাকী সুশীলা সুবামাকে বলল—দিদি বিরজনকে তোমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলাম। আজ থেকে তুমিই ওর মা। বাবা লাল্লু, ভগবান করুন তুমি যুগ যুগ বাঁচো। তোমার বির-জনকে তুমি ভুলো না বাবা। মনে করো ও তোমার দীন, মাতৃহীন এক বোন। তোমার ওপরেই ওর প্রাণ পড়ে থাকে। ওকে কাঁদিয়ো না। কখনো নির্দয় ব্যবহারে ওকে আঘাত করো না। ওর ওপর রাগ করে অবহেলা করো না যেন কোনদিন। তাহলে কেঁদে কেঁদেই প্রাণ করে দেবে। না জানি ওর ভাগ্যে কি আছে। তুমি কিন্তু বাবা ওকে সহোদর বোনের মত সর্বদা সান্ত্বনা দিও। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। তোমাকে আমার দিব্যি রইল।

বিরজনের দিক থেকে মন ফিরিয়ে নিও না। তুমিই ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করো। আমার বড় সাধ ছিল তোমার বিয়ে দেব। তোমার ছেলেমেয়ে হলে তাদের আদর করে খাওয়াব। কিন্তু আমার ভাগ্য অন্য কিছু ঠিক করে রেখেছিল।

কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল সুশীলা। সারা ঘর কাঁদছে। দাসী, রাঁধুনী বাড়ির অন্যান্য কাজের লোকেরা ওর প্রশংসা করতে লাগল। উনি সাধারণ স্ত্রীলোক নন, দেবী, দেবী…।

রাধিয়া—এতদিন কাজ করছি, কিন্তু কোনদিন কড়া কথা বলেননি। রাঁধুনী—আমাকে মেয়ের মত দেখত। যা-ই রান্না করে দিই কখনও হেসে বই কথা বলত না। কর্তা এলে, সিধে সাজিয়ে আমাকে দিয়ে দেওয়াত।

সকলে এই ধরনের নানা রকম কথা বলাবলি করছিল। বেলা দুপুর হল। রাঁধুনী রান্না করছে। কিন্তু খাবে কে! অনেক জেদ করার পর মুন্সীজী খেলেন। কিন্তু সে নাম মাত্র। প্রতাপ রান্নাঘরের দিকেই গেল না। বিরজন আর সুবামার ক্ষিদে কোথায়? সুশীলা কখনও বিরজনকে আদর করে; আবার কখনও নিজের অতীত জীবনের কথা বলতে বলতে কাঁদে। তৃতীয় প্রহরে ও সব চাকর-বাকরকে ডাকিয়ে এনে ওদের কাছে ক্ষমা চাইল। ওরা সবাই চলে যেতে সুবামাকে ডেকে বলল—দিদি বড় তেষ্টা পাচ্ছে। ওঁকে বল নিজের হাতে আমাকে একটু জল খাওয়াতে। মুন্সীজী জল আনলেন। সুশীলা কষ্ট করে এক ঢোক জল গলা দিয়ে নামাল, মনে হল কেউ যেন অমৃত দিয়েছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ, চোখে জল ভরে এল। পতির গলায় হাত দিয়ে বলল—আমি ভাগ্যবতী যে তোমার কোলে মরছি। এই বলে ও চুপ করে গেল, যেন কিছু বলতে চাইছে কিন্তু সংকোচে বলতে পারছে না। একটু পরে ও আবার মুন্সীজীর হাত ধরে বলল—যদি তোমার কাছে কিছু চাই তো, দেবে? মুন্সীজী বিস্মিত হয়ে বললেন—তোমার চাইবার কি দরকার? নিঃসংকোচে বল।

সুশীলা—তুমি কখনও আমার কথা ফেলনি।

মুন্সীজী—জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কখনও ফেলব না।

সুশীলা—ভয় হচ্ছে, যদি না মানো তবে…।

মুন্সীজী—তোমার কথা, আর তা আমি মানব না ?

সুশীলা—আমি তোমাকে ছাড়ব না, একটা কথা বল…সিল্লী (সুশীলা) মরে গেলে ওকে ভুলে যাবে কি…?

মুন্সীজী—এমন কথা বোলো না, দেখ বিরজন কাঁদছে।

সুশীলা—বল, ভুলে যাবে না তো ?

মুন্সীজী—কখনও না।

সুশীলা ওর শুষ্ক কপাল মুন্সীজীর অধরে রেখে দুই হাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরল। এবার বিরজনকে কাছে ডেকে খুব ধীরে ধীরে বলল—দেখো মা, লালাজীর সব কথা শুনো ; মন দিয়ে ওঁর সেবা কোরো। সংসারের সব ভার এখন তোমার মাথায়। এবার তোমাকে কে সামলাবে ? এই বলে স্বামীর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল—আমার মনের কথা আমি বলতে পারছি না। শরীর ক্লান্ত হয়ে আসছে।

মুন্সীজী—তুমি মিথ্যে মিথ্যে দোটানায় পড়ছ।

সুশীলা—তুমি আমার কিনা বল ?

মুন্সী—আমি তোমার, আর আমরণ তোমারই থাকব।

সুশীলা—এমন যেন না হয় যে তুমি আমাকে ভুলে যাও আর যা আমার ছিল তা অন্যের হাতে চলে যায়।

সুশীলা আবার বিরজনকে ডেকে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেল কিন্তু পারল না, মূর্ছা গেল। বিরজন আর প্রতাপ কাঁদতে শুরু করল। মুন্সীজী কাঁপতে কাঁপতে সুশীলার বুকে হাত বোলাতে লাগলেন। ধীর গতিতে নিঃশ্বাস পড়ছিল। রাঁধুনীকে ডেকে বললেন—ওকে মাটিতে শুইয়ে দাও। মুন্সীজীও কাঁদছেন। রাঁধুনী আর সুবামা দুজনে মিলে সুশীলাকে মাটিতে শুইয়ে দিল। অসুখে ওর শরীরের হাড় পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

অন্ধকার হয়ে আসছিল। সারা বাড়ীতে শোকের ছায়া আর ভয়াবহ

নঃশব্দ্য বিরাজ করছে। যারা কাঁদার তারা কাঁদছে, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠে। চথা হচ্ছিল নিম্নস্বরে। সুশীলা ভূমির ওপর শায়িতা। সেই সুকুমার দহ যা কখনও মাতার অঙ্কে পালিত হয়েছে, কখনও প্রেমের আকরে মাশ্রয় পেয়েছে, কখনও কোমল ফুলের শয্যায় শয়ন করেছে, আজ সই কোমল দেহ ভূতলে লুটিয়ে আছে। নাড়ীর গতি এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। অতি ক্ষীণ। মুন্সীজী বিচ্ছেদের শোক আর নিরাশায় মগ্ন হয়ে পত্নীর মাথার, কাছে স্থাণুর মত বসে আছেন। অকস্মাৎ সুশীলা মাথা তুলে মুন্সীজীর পা ধরল। প্রাণবায়ু উধাও হয়েছে মুহূর্তখানেক আগে। তবু ওর প্রাণহীন বাহু মুন্সীজীর পা দুটোকে বেষ্টন করেই রয়েছে। বোধহয় এটাই ছিল সুশীলার অন্তিম কাজ।

যারা কাঁদবার, কাঁদ। কারণ, কান্নার অতিরিক্ত আর কিই বা করতে পারবে। এ সময়ে তোমাদের কেউ যত সান্ত্বনাই দিক, তোমার চোখের অশ্রুপ্রবাহকে রুদ্ধ করতে পারবে না। কাঁদা তোমার কর্তব্য। জীবনে কাঁদার অবকাশ কদাচিৎ মেলে। এই সময়ে তোমার চোখ কি শুষ্ক হয়ে থাকতে পারে! অশ্রুধারা বইছিল। চারিদিক থেকে ফোঁপানির শব্দ আসছিল—ঠিক এই সময় রাঁধুনী প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকল। একটু আগেই সুশীলার জীবনদীপ নিভে গেছে।

১১

রাধাচরণ রুরকী কলেজ থেকে বেরিয়েই মুরাদাবাদের ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হল। চন্দ্রাও ওর সঙ্গে চলে গেল। অনেক বাধা দিয়েছিল প্রেমবতী। কিন্তু কোন লাভ হয়নি। যেতে যে চায় তাকে আটকাতে পারে কে? সেবতী কবেই শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। গৃহে এখন প্রেমবতী একা। সংসারের সমস্ত কাজকর্মের ভার ওর ঘাড়েই পড়েছে। তাই হুকুম হল এবার বিরজনের দ্বিরাগমনের সংবাদ পাঠান হোক। ডেপুটি সাহেব রাজী হননি এ ব্যবস্থায়। কিন্তু সংসারের ব্যাপারে প্রেমবতীর রায়ই চূড়ান্ত।

সঞ্জীবনলাল এই সংবাদ স্বীকার করে নিলেন। কিছুদিন হল উনি

তীর্থযাত্রার কথা ভাবছিলেন। ক্রমে ক্রমে সংসারের সঙ্গে সম্পর্কও ক্ষীণ করে আনছিলেন। সারাদিন আসনে বসে ভগবদগীতা এবং যোগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি জ্ঞান বিষয়ক বই অধ্যয়ন করতেন। আর যৎসামান্য কিছু আহার করে শুয়ে পড়তেন। প্রতাপচন্দ্র প্রায়ই ওঁর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেত। যদিও ওর বয়স ষোল বছরও পার হয়নি, তবু কিছু নিজের স্বভাবগুণে, কিছু পৈতৃক সংস্কার আর খানিকটা সঙ্গগুণের প্রভাবে এখন থেকেই ও বৈজ্ঞানিক (বিশেষ জ্ঞানের) বিষয়ে চিন্তা আর বিশ্লেষণে আনন্দ পেত। জ্ঞান তথা ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা কথা শুনতে শুনতে ওর প্রবৃত্তিও ভক্তি মার্গের দিকে যাচ্ছিল। অনেক সময় মুন্সীজীর সঙ্গে এমন সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনা করত যে উনি বিস্মিত হয়ে যেতেন। মুন্সীজীর শিক্ষার প্রভাব প্রতাপের ওপর যত না পড়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী সুবামার শিক্ষার প্রভাব পড়েছিল বৃজরাণীর ওপর। ওর বয়স এখন পনের বছর। এই বয়সে মনে নতুন আকাঙ্ক্ষা তরঙ্গিত হয় আর চিত্তে সরলতা, চঞ্চলতার মত সুন্দর সরসতা বর্ধিত হতে থাকে। কিন্তু বৃজরাণী সেই সহজ সরল বালিকাই থেকে গেছিল। ওর মুখে হৃদয়ের পবিত্র ভাব ঝলমল করত। চলনে মনোহারী মধুরতা। ভোর বেলা উঠে সবার আগে মুন্সীজীর ঘর পরিষ্কার করে ওঁর পূজোর জিনিসপত্র নিয়ম মত সাজিয়ে রাখত। তারপর রান্নার কাজে লেগে যেত। দুপুর বেলাটা ওর লেখাপড়ার সময়। সুবামার ওপর ওর যত ভালবাসা আর শ্রদ্ধা ছিল তত ওর নিজের মায়ের ওপরও ছিল না। সুবামার ইচ্ছা বিরজনের কাছে আদেশের চেয়ে কম ছিল না।

সুবামার ইচ্ছা এখনই বিরজনকে বিদায় না করা। কিন্তু মুন্সীজীর জেদে বিদায়ের (গাওনার) তোড়জোড় হতে লাগল। এই বিপত্তির ক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, বিরজনেরও ব্যাকুলতা ততই বেড়ে চলেছে। রাত দিন কান্নাকাটি করে। কখনও বাবার পায়ে পড়ে কাঁদে আবার কখনও সুবামার চরণে মাথা কোটে। কিন্তু বিবাহিতা কন্যা পরের ঘরেই যায়, তার ওপর এদের কার কোন্ অধিকার আছে?

প্রতাপচন্দ্র আর বিরজন কতদিন দুজনে ভাই-বোনের মত একসঙ্গে কাটিয়েছে। কিন্তু ওকে এখন দেখলেই বিরজনের দৃষ্টি আনত হয়ে পড়ে। প্রতাপেরও একই দশা। ওদের বাড়িতে প্রতাপ খুব কমই আসে। যদি প্রয়োজনে কখনও আসেও এমন ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে আনত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতো যেন কনে বৌ। ওর দৃষ্টিতে যে প্রেম রহস্য লুকিয়ে আছে তা ও কারুর কাছে…এমন কি বিরজনের কাছেও প্রকাশ করতে চায় না।

বিদায়ের আর মাত্র তিনটে দিন বাকী। সেদিন সন্ধ্যেবেলা কি একটা কাজে প্রতাপ বাড়ীতে এল। নিজের ঘরে ল্যাম্প জ্বালাচ্ছে এমন সময় বিরজন ঢুকল। চোখের জলে ওর আঁচল ভিজে গেছে। আজ দু বছর বাদে ও প্রতাপের দিকে সজল নয়নে চেয়ে দেখল। খানিক বাদে বলল—লাল্লু, আমি কেমন করে থাকব?

একথায় প্রতাপের চোখে কিন্তু জল এল না। ওর কণ্ঠস্বর ব্যথায় ভারী হয়ে উঠল না। অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে বলল—ঈশ্বর তোমাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দেবেন।

বিরজন মাথা নীচু করল। ওর দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ। শুধু একটা ফোঁপানির শব্দ বুক চিরে বেরিয়ে এল। এ যেন ওর হৃদয় বেদনার অনন্ত কথার কথামালা, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

বিদায়ের দিনটি মেয়েদের কাছে কত বেদনার! বাল্যের খেলার সাথী, মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যেতে হয়। পুনরায় এ গৃহে ফিরে আসার সুখচিন্তা এসময়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। কারণ এরপর যখন সে এ গৃহে আসবে তখন সে কদিনের অতিথি মাত্র। যাদের সঙ্গে জীবনোদ্যানে একদিন খেলা করেছে, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণে সেই স্থানকেই তার মনে হবে অন্যের গৃহ, এই নিদারুণ উপলব্ধি তার বুক ভেঙে দেয়। আজ থেকে ও এমন ভার মাথায় তুলে নিল যা আমরণ তাকে বইতে হবে।

বিরজনকে সাজান হচ্ছিল। নাপতানী ওর হাতে পায়ে মেহেদী লাগাচ্ছিল। কেউ ওর চুল বাঁধছিল। খোঁপায় কেউ বা ফুল সাজিয়ে

দিচ্ছিল। কিন্তু যার জন্য এত আয়োজন এত প্রস্তুতি সে কিন্তু মাটির বুকে অবিরাম অশ্রুবিন্দুর মুক্ত ছড়াচ্ছিল। এর মধ্যে বাইরে থেকে এত্তেলা এল সময় বয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি কর। সুষামা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। বিরজন ওর গলা জড়িয়ে ধরল। অনর্গল অশ্রুপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে গণ্ডদেশ বেয়ে। এতক্ষণ যা চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছিল সুষামার স্নেহের পরশে অকস্মাৎ তা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, যেন কেউ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে।

খানিক বাদেই পাল্‌কী এল দরজায়। বিরজন প্রতিবেশিনীদের আলিঙ্গন করল। সুষামার চরণ স্পর্শ করল। প্রাক বিদায় পর্ব চুকে যেতে দু-তিনটি মেয়ে বিরজনকে ধরে পাল্‌কীতে বসিয়ে দিল। এদিকে পাল্‌কী উঠল আর ওদিকে সুষামা মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, যেন ওর জীবদ্দশাতেই কেউ ওর প্রাণটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গৃহ শূন্য হয়ে গেল। অনেক অনেক মেয়েতে জমজমাট তবু এক বিরজনের অভাবে গৃহ যেন খাঁ খাঁ করছে।

১২

সিঁদুরের লালিমায় সীমন্ত যেমন অনুপম হয়ে ওঠে, তেমনি বিরজনের আগমনে প্রেমবতীর সংসারের জৌলুস বেড়ে গেল। সুষামা ওকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিল যে, যে-ই ওকে দেখল, মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন কি সেবতীর বন্ধু রাণীকেও প্রেমবতীর সামনে স্বীকার করতে হল যে ওর ছোট বৌ ওদের গায়ের রঙ্‌কে ফিকে করে দিয়েছে। দিনের পর দিন বিরজনের সঙ্গে কথা বলতে সেবতীর একটুও ক্লান্তি বোধ হত না। নিজের গানের ব্যাপারে ওর গর্ব ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারেও বিরজন বাজি মাৎ করল।

এদিকে কমলাচরণের বন্ধুরা আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল,—ভাই নতুন বৌ এনেছ, বন্ধুদের ব্যাপারেও কিছু চিন্তা কর। শুনেছি পরমা সুন্দরী লাভ করেছ ?

শ্বশুরবাড়ী থেকে কমলাচরণ অনেক টাকাই পেয়েছিল। পকেট

ঝন্ঝনিয়ে বলল—আরে নেমন্তন্ন খাও, মদ ওড়াও। তবে হ্যাঁ, মেলা চিল্লাচিল্লি করো না—ভেতরে কোথাও না কোথাও তো থাকবেই, বুঝে যাবে এরা সবাই গুণ্ডা। যবে থেকে ও এ বাড়িতে এসেছে, আমার আক্কেল গুড়ুম্। শোন, ইংরেজী, ফার্সী, সংস্কৃত, আগড়ম-বাগড়ম সব গুলে খেয়েছে। ভয় লাগে; যদি ইংরেজীতে হঠাৎ কিছু জিগগেস্ করে বসে! কি ফার্সীতে কথা বলতে লাগে; ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকান ছাড়া আর কি করব বল্? এজন্য এখন খুব বাঁচিয়ে চলাফেরা করি।

এমনিতে কমলাচরণের বন্ধুর সংখ্যা অপরিমিত। শহরের যত পায়রাবাজ, ঘুড়িবাজ, গুণ্ডা সবাই ওর বন্ধু। তবে সত্যিকার বন্ধু বলতে ছিল পাঁচ মহাশয় ব্যক্তি। আর এনারা সবাই-ই পুরোদস্তুর জুয়াড়ী। এনাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত হলেন গিয়ে মজিদ্ মিঞা। কাছারীতে···মুহুরীগিরি করেন। যা কিছু পান তার সবটুকু মদিরায় সমর্পণ করেন। দ্বিতীয় স্থান ছিল হামিদ খাঁর। এ মহাশয় বিপুল পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যেই তার শেষ কপর্দকটুকুও বিলাস-ব্যসনে বিসর্জন দিয়েছেন। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে রোজ সন্ধ্যেবেলা সেজেগুজে রাস্তায় রাস্তায় হাওয়া খেয়ে বেড়ানো। তৃতীয়, হজরত সৈয়দ হুসেন—পাকা জুয়াড়ী। ঘোড়ার খুরের পরম ভক্ত। শ'য়ে শ'য়ে টাকা বাজি ধরিয়ে স্ত্রীর গহনায় হাত দেওয়া নিত্যকার কর্ম। শেষের দুই মহাশয়, রামসেবক লাল, আর চন্দুলাল কাছারীর চাকর। বেতন যৎসামান্য কিন্তু উপরি আমদানী পর্যাপ্ত। অর্ধেক তার সুরাপানে সেবিত হয় আর অর্ধেক যায় ভোগবিলাসে। ঘরের লোক না খেয়ে মরুক কি ভিক্ষে করে খাক্ এদের তাতে বয়েই গেল। এনারা নিজেদের সুখের চিন্তায়ই সদা নিমগ্ন।

যুক্তি পরামর্শ আগেই হয়ে গিয়েছিল। আটটার সময় ডেপুটি সাহেব শয়ন করলে পাঁচজন একত্র হল। মদের স্রোত বইতে লাগল। পাঁচজনেই সুরারসে অভ্যস্ত। যখন মৌতাত জমল, জড়িয়ে জড়িয়ে

আবোলতাবোল বকতে লাগল।

মজিদ—কি ভাই কমলাচরণ, সত্যি বল তো, বৌকে দেখে খুশী হয়েছ কিনা ?

কমলা—এবার সত্যিই কিন্তু আপনি আবোলতাবোল বকতে লাগলেন।

রামসেবক—বলে কেন দিচ্ছ না, এর মধ্যে লুকোছাপার কি আছে বাবা !

কমল—বলব কি আমার মুণ্ডু···আগে সামনে যাবার সুযোগ তো হোক। কাল দরজার ফাঁক দিয়ে মাত্র একবার চোখের দেখা দেখে ছিলাম। এখনও ছবিটা চোখের সামনে ভাসছে।

চন্দুলাল—বন্ধু, তুমি বড়ই ভাগ্যবান।

কমলা—দেখে এমন অবস্থা হল পড়তে পড়তে বাঁচলাম। ব্যস্ ! মনে কর একটা যেন পরী।

মজিদ—ভাই ভাই, এই বন্ধুত্ব তো কোনদিন কাজে লাগতে পারে। একনজরের একটু দেখা, আমাদের দেখাও।

সৈয়দ্—আসল বন্ধুত্ব তাকে বলে যখন পরস্পরে কোন পর্দা (আড়াল) থাকে না।

চন্দুলাল—বন্ধুত্বে আবার পর্দা কিসের ? ইংরেজদের দেখো, বৌ পালকী থেকে নামল কি নামল না, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাত মেলাতে লাগল।

রামসেবক—আমার তো না দেখে ভাই শান্তি হবে না।

কমলা—(এক চাপড় লাগিয়ে) জিভ কেটে নেওয়া হবে, বুঝেছ ?

রামসেবক—কোই পরোয়া নেই, দেখার জন্যে চোখ তো থাকবে, যথেষ্ট !

মজিদ—ভাই কমলাচরণ, রাগের কথা নয়, এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য হল বন্ধুত্বের দাবি মেটান।

কমলা—আরে ! তা আমি 'না' করলাম কখন ?

চন্দুলাল—বাহ্ ! এই তো আমার বীরপুরুষ। একেবারে মরদের

মত কথা। তা আমরা এবার তৈরী-টৈরী হয়ে আসি, না কি ?

কমলা—আজ্ঞে, তবে মুখে একটু করে কালি লাগিয়ে নিও। ব্যস্ তাতেই যথেষ্ট।

সৈয়দ—তাহলে, আজই ঠিক থাকল তো ?

এদিকে মদের ফোয়ারা ছুটছে। ওদিকে বিরজন পালঙ্কে শুয়ে চিন্তায় ডুবে গেছে—ছেলেবেলার দিনগুলো কত ভাল ছিল। ওই দিনগুলো যদি আর একটি বার ফিরে আসত। আহ্। কেমন সুন্দর জীবন ছিল তখন। সংসার ছিল ভালবাসা আর প্রীতির জায়গা। ওটা কি তবে অন্য কোন জগৎ ছিল। তখন কি দুনিয়ার সব জিনিসই ছিল খুব সুন্দর। এই সুমধুর চিন্তার অবগাহনে চোখ দুটো বুজে এল। ছেলেবেলার একটা ঘটনা চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবির মত···লাল্লু ওর পুতুল ভেঙে দিয়েছে। তাইতে শোধ নিতে ও তার বই-এর দুটো পাতা ছিঁড়ে দিল। তখন লাল্লু ওর পিঠে জোরে দুটো কিল মেরে বাইরে পালিয়ে গেল। ও কাঁদতে কাঁদতে লাল্লুকে গাল দিচ্ছিল। তখন সুবামা এসে লাল্লুর হাত ধরে বলল—কি মা, এ তোমাকে মেরেছে ? খুব মারধোর করে ও। আজ দেখাচ্ছি ওকে মজা। কোথায় মেরেছে সোনা ? লাল্লু জলভরা চোখে বিরজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর অবস্থা দেখে বিরজন হেসে বলল—কোথায় ও আমাকে মেরেছে ? ও কখনো আমাকে মারেই না। এই বলে ওর হাত ধরল। নিজের ভাগের মিষ্টি ওকে খাওয়ালো। তারপর দুজনে মিলে আবার খেলতে লাগল। সেই সময়গুলো আজ কোথায় ?

রাত্রি অনেক হয়েছিল। হঠাৎ বিরজন শুনল সামনের দরজায় কেউ যেন দুম্‌দুম্ করে ঘা মারছে। কান খাড়া করল ও। শব্দ হয়েই যাচ্ছে। কখনো আবার থেমেও যাচ্ছে। তারপর আবার ঘা। খানিক পরেই মাটি পড়তে লাগল। সাহসে বুক বেঁধে বিছানা ছেড়ে উঠল বিরজন। ঘুমে অচেতন রাঁধুনী বামনীকে ঝাঁকাতে লাগল। ভয়ে মুখ দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছিল না। এর মধ্যে হঠাৎ মাটির একটা বড় ঢেলা সামনে এসে পড়ল। রাঁধুনী বামনী চমকে উঠে বসল। দুজনেরই

বিশ্বাস চোর এসেছে। রাঁধুনী বামনী চালাক মেয়ে। চিৎকার করলে হুলুস্থুল বেধে যাবে। ও তাই চুপচাপ অপেক্ষা করে বসে রইল। চোর আগে সিঁধের মধ্যে পা দিয়ে দেখে, তারপর নিজে ঢোকে। একটা ডাণ্ডা নিয়ে সিঁধের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, যাতে চোর পা ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন মার দেবে পা যেন একেবারে ভেঙে যায়। কিন্তু পায়ের বদলে চোর সিঁধ দিয়ে প্রথমে মাথা গলালো। বামনী তৈরীই ছিল, মারল এক ডাণ্ডার বাড়ি চোরের মাথায়। খটাস করে একটা আওয়াজ হল। চোর ঝট্ করে মাথা টেনে নিল আর বলতে শোনা গেল—উঃ! মেরে ফেললে, মাথাটা ফেটে গেছে! কয়েক জনের হাসির শব্দ শোনা গেল এবার। তারপর সব চুপচাপ! এরপর আর লোকজন সব সরে পড়ল···। বাকী রাতটুকু কথাবার্তায় কেটে গেল।

সকালবেলায় কমলাচরণ যখন ঘরে ঢুকল, ওর চোখ দুটো টক্‌টকে লাল, মাথাটাও বেশ ফুলে আছে। রাঁধুনী বামনী কাছে গিয়ে কমলাচরণকে ভাল করে পরখ করল। তারপর বিরজনের কাছে এসে বলল—বউ একটা কথা বলি, মনে কিছু করবে না তো?

বিরজন—কিছু মনে করবো কেন? বল না, কি বলবে।

রাঁধুনী—রাতে যে সিঁধ কেটেছিল, তা চোরে কাটেনি।

বিরজন—তা না হলে কে ছিল?

রাঁধুনী—ঘরের লোকই কেটেছিল, বাইরের কেউ নয়।

বিরজন—কোন কি চাকরের বদ্‌মাইশী?

রাঁধুনী—না, চাকরের মধ্যে এমন কেউ নেই এ সাহস হবে।

বিরজন—তাহলে কে ছিল, খোলসা করে বলছ না কেন?

রাঁধুনী—আমার জ্ঞানে ছোটবাবুই ছিলেন। আমি লাঠি মেরে-ছিলাম, সে ওঁর মাথায় লেগেছিল। ছোটবাবুর মাথা ফুলে আছে।

একথা শুনে বিরজন ভ্রূকুটি করল। মুখ লাল হয়ে উঠল। রেগে বলল—রাঁধুনী, মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বল। একথা মুখে আনতে তোমার লজ্জা করল না? আমার সামনে এমন কথা বলার সাহস তোমার কেমন করে হল? সোজাসুজি আমার ওপর কলঙ্কের কালি

লেগছ। তোমার বুড়ো বয়সের জন্যে মায়া হচ্ছে তাই, নইলে এক্ষুনি তোমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতাম। তাহলে বুঝতে পারতে জিভকে বশে না রাখতে পারার ফল কি হয়। এখান থেকে যাও। তোমার মুখ দেখলেই আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। একবারও ভাবলে না মুখ দিয়ে কি গর্হিত কথা বার করছ? ওঁকে ভগবান কি দেননি? সারা বাড়ীটাই ওঁর। ওঁর সম্বন্ধে তুমি এমন কথা বলে বসলে?

কিন্তু যে কথায় বিরজন এত রাগ করল সেই কথাই বাড়ির আর সব লোকের বিশ্বাস হয়ে গেল। ডেপুটি সাহেবের কানেও এই কথা গিয়ে পৌঁছল। কমলাচরণ যতখানি দুষ্ট প্রকৃতির উনি তাকে তার চেয়েও বেশী মনে করতেন। ভয় হল—এই মহাশয় ব্যক্তি না আবার শেষে বধূমাতার গহনার দিকে হাত বাড়ায়। সবচেয়ে ভাল হয়, ওকে হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া। হোস্টেলে যাবার কথা শুনে প্রথম কমলাচরণ খুব ছট্‌ফট্‌ করল। কিন্তু শেষে কিছু একটা চিন্তা করে হোস্টেলে চলে গেল। বিরজনের এখানে আসার আগে কয়েক বার এ নিয়ে পরামর্শ হয়েছিল, কিন্তু কমলাচরণের জেদের কাছে হার মানতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীর চোখে ছোট হয়ে যাবার ভয় ওকে হোস্টেলে যেতে বাধ্য করল।

১৩

প্রথম দিন তো কমলাচরণ হোস্টেলে কোন রকমে দিন কাটাল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত শুয়েই রইল। পরের দিন খেয়াল হল যে আজ নবাব সাহেব আর তীখে মির্জার বটেরীর মধ্যে জোর লড়াই হবে। কেমন সব তাগড়া জোয়ান এক একটা। আজ ওদের লড়াই দেখার মতো হবে। সমস্ত শহরও যদি ভেঙে পড়ে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কি পরিহাস! শহরের সব লোক মজা লুটবে আর আমি পড়ে কাঁদবো এই খোঁয়াড়ের মধ্যে! এই ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল কমলাচরণ। তারপর কথায় কথায় আখড়ায় গিয়ে হাজির হল।

এখানে আজ খুব ভিড়। মেলার মতো লাগছিল আখড়াটাকে।

ভিস্তিওলা জল ছিটোচ্ছিল। সিগারেটওলা ফুচ্‌কাওয়ালা আর পানওলা নিজের নিজের দোকান সুন্দর করে সাজিয়ে বসেছে। ফুর্তিবাজ ছোক্‌রারা আড্ডায় বুলবুলিগুলোকে বসিয়ে আড্ডাবাজি করছিল। এখানেও কমলাচরণের ইয়ার দোস্তের কম্‌তি কোথায়! সবাই ওকে খালি হাতে দেখে জিগগেস্‌ করল—আরে রাজা সাহেব,খালি হাতে কেন? ইতিমধ্যে মিঞা সৈয়দ, মজিদ, হামিদদের নেশায় চুর অবস্থায় মুহুর্মুহু সিগারেটের ধোঁওয়া ওড়াতে দেখা গেল। কমলাচরণকে দেখা মাত্রই সবাই হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে ওর কাছে ভিড়ে গেল।

মজিদ—দোস্ত্‌, আজ তুমি কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে? কোরাণের দিব্যি তোমার বাড়ি হাজার বার চক্কর লাগিয়েছি।

রামসেবক—আজকাল আনন্দের রাত ভাই, চোখ দুটো দেখছো না, নেশারুর মত দেখাচ্ছে।

চন্দুলাল—ব্যাটা আরাম করছে। যবে থেকে ঘরে সুন্দরী বৌ এসেছে ও বাজারের চেহারা পর্যন্ত দেখেনি। যখনই দেখ ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে। খুব আরাম করে নাও দোস্ত্‌।

কমলা—আরাম কি ছাই করব? এখানে তো ফেঁসে গেছি। তিন-দিন ধরে বোর্ডিঙে পড়ে আছি।

মজিদ—সত্যি? খোদার কসম্‌?

কমলা—সত্যি বলছি, পরশু থেকে। আজ সবার চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে এসেছি।

রামসেবক—খুব উড়ে গেছ। ওই গুঁফো সুপারইনটেনডেন্টটা রাগে হয়তো জ্বলছে।

কমলা—এই পাখীর লড়াই ছেড়ে পুঁথিতে কে মাথা গলাবে!

সৈয়দ—দোস্ত্‌, আজ কেটে পড়লে তো? সত্যি বলতে কি তোমার ওখানে থাকাটা খুবই বিপজ্জনক। রোজ তো আর আসতে পারবে না? আর এখানে প্রতিটি দিনই নতুন মজা। নতুন বাহার। কাল লাল দীঘিতে, পরশু প্রেটে, তরশু নৌকা বাইচ—কত আর

শুনব। তোমার যাওয়া ভাল হল না দোস্ত্।

কমলা—কাল ঘুঁড়ির প্যাঁচ তো আমি আলবাৎ দেখব। চাই তাতে দুনিয়া ওলটপালট হয়ে যায় যাক।

সৈয়দ—আর নৌকর বাইচ যদি না-ই দেখলে তো দেখলে আর কি?

তৃতীয় প্রহরে কমলাচরণ বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উদাস মনে বোর্ডিং-এর দিকে রওনা দিল। মনের মধ্যে চৌর্যবৃত্তির ভীতি ছেয়ে আছে। বোর্ডিং-এর দরজায় পৌঁছে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, যদি সুপারইনটেনডেন্ট সাহেব না থাকেন তবে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকবে। দেখল উনি বাইরের দিকেই আসছেন। মনকে বেশ ভালভাবে শক্ত করে ভেতরে গিয়ে বসল। সুপারইন্টেনডেন্ট সাহেব ওকে দেখতে পেয়ে জিগগেস করলেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

একটা দরকারে বাজারে গিয়েছিলাম।

এখন তো বাজার যাবার সময় নয়।

আমার জানা ছিল না, এখন থেকে মনে রাখব।

রাত্রে কমলাচরণ খাটিয়ার ওপর শুয়ে ভাবছিল···বন্ধু, আজ তো খুব বেঁচে গেলে! কিন্তু তখনই ভাল হবে যদি কাল আর পরশু এই মহাশয়ের চোখে ধুলো দিতে পার। কালকের খেল্ তো দেখার মত হবে। ঘুঁড়িগুলো আকাশে কথা বলবে আর লম্বা লম্বা প্যাঁচ মারবে। এই সুখচিন্তায় ঘুমিয়ে পড়ল ও। পরের দিন সকাল বেলা বোর্ডিং থেকে সরে পড়ল। বন্ধুরা লাল দীঘিতে ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখেই আনন্দের আতিশয্যে ওর পিঠে কিল মারল।

কমলাচরণ কিছুক্ষণ ঘুড়ির কাটাকাটির খেলা দেখল। তারপর শখ হল, ঘুড়িগুলোকে আনিয়ে নিজের কেরামতি দেখবার, ওর ইচ্ছের ইন্ধন জুগিয়ে সৈয়দ ওকে খুবই উত্তেজিত করে তুলল—লড়ে যাও বন্ধু, জোরতার সে লড়ে যাও। টাকা আমি দেব। চটজলদি বাড়িতে লোক পাঠিয়ে দিল। বিশ্বাস ছিল মাঞ্জার জোরে ও সবাইকে হারাবে। কিন্তু বাড়ি থেকে লোকটিকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে

ওর শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। হান্টার নিয়ে দৌড়ল বাড়ির দিকে। বাড়িতে ঢুকেই চাকরদের সপাসপ ঘা লাগাতে শুরু করল। বেচারীরা বসে তামাক খাচ্ছিল। হঠাৎ ওদের ওপর হান্টারের বাড়ি পড়ায় তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল। সারা পাড়ায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। কেউ বুঝতে পারল না ওদের দোষটা কি। চাকরদের ভালোমত বন্দোবস্ত করে নিজের ঘরে এল। কিন্তু ঘরের দুর্দশা দেখে কমলাচরণের রাগ গেল আরো বেড়ে। ঘুড়িগুলো ছেঁড়া, লাটাই ভাঙা, আর মাঞ্জা সুতোর লেচিগুলো ঘরের চারদিকে অগোছাল অবস্থায় পড়ে আছে। যেন কোন বিপদ এসে যবন যোদ্ধাদের সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে। বুঝতে পারল এ নিশ্চয় তার মায়ের কাজ। রাগে লাল হয়ে মার কাছে ছুটে গিয়ে চড়া গলায় বলতে লাগল—কি গো মা? তুমি কি সত্যি সত্যি আমায় মেরে ফেলতে চাও? তিনদিন হল জেলখানায় পাঠিয়েছ, কিন্তু এত করেও মনে শান্তি হয়নি, আমার শখের জিনিসগুলোকেও শেষে নষ্ট করে ফেললে? কি করেছি আমি?

প্রেমবতী—(বিস্ময়ের সঙ্গে)—আমি! আমি তো তোর কোন জিনিস ছুঁই সুদ্ধু নি! কি হয়েছে?

কমলা—(ক্ষিপ্ত হয়ে) মিথ্যুকদের মুখে পোকা পড়ে। তুমি আমার জিনিস না ছুঁলে কার এত সাহস আমার ঘুড়ি লাটাই ভেঙে ফেলবে? এটুকুও কি সহ্য করতে পারছ না?

প্রেমবতী—ভগবান সাক্ষী, আমি তোর ঘরে পা পর্যন্ত দিইনি। চল তো দেখি গিয়ে কি কি ভেঙেছে।

এই বলে প্রেমবতী ওর ঘরের দিকে গেল। কমলাচরণ রাগে গোঁজ হয়ে উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন সময় মালতী বিরজনের ঘর থেকে বেরিয়ে ওর হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিতে লেখা ছিল—

অপরাধ আমি করেছি। আমি অপরাধিনী। যে শাস্তি হয় দিন।

চিঠি দেখেই কমলাচরণ ভিজে বেড়ালটির মত গুটি গুটি পায়ে বৈঠকখানার দিকে এগুলো। পর্দার আড়াল থেকে প্রেমবতী

রোরুদ্যমান চাকরদের বকছিল। কমলাচরণ ওর মাকে ওদের বকতে বারণ করে বাকী যেকটা ঘুড়ি আস্ত ছিল সেগুলোকে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলল। লাটাই ভাঙল আর সুতোর লেছিতে দিল আগুন ধরিয়ে। প্রেমবতী বিস্ময়ে চেয়ে আছে। ব্যাপারখানা কি! একটু আগেই যেগুলোর জন্যে পৃথিবী মাথায় তুলেছিল এখন নিজেই তাদের শত্রু হল! ভাবল, রাগেই এসব করেছে। ওকে শান্ত করতে চাইল। কিন্তু কমলাচরণের চেহারায় রাগের লেশমাত্রও নেই। অত্যন্ত ধীর এবং শান্ত স্বরে বলল—রাগ আমি করিনি। আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি আর কখনও ঘুড়ি ওড়াব না। আমারই বোকামী, এগুলোর জন্যে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম।

প্রেমবতী চলে যেতে ঘরে একা বসে কমলাচরণ ভাবছিল—নিঃসন্দেহে আমার ঘুড়ি ওড়ানয় ওর অপছন্দ। এতে ওর নিদারুণ ঘৃণা, না হলে আমার ওপর এই অত্যাচার ও করত না। যদি একবার ওর সঙ্গে দেখা হতো তো জিগগেস করতাম—তোমার কি ইচ্ছে? কিন্তু কেমন করে ওকে মুখ দেখাই! একে তো আমি মহামূর্খ, তার ওপর কত যে আমার মূর্খামীর পরিচয় ওকে দিয়েছি! সিঁধ কাটার খবর নিশ্চয়ই ও পেয়ে গেছে। ওকে মুখ দেখাবার যোগ্য রইলাম না! এখন একটিই উপায়, না ওর মুখ দেখি না নিজেরটা ওকে দেখাই। কিম্বা কিছু লেখাপড়া শিখি। হায়! এই সুন্দরী কেমন সৌন্দর্য পেয়েছে। স্ত্রী তো নয়! মনে হয় যেন অপ্সরা। কখনও কি এমন দিন আসবে যখন ও আমাকে ভালবাসবে! কেমন রাঙা সরস অধর! কিন্তু হৃদয় একেবারে পাষাণ। দয়া মায়া তো ওকে ছুঁয়েও যায়নি! বলেছে 'যা শাস্তি হয় দিন', কি শাস্তি দেব? যদি পেয়ে যাই, বুকের মধ্যে টেনে নিই। আচ্ছা, আজ থেকে তবে পড়া চাই।...এমন নানান কথা ভাবতে ভাবতে কমলাচরণ খাঁচা খুলে পায়রাগুলোকে ওড়াতে লাগল। শয়ে শয়ে জোড়ায় ছিল। সব একটার পর একটাকে উড়িয়ে দিল। ওপরে উঠে ওরা আকাশের তারা হয়ে যায়, উড়লে তো সারা দিনমানে নামার নামটি পর্যন্ত করত না। শহরের কবুতর বাজরা এক এক

জোড়ার জন্য গোলামী পর্যন্ত করতে রাজী ছিল। ক্ষণমাত্রেই সব উড়িয়ে দিল। খাঁচা খালি হয়ে গেলে পর চাকরদের ডেকে কমলাচরণ হুকুম দিল সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে। পায়রাগুলোকে স্বাধীন করে ও গেল বটেরী আর বুলবুলিদের খাঁচার দিকে। তারপর ওদেরও কারাগার থেকে মুক্ত করল। বাইরে এসব কাণ্ড যখন চলছিল ভেতর বাড়িতে প্রেমবতী তখন বুক চাপড়ে কাঁদছে, না জানি ছেলে কি অনর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। বিরজনকে ডেকে বলল—মা, যেভাবে পার ছেলেকে থামাও। কি জানি ও মনে মনে কি ভেবেছে! এই বলে কাঁদতে লাগল। বিরজনেরও সন্দেহ হচ্ছিল যে, অবশ্যই ওর আর কোন উদ্দেশ্য আছে, না হলে এই রাগ কেন! যদিও কমলাচরণ দুরাচারী, কুচরিত্রের তবু এসব দোষ থাকা সত্বেও ওর মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল, কোন স্ত্রীলোককে অবহেলা না করা। বৃজরাণীর ওপর ওর সত্যিকারের প্রীতি ছিল। আর এই গুপ্ত প্রীতির পরিচয় বার-কয়েক ও পেয়েছে। এই কারণেই বৃজরাণী গরবিনী হয়ে উঠেছিল। কাগজ বার করে পত্র পাঠাল—

প্রিয়তম,

এই কোপ কার ওপর? কেবল এই জন্যেই কি, যে আমি দু-তিনটে ঘুড়ি ছিঁড়ে ফেলেছি? যদি বুঝতে পারতাম এমন সামান্য ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেন, তাহলে কখনই ওগুলোতে হাত দিতাম না। কিন্তু এখন তো অপরাধ হয়ে গেছে, ক্ষমা করুন আমার এ প্রথম ত্রুটি।

আপনার—

বৃজরাণী

চিঠি পড়ে কমলাচরণ এমন আহ্লাদিত হল যেন ও সমস্ত পৃথিবীর সর্ব ঐশ্বর্য লাভ করেছে। উত্তর দেবার ইচ্ছা হল প্রবল। কিন্তু কলম হাতে উঠছিল না। না প্রশস্তি মাথায় আসে, না বয়ান। শুরুই বা করবে কেমন করে! শেষ করার বুদ্ধিও মাথায় খেলছে না। খুব চাইল ভাবপূর্ণ আনন্দঘন চিঠি লেখে, কিন্তু কোন বুদ্ধিই যোগাল না।

আজ জীবনে প্রথমবার নিজের মূর্খতায় আর নিরক্ষরতায় কমলাচরণের কান্না পেল।—কি দুঃখী আমি। একটা সোজাসুজি চিঠিও লিখতে পারি না—এই নিদারুণ কষ্টে ও কাঁদতে লাগল। ঘরের জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে কেউ না দেখতে পায়।

তৃতীয় প্রহরে মুন্সী শ্যামাচরণ বাড়ি ফিরতে প্রথমেই এক অগ্নিকুণ্ড ওঁর চোখে পড়ল। বিস্মিত হয়ে চাকরদের জিগ্‌গেস করলেন—এই আগুন কিসের?

চাকররা জবাব দিল—কর্তা, খাঁচা জ্বলছে।

মুন্সীজী—(ধমকে)—এগুলো জ্বালাচ্ছো কেন? এখন পায়রা থাকবে কোথায়?

চাকর—ছোটবাবু হুকুম দিয়েছেন খাঁচাগুলো সব জ্বালিয়ে দেবার জন্যে।

মুন্সীজী—পায়রাগুলো গেল কোথায়?

চাকর—সব উড়িয়ে দিয়েছেন। একটাও রাখেন নি। ঘুড়িগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। সুতোও সব পুড়িয়ে দিয়েছেন। ওহ্! বড় লোকসান করলেন!

চাকররা মারের বদলা নিতে চেয়েছিল এই ভাবে। ওরা ভেবেছিল এই মোটা রকমের লোকসানের জন্য মুন্সীজী কমলাচরণকে ভাল মন্দ কিছু বলবেন, কিন্তু এ সংবাদ শুনে উনি হতবাক হয়ে রইলেন। যে জীবগুলোর জন্যে সে প্রাণ দিয়ে দিত আজ অকস্মাৎ কি তার মতি পাল্টে গেল? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গোপন রহস্য আছে। মনে মনে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে চাকরকে বললেন—খোকাকে পাঠিয়ে দাও।

মিনিট খানেক পর চাকর এসে বলল—হুজুর, ছোটবাবুর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক কড়া নাড়লাম কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

একথা শুনেই মুন্সীজীর মুখ শুকিয়ে গেল। অকস্মাৎ ওঁর সন্দেহ হল যে, ছেলে বিষ খেয়েছে। আজ একটা বিষ খাওয়ার মোকদ্দমার রায় দিয়ে এসেছেন। তখুনি খালি পায়ে দৌড়লেন। ঘরের বন্ধ

দরজায় লাথি মারতে মারতে চিৎকার করতে লাগলেন—খোকা! খোকা! এর পরই ওঁর গলা রুদ্ধ হয়ে এল। কোন শব্দ আর বেরুল না মুখ দিয়ে। পিতার কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে, চোখের জল মুছে দরজা খুলে দিল কমলাচরণ। কিন্তু, চিৎকার ভর্ৎসনার বদলে মুন্সীজী যখন ওকে বুকে টেনে নিয়ে ব্যাকুল হয়ে জিগ্‌গেস করলেন—খোকা তোকে আমার মাথায় দিব্যি, বল, তুই কিছু খেয়ে নিস্‌নি তো? এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে কমলাচরণ বিস্মিত না হয়ে পারে না। অর্থ বোঝার জন্য ও মুন্সীজীর দিকে চোখ তুলে তাকাল, চোখে জল ভরা। মুন্সীজী এবার পুরোপুরিই বিশ্বাস করলেন নিশ্চয়ই ও বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। চাকরকে বললেন—ডাক্তার সাহেবকে ডেকে আন। বলবি এক্ষুনি আসতে।

এতক্ষণে নির্বোধ কমলা পিতার হতচকিত হওয়ার অর্থ বুঝতে পারল। দৌড়ে গিয়ে ওঁকে জড়িয়ে ধরে বলল—আপনার ভুল হয়েছে। আপনার মাথার দিব্যি, আমি খুব ভাল আছি।

কিন্তু ডেপুটি সাহেবের তখন বুদ্ধিবিভ্রম ঘটেছে। উনি ভাবলেন ওঁকে আটকে রেখে কমলাচরণ দেরী করিয়ে দিতে চাইছে। তাই স্নেহভরে বললেন—খোকা, ভগবানের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দে, আমি সিন্দুক থেকে একটা ওষুধ নিয়ে আসি। আমি কি করে জানব যে তুমি এই উদ্দেশ্য নিয়ে বোর্ডিং থেকে এসেছ!

কমলা—ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সম্পূর্ণ ভাল আছি। আমার যদি এতো লজ্জা থাকত তাহলে মূর্খ থাকতাম কি করে? আপনি মিথ্যেই ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছেন।

মুন্সীজী—(খানিকটা বিশ্বাস করে) তাহলে দরজা বন্ধ করে কি করছিলি?

কমলা:—বাড়ির ভেতর থেকে একটা চিঠি এসেছে তার উত্তর লিখছিলাম।

মুন্সীজী—তবে এই পায়রা, পাখী এগুলো সব উড়িয়ে দিলি কেন?

কমলা—যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়তে পারি তার জন্য! এইসব ঝামেলাতেই সময় নষ্ট হচ্ছিল। আজ আমি তার নিষ্পত্তি করেছি। এবার থেকে দেখবেন আমি পড়াশোনায় কেমন মন দিই। এতক্ষণে ডেপুটি সাহেবের বুদ্ধি খুলল। ভেতরে এসে প্রেমবতীর কাছে সব জানতে চাওয়ায় ও তাঁর কাছে সাত কাণ্ড রামায়ণ ব্যাখ্যান করে শোনাল। উনি যখন শুনলেন বিরজনই রাগ করে কমলার ঘুড়ি ছিঁড়ে আর লাটাই ভেঙে দিয়েছে, খুব একচোট হাসলেন। তাহলে, কমলার প্রমোদ সামগ্রীর ধ্বংস যজ্ঞের গূঢ় রহস্য এটাই! বললেন—মনে হচ্ছে বৌমাই এই মক্কেলকে সিধে করতে পারবে।

১৪

বৃজরাণী শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর সুবামার গৃহ এমন শূন্য হয়ে গেল যেন খাঁচা থেকে পাখী উড়ে গেছে। সে ছিল দেউলের দীপ, আর দেহের প্রাণ। যেমন বাড়ি ঠিক তেমনই আছে, শুধু বৃজরাণীর বিহনে এক নিঃসীম শূন্যতা বিরাজ করছে সারা বাড়ি জুড়ে। গৃহের বাসিন্দা সেই একই আছে শুধু মুখের ঔজ্জ্বল্য আজ আর তাদের নেই। দৃষ্টি জ্যোতিহীন। সেই একই বাগান, কিন্তু এ যেন পাতা ঝরার ঋতু! মেয়ে বিদায়ের মাসখানেক পর সঞ্জীবনলালও তীর্থ করতে চলে গেলেন। যাবার বেলায় ধন-সম্পত্তি সব প্রতাপের হাতে সমর্পণ করে গেলেন। পাথেয় বলতে সঙ্গে রইল মৃগচর্ম, ভাগবদ্‌গীতা আর কিছু বই।

প্রতাপচন্দ্রের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ছিল বড় প্রবল। কিন্তু সেই সঙ্গে তা দমন করার ক্ষমতাও ছিল অসীম। বাড়ির প্রত্যেকটি জিনিস তাকে বিরজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। মনে মনে ভাবত—এই চিন্তা ক্ষণেকের জন্যও বিস্মৃত হতাম না যদি বিরজন আমার হত, তাহলে কত সুখে জীবন কাটত! এই সব সুখ-দুঃখের স্মৃতি ও দৃঢ়চিত্তে দূরে সরিয়ে রাখত। পড়তে বসলে বই খোলা থাকত আর মন চলে যেত অন্যত্র। খেতে বসলে বিরজনের ছবি চোখের সামনে ঘুরে বেড়াত। প্রেমের এই আগুনকে চাপতে চাপতে ওর শরীরের অবস্থা এমন হল

যেন কত কালের রোগী। অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার আশা থাকুক আর নাই থাকুক প্রেমিকরা মনে মনে প্রেমিকার সঙ্গে মিলনের সুখ অনুভব করে। ভাবজগতে বিচরণ করে তারা তাদের আপন প্রেমপাত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ করে। তার সঙ্গে মিথ্যা কলহ করে, তার মান ভাঙায়। এই ভাববিলাসে তাদের তৃপ্তি লাভ হয়। আর মনের এক চরম সুখ এক রসময় কর্মে মিলে যায়। কিন্তু যদি কোন অশুভ শক্তি তাদের এই ভাবোদ্যানে বিচরণে বাধা দেয় বা ধ্যানে তাদের প্রিয়তমার রূপ দেখতে না দেয় তাহলে অভাগা প্রেমিক কুলের কি দশা হবে! প্রতাপ ছিল অভাজনদের দলেরই একজন। এতে সন্দেহ নেই যে ও যদি চাইত তাহলে এই সুখময় ভাবের আনন্দ ভোগ ও করতে পারত। ভাবজগতে বিচরণ করা বড়ই সুখের, কিন্তু দুরূহ কাজ এটাই ছিল যে ও বিরজনের চিন্তাকে কুৎসিত কল্পনা থেকে দূরে সরিয়ে তাকে পবিত্র রাখতে চাইত। ওর শিক্ষাদীক্ষা এমনই পবিত্র নিয়মে হয়েছিল এবং এমন রুচিশীল আর নীতিপরায়ণ সজ্জনদের সঙ্গ থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগ ওর হয়েছিল যে ব্যবহারিক জীবনের পবিত্রতার প্রতিষ্ঠার মতো ওর দৃষ্টিতে চিন্তার পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাও ততখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ কি কখনও সম্ভব, যে বিরজনকে ও কতবার বোন বলে সম্বোধন করেছে, আজও যাকে বোনের মতই ভাবতে চেষ্টা করে, তার চিন্তাকে ওর কল্পনার কেন্দ্র করে। তবু সে কল্পনা কুবাসনা থেকে যতই মুক্ত হোক দূষিত আবেগ থেকে মুক্ত হতে পারত না। যতদিন সঞ্জীবনলাল বিদ্যমান ছিলেন, প্রতাপের কিছু না কিছু সময় ওঁর সঙ্গে ধর্মচিন্তায় কেটে যেত, যাতে আত্মার সন্তোষ হয়। কিন্তু উনি চলে যাবার পর আত্মশুদ্ধির এই সুযোগটুকুও প্রতাপের চলে যেতে বসল।

প্রতাপকে বিষণ্ণ দেখে সুবামা বড়ই দুঃখ পেত। একদিন ছেলেকে ডেকে বলল—যদি তোমার এখানে মন না বসে তো প্রয়াগে চলে যাও। ওখানে হয়তো তুমি মনের শান্তি খুঁজে পাবে। এ কথা প্রতাপেরও কয়েকবার মনে হয়েছিল কিন্তু চলে গেলে ওর মাকে

একা থাকতে হবে, এই ভয়ে আর এ নিয়ে কোন চিন্তা করেনি। মায়ের আদেশ পেয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলল। যাত্রার ব্যবস্থা চলতে লাগল। দিনও স্থির হয়ে গেল। এখন সুষমার এমনই অবস্থা, যখনই দেখা যায়, প্রতাপকে বিদেশে বসবাসের শিক্ষা দিচ্ছে···দেখো বাবা, কারো সঙ্গে যেন ঝগড়া বিবাদ বাধিয়ে বসো না। এমনিতেও তোমার ঝগড়া-বিবাদ করার অভ্যাস নেই, তবুও মনে করিয়ে দিচ্ছি, বিদেশ বলে কথা। পদে পদে সাবধান থেকো। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করো না। শীতের সময় সন্ধ্যেবেলা শুয়ে প'ড়ো। সে যতই তোমায় কেউ ডাকুক তুমি উঠবে না। এ এক তোমার আবার বদ অভ্যাস। বিদেশেও যদি তুমি এই অভ্যাস জিইয়ে রাখ তাহলে রাতে তোমার খাওয়া মিলবে কি করে? দিনের বেলা খানিকক্ষণের জন্যে শুয়ে নিও। দিনে তো তোমার চোখে আবার ঘুম আসে না।

সুষমা যখনই সময় পায় ছেলেকে এই ভাবে শিক্ষা দিতে থাকে।

শেষে যাওয়ার দিন এসে গেল। বেলা দশটায় গাড়ি। প্রতাপ ভাবল—বিরজার সঙ্গে দেখা করে নিই। বিদেশে যাচ্ছি। আবার না জানি কবে দেখা হবে—মন উৎসুক হয়ে উঠল। প্রতাপ মাকে ওর ইচ্ছার কথা জানাল। শুনে সুষমা খুবই উৎফুল্ল হল। একটা থালায় মিষ্টি, সিঙ্গাড়া আর দু-তিন রকমের মোরোব্বা সাজিয়ে রাধিয়াকে দিল যাতে লালুর সঙ্গে যায়। প্রতাপ চুল আঁচড়ালো, কাপড় পাল্টালো। রওনাও হল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু যত এগিয়ে যায় মন পিছিয়ে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা মাথায় আসে—বিরজা কি জানি কি ভাববে। চার মাস হয়ে গেল ও তো আমাকে আলাদা করে একটা চিঠিও লেখেনি। তাহলে কেমন করে ভাবি আমার সঙ্গে দেখা হলে ও খুশী হবে! আরে, এখন আর ওর তোমার জন্যে ভাবনার কি আছে? যদি মরেও যাও, চোখের জল মুছে ফেলবে না। এখানকার কথা ছিল ভিন্ন। ওহ্! নিশ্চয়ই খুই খারাপ দেখাবে। আবার ভেবে না বসে লালাজী সেজেগুজে আমাকে দেখাতে এসেছে। এই সব আবোলতাবোল নানা কথা ভাবতে ভাবতে এগোচ্ছিল প্রতাপ।

শ্যামাচরণের বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। কমলাচরণ মাঠে বেড়াচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়েই প্রতাপের দশা এমন হল যেন কোন চোর সেপাইকে দেখেছে। তাড়াতাড়ি একটা বাড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ে রাধিয়াকে বলল—এই যা, এগুলো দিয়ে আয়। আমি একটা কাজে বাজারে যাচ্ছি। ফেরার পথে যাব। এই বলে ও বাজারের দিকে পা বাড়াল। মাত্র পা দশেক এগুতে না এগুতে ঝিকে ডেকে বলল—আমার হয়তো দেরী হয়ে যেতে পারে। তাই নাও আসতে পারি। যদি কিছু জিগগেস করে তো এই চিঠিটা দিয়ে দিস। পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বার করে কয়েক লাইন লিখে রাধিয়ার হাতে দিল। চিঠি থেকেই ওর মনের অবস্থার পরিচয় ভাল ভাবেই মেলে।

আজ আমি প্রয়াগে যাচ্ছি। এখন ওখানেই পড়ব। তাড়াতাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। বেঁচে থাকলে আসব। মাঝে মাঝে তোমার কুশল সংবাদ দিও।

তোমার প্রতাপ।

চিঠি দিয়েই প্রতাপ হাঁটতে শুরু করল। রাধিয়া আস্তে আস্তে বিরজনের বাড়ি এসে পৌঁছল। ওকে দেখতে পেয়েই দৌড়ে এল বিরজন। কুশল সংবাদ জিগগেস করতে লাগল—বাবার কোন চিঠি এসেছে?

রাধিয়া—যবে থেকে গেছেন চিঠিপত্র কিছুই আসেনি।

বিরজন—কাকীমা ভাল আছেন?

রাধিয়া—লাল্লুবাবু তো প্রয়াগধাম যাভিছেন। তাই কিছুটা উদাসী আছেন।

বিরজন—(চমকে) লাল্লু প্রয়াগ যাচ্ছে?

রাধিয়া—হি গো? মোরা কত্ত বোঝানু, কেনে বিদেশ বিভূঁয়ে যাবে, তা কারো কতা কি শোনে?

বিরজন—কবে যাবে?

রাধিয়া—আজ দশটায় রওনা হবেন। তোমার সনে দেকা করতি আসতিছিল, তারপর দরজায় এসি ফিরি গেল।

বিরজন—এখানে এসে ফিরে গেল ! কেন দরজায় কেউ ছিল না নাকি ?

রাধিয়া—দরজায় কোত্তা এল গো। পত থিকেই ফিরে গেলেন।

বিরজন—কিছুই বলল না. কেন ফিরে যাচ্ছেন ?

রাধিয়া—কিছুই কলেন না। শুধু কলেন কি, মোর টেন ছুটি যাবে। আমি যাত্তিছি।

বৃজরাণী ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বেজেছে। ছুটে প্রেম-বতীর কাছে গিয়ে বলল—মা, লাল্লু আজ প্রয়াগ চলে যাচ্ছে। যদি আপনি বলেন তবে দেখা করে আসি। আবার কবে দেখা হবে কি না হবে। ঝি বলেছে আমার সঙ্গেই নাকি দেখা করতে আসছিল, কিন্তু রাস্তার ওপার থেকেই ফিরে গেছে।

প্রেমবতী—এখন না চুল বেঁধেছ, না সিঁদুর পরেছ, কাপড়ও ছাড়া হয়নি, ব্যস্, যাওয়ার জন্মে অমনি তৈরী হয়ে গেলে ?

বিরজন—মা আমায় আজকের দিনটায় যেতে দিন। চুল বাঁধতে বসলে এখানেই দশটা বেজে যাবে।

প্রেমবতী—আচ্ছা তাহলে যাও। কিন্তু সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে এস। গাড়ি তৈরী করে নাও। আমার তরফ থেকে সুবামাকে নমস্কার জানিও।

বিরজন কাপড় পাল্টাল। গাড়ি তৈরী রাখতে বলতে মাধবীকে বাইরে পাঠাল। এতক্ষণ কোন কিছু ওর খেয়ালে আসেনি। হঠাৎ রাধিয়াকে জিগগেস করল—হ্যাঁরে কোন চিঠিপত্র কিছু দেয়নি ? রাধিয়া সঙ্গে সঙ্গে চিঠি বার করে দিল। খুব খুশী হয়েই চিঠিটা হাতে নিয়েছিল বিরজন। কিন্তু পড়ার পর ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। চিন্তা করতে লাগল—দরজা পর্যন্ত এসে ও হঠাৎ ফিরে গেল কেন। আর চিঠিও যা লিখেছে এমন ছাড়া ছাড়া আর অস্পষ্ট। এমন কি তাড়া ছিল। গাড়ী কি কিছু রমৃত্তি আছে। সারা দিনে বেশী না হলেও পাঁচ ছটা। আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘণ্টা দুয়েকের দেরীও অসহ্য হয়ে গেল! নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। আমি কি অপরাধ

করেছি। এই সময়ে ওর একদিনের কথা মনে পড়ল, ও ব্যাকুল হয়ে প্রতাপের কাছে ছুটে গিয়েছিল। প্রতাপকে দেখে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল—লাল্লু আমি কেমন করে থাকবো? এর আগেও বিরজনের কয়েকবার মনে হয়েছিল যে সে সময়ে ওর ওভাবে যাওয়া ঠিক হয়নি। আজও মনে হল। তৎক্ষণাৎ ও এই কথাই বিশ্বাস করল,—লাল্লুর চোখে আমি ছোট হয়ে গেছি। আমার প্রেম আর মন এখন ওর হৃদয়ের মধ্যে নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসে পড়ল বিরজন। তারপর মাধবীকে ডেকে বলল—কোচওয়ানকে বলে দে এখন যেন গাড়ি তৈরী না করে। আমি যাব না।

১৫

যতদিন বিরজন শ্বশুরবাড়ি আসেনি ততদিন ওর দৃষ্টিতে এক-হিন্দু পতিব্রতার কর্তব্য আর আদর্শের কোন নিয়ম স্থির হয়নি। বাড়িতে কখনও পতি সম্বন্ধে কোন চর্চাও হত না। স্ত্রীধর্ম সম্বন্ধে অনেক বই ও অবাশ্যই পড়েছিল, কিন্তু তার কোন চিরস্থায়ী প্রভাব ওর ওপরে পড়েনি। কখনো ওর মনে হয়নি যে এ বাড়ি ওর নয়। আর খুব শিগগিরই ওকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কিন্তু যখন শ্বশুরবাড়ি এল আর নিজের প্রাণনাথ পতিকে প্রতিক্ষণ চোখের সামনে দেখতে লাগল তখন ধীরে ধীরে ওর চিত্তবৃত্তিতে পরিবর্তন এল। জানতে পারল—আমি কে, আমার কর্তব্য কি, আমার ধর্ম কি, আর তাকে নির্বাহ করার রীতিই বা কি। আগের সব ঘটনা স্বপ্নবৎ মনে হতে লাগল। বিরজন স্মরণ করতে লাগল—কি অপরাধ করেছি, যার কালিমা কিছুতে দূর করতে পারছি না? এসব ভেবে ও লজ্জায় মাথা হেঁট করত আর নিজেকে বার বার ধিক্কার দিত। আশ্চর্য হত যখন ভাবত, লাল্লুর সামনে ওর যাওয়ার সাহস কেমন করে হত। নির্জলা বাস্তবকে ও যখন স্বপ্ন বলে ভাবত তখন লাল্লুর শান্ত সৌম্য মূর্তি ওর চোখের সামনে এসে দাঁড়াত। বিরজন তাকে ওর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করত। কিন্তু আজ

প্রতাপচন্দ্রের এই সঙ্কীর্ণ ব্যবহার ওকে একথা ভাবতে বাধ্য করাল—সান্নু সেই সব দিনের ঘটনাগুলো আজও ভোলেনি, ওর চোখে আমার আজ আর কোন সম্মান নেই, এমন কি ও আমার সুখটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। এই গ্লানি বিরজনের মনে ক্রোধের সঞ্চার করল। ওর হৃদয়ে প্রতাপের জন্য যে সুস্থ সুন্দর চিন্তা ছিল তা মলিন হল। যে প্রেম আর সম্মান মনে গেঁথে ছিল তা এক লহমায় কর্পূরের মত উবে যেতে লাগল। নারীর চিত্ত অতি দ্রুত প্রভাবিত হয়—যে বিরজন প্রতাপের জন্য নিজের অস্তিত্ব ধুলোয় মিশিয়ে দিতে তৎপর ছিল—আজ সে-ই তার একটা সামান্য ছেলেমানুষিকে ক্ষমা করতে পারে না। ওর হৃদয় কি এতই সংকীর্ণ? এই অসহনীয় চিন্তা বিরজনের বুকে কাঁটার মতো বিঁধতে লাগল।

আজ থেকে বিরজনের সমস্ত সজীবতা লুপ্ত হল। মনের মধ্যে যেন বিরাট একটা বোঝা চেপে বসল। ও ভাবছিল—প্রতাপ যখন আমাকে ভুলে গেল আর অণুমাত্র সম্মানও আমাকে করে না, তখন এই শোকে আমি কেন নিজের প্রাণ অতিষ্ঠ করছি, যেমন রামের জন্য তুলসী, তেমনি তুলসীর জন্যও রাম! (যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল)। ও যদি আমাকে ঘৃণা করে আমার মুখ দেখতে না চায়, তাহলে আমিও ওর মুখ দেখতে ঘেন্না করি। আর, আমারও ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নেই। নিজের ওপরই ক্রুদ্ধ হয় বিরজন—সব সময় ওর চিন্তাই বা আমি করব কেন? সঙ্কল্প করে আর ওর চিন্তা মনে ঠাঁই দেবে না। কিন্তু খানিক পরে ওর চিন্তা প্রতাপের চিন্তাতেই বিলীন হয়। বিরজন অস্থির হয়ে ওঠে। হৃদয়ের এই সন্তাপ দূর করার জন্য ও কমলাচরণকে সত্যিকারের প্রেমের পরিচয় দিতে চায়। খানিকক্ষণের জন্যও কমলা যদি কোথাও যায় তো বিরজন অস্থির হয়ে পড়ে। টাকা পয়সা যা জমিয়ে ছিল সব কমলাচরণের হাতে তুলে দিয়ে বলল—সোনার ঘড়ি আর চেন কিনে নিও। টাকা নিতে কমলাচরণ অস্বীকার করায় মন খারাপ হয়ে গেল বিরজনের। এমনিতেই কমলাচরণ বিরজনের দাস ব'নে গিয়েছিল। এখন ওর প্রেমের বাহুল্য দেখে প্রাণ সমর্পণ করল।

বন্ধুরা শুনে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মিঞা, সৈয়দ আর হমীদ নিজেদের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগল এমন স্নেহশীলা পত্নী তাদের কপালে জোটেনি বলে। বলল—না চাইতেই ও তোমাকে টাকা দিচ্ছে আর এদিকে টাকা হাতানোর ঠেলায় আমাদের দম বেরনোর দাখিল! চাই নিজের কাছে একটা কাণাকড়িও না থাকুক কিন্তু বৌ-এর ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ করতে হবে, না হলে প্রলয় কাণ্ড বেধে যাবে। আরে অন্য কথা কি বলি, কখনও যদি বাড়ি থেকে এক খিলি পান আনতেও যাই সেখানেও পাঁচ দশটা উল্টো সিধে কথা না শুনে রেহাই নেই। ঈশ্বর আমাদের তোমার মত বৌ দিন।

এ সবই ছিল, কমলাচরণও ভালবাসত আর বৃজরাণীও ভালবাসত। কিন্তু প্রেমিকের সংসর্গে যে আনন্দ হয় বৃজরাণীর মুখে তার কোন চিহ্ন দেখা যেত না। ও দিন দিন দুর্বল আর কৃশ হয়ে পড়ছিল। কমলাচরণ দিব্যি গেলে জিগগেস করত—তুমি দুর্বল হয়ে যাচ্ছ কেন? ওকে প্রসন্ন করার জন্য যা যা করা সম্ভব করত। বন্ধুদের কাছেও এ নিয়ে পরামর্শ করত। কিন্তু কোন লাভ হচ্ছিল না। বৃজরাণী হেসে হেসে জবাব দিত—আমি ভালই আছি তুমি কোন চিন্তা কোর না। এ কথা বলতে বলতে চিরুনি দিয়ে ওর মাথা আঁচড়াত কিংবা পাখার বাতাস করত। বিরজনের এই সেবা-যত্নে কমলাচরণের আনন্দের অবধি থাকত না। কিন্তু বুকের মধ্যে যে কীট বাসা বেঁধেছে ওপর থেকে তাতে যতই রঙ্ পালিশ পড়ুক না কেন বুকটা সে ঝাঁঝরা করে দেবেই। প্রতাপচন্দ্র ওকে ভুলে গেছে, ওর নজরে সে ছোট হয়ে গেছে, এই অস্বস্তিকর চিন্তা সর্বসময় বিরজনের হৃদয়কে শূলের মত বিদ্ধ করতো। ওর অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হতে লাগল। এমনকি বিছানা ছেড়ে ওঠাও ওর পক্ষে এখন কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তারের নির্দেশ মতো ওষুধও চলতে লাগল।

ওদিকে প্রয়াগে প্রতাপচন্দ্রের মন ক্রমশ বসতে শুরু করেছিল। ব্যায়ামের প্রতি প্রতাপের বরাবরই আকর্ষণ। আবার, প্রয়াগে ব্যায়ামচর্চার বেশ রেওয়াজও ছিল। মানসিক ভার লঘু করার জন্য

চারিক শ্রম অতি উত্তম। তাই সকালে প্রতাপ জিমন্যাসটিক করত, বিকেলে ক্রিকেট আর ফুটবল খেলা, তারপর আটটা ন'টা পর্যন্ত বাগানে বেড়ানো। এত পরিশ্রমের পর বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুম ভাঙত সেই ভোরবেলা। ছ মাসের মধ্যেই প্রতাপ ক্রিকেট আর ফুটবলের ক্যাপটেন হয়ে বসল আর দু-তিনটে মাস এমন খেলা খেলল যে সারা শহরে হৈচৈ পড়ে গেল।

আজ ক্রিকেটে, আলিগড়ের নিপুণ খেলোয়াড়দের মোকাবিলা করার ছিল। ওরা হিন্দুস্তানের নামজাদা খেলোয়াড়দের পরাস্ত করে বিজয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে এখানে উপস্থিত হয়েছে। বিজয়ের ব্যাপারে অণুমাত্র সন্দেহও ওদের নেই। তবে প্রয়াগবাসীরাও হতাশ হয়নি। ওদের আশা প্রতাপচন্দ্র। প্রতাপের খেলার ওপর নির্ভর করেই ওরা নিরুদ্বিগ্ন। যদি ও আধঘন্টা টিঁকে যায় তো রানের ঢেউ লাগিয়ে দেবে। আর অতক্ষণ পর্যন্ত যদি ওর খেলা চলে তো বিপক্ষ দলে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে যাবে। এর আগে এত বড় ম্যাচ খেলার সুযোগ প্রতাপের হয়নি। পুরো কলেজ উদ্বেল হয়ে ছিল না জানি শেষে কি হয়। দশটার সময় খেলা শুরু হল। প্রথমে আলিগড়ের ব্যাট করার পালা পড়ল। দু-আড়াই ঘন্টা ওরা খুব কেরামতি দেখাল। একটা বাজতে বাজতে খেলার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল। আলিগড় চারশ' রান করেছে। এবার প্রতাপেদের ব্যাট করার পালা। কিন্তু শুরুর পর্বেই ওদের খেলোয়াড়দের হাত-পা কাঁপতে শুরু করে দিল। ওরা ধরেই নিয়েছে যে খেলায় ওরা জিত্‌তে পারবে না। এখন খেলায় সমতা আনা অত্যন্ত কঠিন। এত রান করবে কে? একা প্রতাপের পক্ষে সম্ভব নাকি? প্রথম খেলোয়াড় মাঠে নামল আর তৃতীয় বলেই আউট হয়ে বিদায় নিল। দ্বিতীয় খেলোয়াড় খুব কষ্ট করে পাঁচ বল খেলতে পারল। তৃতীয় জন এল আর প্রথম বলেই আউট। চতুর্থ খেলোয়াড় দু-তিনটে বল বেশ ভালই হিট করল, কিন্তু জমাতে পারল না। পাঁচ নম্বর সাহেব, কলেজে ওর একাধিপত্য। কিন্তু ওরও এখানে একাধিপত্য টিঁকল না। ব্যাট ধরতে ধরতেই চলে যেতে হল। এবার প্রতাপ-

চন্দ্র দৃঢ় পদক্ষেপে ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে মাঠে নামল। দুই পক্ষই হাততালি দিল। প্রয়াগবাসীদের অবস্থা অকথনীয়। প্রত্যেকেরই দৃষ্টি প্রতাপচন্দ্রের ওপর নিবদ্ধ। সবারই বুক উদ্বেলিত। চারিদিকে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে। এর মধ্যে কয়েকজন আবার দূরে বসে প্রার্থনা করছে যাতে প্রতাপের জয় হয়। একাগ্রচিত্তে দেবদেবীর স্মরণ করছে। প্রথম বলটি প্রতাপ ছেড়ে দিল। প্রয়াগবাসীদের সাহস এতে কিছুটা দমল। দ্বিতীয় বলও ছাড় গেল। প্রয়াগ পক্ষের হৃদয় এবার নাভি-মূলে এসে নেমেছে। অনেকে ছাতা গুটিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। তৃতীয় বল আসার সঙ্গে সঙ্গে জোরে শব্দ হল আর বল সোঁ সোঁ বেগে আকাশ ভেদ করে হিটে দাঁড়ানো খেলোয়াড়দের একশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল। সবাই হাততালি দিতে লাগল। যেন এবার শুকনো ধানে জল পড়েছে। যারা চলে যাচ্ছিল থমকে থেমে দাঁড়ালো। নিরাশাগ্রস্তদের মনে আশার সঞ্চার হল। চতুর্থ বল এল আর আগের বারের চেয়ে দশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল। ফিল্ডার চমকে ওঠে। হিটে কি সাহায্য চাই! পঞ্চম বল আসার সঙ্গে সঙ্গে বাউণ্ডারীতে গিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে ওভার শেষ। বোলার পাল্টাল। নতুন বোলার খুবই বিপজ্জনক। ঘাতক ওর মতই বল করত। কিন্তু ওর প্রথম বলকেই প্রতাপ আকাশে পাঠিয়ে প্রায় সূর্যকে স্পর্শ করিয়ে ফেলেছিল। এরপর ব্যাটে বলে তো সখ্যই হয়ে গেল। বল আসছিল আর ব্যাট পাশ ফিরে তাকে কখনও পূবের দিকে কখনও আবার পশ্চিমে, নয়তো উত্তর কিম্বা দক্ষিণে ছুঁড়ে মারছিল। এদিকে সারা মাঠে দৌড়তে দৌড়তে ফিল্ডারদের প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। প্রয়াগবাসীরা আনন্দে লাফাতে লাফাতে হাত-তালি দিতে লেগেছে। টুপিগুলো সব বাতাসে উড়ছে। কেউ টাকা ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ বা ছুঁড়ছে সোনার চেন। বিপক্ষ দলের সবাই মনে মনে বেশ বিরক্ত হচ্ছিল। বিরক্তি প্রকাশ করতে কখনও খিট খিট করছে, কখনও আবার ফিল্ড ঢেলে সাজাবার জন্য ব্যবস্থার পরিবর্তন করছে কিম্বা বোলার পাল্টাচ্ছে। কিন্তু ওদের সব চাতুরী সব ক্রীড়া কৌশল ব্যর্থই হল। বলের সঙ্গে ব্যাটের জবরদস্ত মৈত্রী

হয়ে গেছে। পুরো দুঘন্টা ধরে প্রতাপ পট্‌কা গোলাবাজি আর হাউই ছুঁড়তে লাগল। ফিল্ডাররা এমন অবাক চোখে বলের দিকে তাকাচ্ছে যেন শিশুরা চাঁদের দিকে চেয়ে আছে। রাণ সংখ্যা তিনশ ছুঁল। বিপক্ষদলের সঙ্গীন অবস্থা। এত ঘাবড়ে গেছে যে বোলার এলোপাথারি বল করছে। আরও পঞ্চাশ রান করল প্রতাপ। এবার ও আম্পায়ারের কাছে বিশ্রামের জন্য আবেদন জানাল। ওকে আসতে দেখে লোকেরা হুড়োহুড়ি করে ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়ে নাচতে লাগল। চারিদিকে ছুটোছুটি লেগে গেছে। শয়ে শয়ে ছাতা, ছড়ি, টুপি আর জুতো উর্ধ্বগামী হয়ে আনন্দে লাফাতে লেগেছে। ঠিক এই সময় বাইসাইকেলে করে তার ঘরের এক চাপরাশী সেখানে উপস্থিত হয়ে জিগগেস করল—প্রতাপচন্দ্র কার নাম? প্রতাপ চম্‌কে চাপরাশীর দিকে তাকাতে সে টেলিগ্রামের খাম্‌টা ওর হাতে দিল। ওটা পড়তেই প্রতাপের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে বসে পড়ে দলের আর সকলকে বলল—ভাই, এবার ম্যাচের (খেলার) নিষ্পত্তি তোমাদের হাতে। আমি আমার কর্তব্য পালন করে দিয়েছি, এই মেলেই আমাকে বাড়ি চলে যেতে হবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রতাপ বোর্ডিং হাউসের দিকে এগুল। শয়ে শয়ে মানুষ ওর পিছনে ছুটছে। সবার মুখে হতাশা, সবারই একই প্রশ্ন,—কি হয়েছে। কি হয়েছে! কিন্তু প্রতাপের উত্তর দেবার অবকাশ কোথায়! তখনই টাঙ্গায় চড়ে স্টেশনের দিকে ছুটল। সারাটা পথ নানান ভাবনায় নিজের মনেই তর্ক-বিতর্ক করতে করতে চলল, বার বার নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল—আসার সময় কেন দেখা করলাম না। না জানি আর দেখা হবে কিনা! ভগবান না করুন, যদি ওর দর্শন থেকে বঞ্চিত হই, যদি তাই সত্যিই হয় তবে আমিও মুখে কালি লেপে কোথাও মরে পড়ে থাকব। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কতবার কাঁদল প্রতাপ। রাত্রি ন'টার সময় গাড়ি বেনারসে পৌঁছল। গাড়ি থেকে নেমেই সিধে শ্যামাচরণের বাড়ির দিকে চলল। চিন্তার ভারে চোখ দুটো ছলছল্‌ করছে। আতঙ্কে বুক

কাঁপছে।

ডেপুটি সাহেব মাথা নীচু করে চেয়ারে বসেছিলেন। কমলাচরণ ডাক্তার সাহেবের কাছে যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছে প্রতাপ গিয়ে হাজির। প্রতাপকে দেখেই কমলাচরণ ওকে জড়িয়ে ধরল। শ্যামাচরণও আলিঙ্গন করলেন। জিগগেস করলেন—সোজা কি এলাহাবাদ থেকে আসছ?

প্রতাপ—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ মার তার পৌঁছাল বিরজনের অবস্থা খুব খারাপ। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়েছি। এখনও কি ওরকম অবস্থাই আছে?

শ্যামাচরণ—কি বলব, এদিকে দু-তিন মাস থেকে ওর শরীর দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওষুধের কোন ফলই হচ্ছে না। দেখি ঈশ্বরের কি ইচ্ছে। ডাক্তার সাহেব তো বলছেন ক্ষয়-রোগ। কিন্তু বৈদ্যরাজ (কবিরাজ) বলছেন হৃদয়দৌর্বল্য।

যখন থেকে বিরজন শুনেছে যে প্রতাপ এসেছে ওর মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেছিল। কখনো ভাবছিল,—বাড়ি এসেছে বোধ হয়। কাকীমা জোর জবরদস্তি ঠেলেঠুলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। আবার ভাবল—এমনও তো হতে পারে, আমার অসুখের খবর পেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে দেখতে চলে এসেছে, কিম্বা তা হয়তো নয়! আমার মত কি আর ওর চিন্তা আছে! সম্ভবতঃ ভেবেছে,—শেষে আবার মেয়েটা মরে না যায়। যাই বরং সামাজিক কর্তব্য টুকু পালন করে আসি! আমার মরা বাঁচায় ওর কি এসে যায়! ঠিক আছে, আমিও মশাইয়ের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইবো। কিন্তু না, কথার দরকারটাই বা কি আছে? ও যদি চুপ করে থাকে তো আমি কি কথা বলবো? ব্যস্, এইটুকুই বলে দেব যে খুব ভাল আছি আর তোমার কুশল কামনা করি। মুখ আর খুলছি না। আশ্চর্য! আমিই বা এই ময়লা কুঁচকানো কাপড় পরে আছি কেন! যে আমার সহধর্মী নয় তার সামনে এই অবস্থায় থেকে লাভ কি! ও অতিথির মত এসেছে, আমিও গৃহকর্ত্রীর মত ওর সঙ্গে দেখা করব। মানুষের

হৃদয় কত চঞ্চল! যার নিষ্ঠুরতা বিরজনের আজ এই দশা করেছে তাকেই আঘাত করার জন্যে সে কত উপায় ভাবছে।

দশটা বাজে। মাধবী বসে পাখার বাতাস করছিল। ওষুধের শিশিগুলো এ-ধারে ও-ধারে পড়ে আছে। বিরজন পালঙ্কের ওপর পড়ে পড়ে এসব কথা ভাবছে এমন সময় প্রতাপ ঘরে ঢুকল। মাধবী চম্‌কে উঠে বলল—দিদি ওঠ। এসে গেছেন। বিরজন তাড়াতাড়ি উঠে পালঙ্ক থেকে নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু দুর্বলতার কারণে মাটিতে পড়ে গেল। প্রতাপ দু হাত দিয়ে ওকে সামলে নিয়ে পালঙ্কে শুইয়ে দিল।...হায়! এই সেই বিরজন! আজ থেকে মাত্র কয়েক মাস আগেও যে ছিল রূপ আর লাবণ্যের প্রতিমূর্তি, যার মুখে চমক আর চোখে হাসির ছটা লেগে থাকত। যার কণ্ঠে ছিল শ্যামা পাখীর গান আর অধরে মনলোভা হাসি! সেই মিষ্টি কথা বলা বিরজন আজ অস্থিচর্মসারবিশেষ হয়ে পড়ে আছে! চেনাই যাচ্ছে না ওকে! প্রতাপের চোখ ভরে জল এল। কুশল সংবাদ জিগগেস করতে চাই-ছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে এইটুকুই বেরোল—বিরজন!...চোখ দিয়ে জলের ফোঁটা পড়ছে অবিরাম। প্রেমের চোখ, মনোভাব পরখ করার কষ্টি-পাথর। চোখ তুলে দেখল বিরজন, অশ্রুর ওই বিন্দুগুলো ওর মনের সমস্ত গ্লানি ধুইয়ে মুছিয়ে দিল।

যেমন কোন সেনাপতি আগত যুদ্ধের চিত্র মনের মধ্যে কল্পনা করে, আর হঠাৎ শত্রুকে নিজের জায়গায় দেখে হতচেতন হয়ে তার কল্পনায় আঁকা নির্ধারিত ছবির সবটুকুই ভুলে যায় সেই রকম আজ হঠাৎ প্রতাপচন্দ্রকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বিরজন যে সব কথা ভাবছিল তার সবটুকুই ভুলে গেল। প্রতাপের চোখের জল ওর দুঃখ ভোলাল। পালঙ্ক থেকে উঠে আঁচল দিয়ে ওর চোখের জল মোছাতে লাগল। প্রতাপ, যাকে অপরাধীই বলা চলে, এখন দীনহীনের মতো বসে আছে, আর বিরজন, যে নিজেকে শুকিয়ে শুকিয়ে আজ মরণের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে ওকে বলছিল—লাল্লু, ঈশ্বর জানেন, আমি রীতিমত ভাল আছি। এমন

ভাবে বলল যেন ভাল না থাকাটাই ওর অপরাধ। কি কোমল আর সংবেদনশীল হয় মেয়েরা! প্রতাপচন্দ্রের সামান্য সঙ্কোচ বিরজনকে এই জীবনের প্রতি উদাসীন করে দিয়েছিল। আজ তারই চোখের কয়েক ফোঁটা জল ওর হৃদয়ের সব সন্তাপ, জ্বালা আর অগ্নিকে নির্বাপিত করল—যে ধিক্কারের আগুনে এ কমাস ধরে ওর হৃদয়, দেহের রক্ত জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে। বড় বড় ডাক্তার, নামকরা কবিরাজ (বৈদ্যরাজ) যে রোগকে তাঁদের যথার্থ ঔষধে আর সুচিকিৎসায় ভাল করতে পারেনি আজ কয়েক ফোঁটা অশ্রু, লহমায় সেই কঠিন রোগকে নির্মূল করে দিল। এ কী অশ্রুবিন্দু! না অমৃতের কণা!

প্রতাপ খুব ধৈর্য ধরে বলল—বিরজন, কি অবস্থা করেছো তুমি নিজের?

বিরজন—(হেসে)—এ অবস্থা আমি করিনি। তুমি করেছ।

প্রতাপ—মার তার না পেলে আমি খবরও পেতাম না তো?

বিরজন—দরকারই বা কি ছিল? যাকে ভোলবার জন্যে প্রয়াগ গেলে তার মরা বাঁচায় তোমার কি এসে যায়?

প্রতাপ—মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে। আমি পর, চিঠি লিখবে কেন?

বিরজন—কে আশা করেছিল যে তুমি অতদূর থেকে আসবে, কি চিঠি লেখার কষ্ট করবে? দেখতে এসে যে দরজা থেকে ফিরে যায়, যে আমার মুখ দেখতে ঘৃণা বোধ করে তাকে চিঠি লিখে করব কি?

প্রতাপ—সে ফিরে যাওয়ায় যত দুঃখ পেয়েছি তা আমার মনই জানে। আজ পর্যন্ত তুমি আমাকে কোন চিঠি পাঠাওনি। ভাবলাম সব তুমি ভুলে গেছ।

বিরজন—তোমার কথাগুলো সত্যি বলে যদি না বুঝতাম তাহলে বলে দিতাম এগুলো সব তোমার ভেবে চিন্তে তৈরী করা কথা।

প্রতাপ—ভাল, যা ইচ্ছে ভাব। এখন শুধু এটুকু বল শরীর কেমন আছে। মুখ এমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে যে আমি তোমাকে চিনতেই পারিনি।

বিরজন—এবার ভাল হয়ে যাব। ওষুধ তো পেয়েই গেছি।

বিরজনের ইঙ্গিত প্রতাপ বুঝতে পারল। হায় অদৃষ্ট! আমার সামান্য ভুল এই প্রলয় ঘটিয়েছে! অনেকক্ষণ ধরে বোঝাল ওকে। সকালে যখন প্রতাপ বাড়ি রওনা হল, বিরজনের মুখ ফোটাফুলের মত ঢলঢল করছিল। মনে হচ্ছিল ও বিশ্বাস করেছে—লাল্লু আমাকে ভোলেনি। আমার মূর্তি, আমার প্রতি সম্মান ওর হৃদয়ে গেঁথে আছে। যে কাঁটা এই কয়েক মাস ধরে ওর হৃদয়কে বিদ্ধ করে ওর মরণদশা ঘটিয়েছিল আজ প্রতাপ সযতনে তা যেন তুলে দিয়ে গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিরজনের মুখে সেই আগের সোনার বরণ ফিরে এল। দেখে মনে হবে কখনো যেন ও অসুস্থই ছিল না।

১৬

রোগী যতদিন অসুস্থ থাকে তার কোন জ্ঞানই থাকে না কে তাকে ওষুধ দিল, কে তাকে দেখতে এল। নিজের রোগের যন্ত্রণায় তার এমনই জর্জরিত অবস্থা যে কারোর কথা মনে উঁকিও দেয়না। কিন্তু আরোগ্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষাকারীর চিন্তা, তার সেবা যত্নের কথা, তার প্রিরিশ্রমের কথা অনুভূত হতে থাকে। আর এই অনুভব তার হৃদয়ে শুশ্রূষাকারীর প্রতি আদর ও ভালবাসা বাড়িয়ে তোলে। বৃজরাণীরও এমনই অবস্থা হল। যতদিন ও নিজের কষ্টে মগ্ন ছিল, কমলাচরণের কষ্ট আর ব্যাকুলতা অনুভব করতে পারেনি। নিঃসন্দেহে বিরজনও কমলাচরণের আদর যত্ন কোন অংশে কম করত না। কিন্তু তা শুধু করেছে নিছক কর্তব্য পালনের তাগিদে, সত্যিকার প্রেম থেকে নয়। এখন রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে ওর সব আগে মনে পড়ল কমলাচরণের সেবা, যত্ন, শ্রম ও বিরজনের জন্য ওর উদ্বেগ আর ব্যাকুলতার কথা। ভাবনা হল বিরজনের, এই অপার ভালবাসা এবং উপকারের প্রতিদান ও কিভাবে দেবে। ভাবছিল—আমার ধর্ম ছিল সেবা যত্নে ওকে সুখ দেওয়া, সুখ কি দেব উল্টে ওর প্রাণঘাতী হয়ে গেছি। ও তো ওর সকল নিষ্ঠা দিয়ে, সত্যিকার প্রেম

দিয়ে আমাকে ভালবাসল, কিন্তু আমি আমার কর্তব্যটুকুও পালন করতে পারিনি। হা ঈশ্বর, আমি মুখ দেখাব কেমন করে! সত্যিকারের ভালবাসার কমল সমবেদনার পরশে প্রস্ফুটিত হয়ে যায়। যেখানে রূপ, যৌবন, সম্পদ আর প্রভুত্ব এবং সামাজিক সৌজন্য প্রেমের বীজ উপ্ত করতে অকৃতকার্য হয়, সেখানে উপকারের যাদু প্রায়ই কাজ করে। কোন হৃদয় এমন বজ্রকঠোর হতে পারে না, যা সেবায় দ্রবীভূত হয় না।

কমলাচরণ আর বৃজরাণীর মধ্যে দিন দিন প্রীতি বাড়তে লাগল। একজন ভালবাসার দাস, অন্যজন কর্তব্যের দাসী। বৃজরাণীর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলে কমলাচরণ তা পূরণ করবে না এ ছিল অসম্ভব। তখন তার তৎপরতা আর যোগ্যতা বিরজনের ইচ্ছাপূরণের প্রচেষ্টাতেই ব্যয় হত। ওর লেখাপড়া ছিল মা বাবাকে শুধু ফাঁকি দেওয়া। সর্বদা ও সেই দিকেই তাকিয়ে থাকত এই আশাতে যে এই কাজ বিরজনের প্রসন্নতার কারণ হবে। বিরজনকে খুশী করার কাজে ও সর্বদাই প্রস্তুত। একদিন মাধবীকে বাগানে ফুল তুলতে দেখল। বাড়ির পেছনে একটা ছোট ধরনের ফুল বাগান ছিল। বাড়ির কারুরই কিন্তু সেটার প্রতি কোন দরদ ছিল না। ফলে বারো মাসই সেটার হতশ্রী দশা। ফুলের ওপর বৃজরাণীর আন্তরিক ভালবাসা। বাগানের দুর্দশা দেখে মাধবীকে ও বলেছিল মাঝে মাঝে ওতে জল দিতে। ধীরে ধীরে বাগানে হতশ্রী দশার কিছুটা উন্নতি হল। গাছে গাছে ফুলও ফুটতে লাগল। কমলাচরণের জন্য এটাই যথেষ্ট ইঙ্গিত। এরপর বাগানটাকে সুসজ্জিত করার কাজে ও নেমে পড়ল। দুজন ভালো মালীকে মাইনে দিয়ে রেখে দিল। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর ফুল ও অন্যান্য গাছ লাগান হল। হরেক রকম ঘাস আর বাহারী পাতার গাছ টবে চড়ল। বেড়া এবং বাগানের ভেতরকার পথগুলো ঠিকঠাক করা হল। মাচায় মাচায় ওঠান হল বিভিন্ন ধরনের লতা। হাতে বই নিয়ে সারাটা দিন কমলাচরণ বাগানে পায়চারী করতে করতে বাগান সাজান আর তার প্রস্তুতির ব্যাপারে মালীদের

নির্দেশ ও তাগাদা দিতে লাগল। একটি আশায়, বিরজন খুশী হবে। এরকম ভালবাসার কাঙাল যে, তার যাদু কার ওপর না কার্যকরী হবে? একদিন কমলাচরণ বৃজরাণীকে বলল—চল, তোমার বাগানে বেড়িয়ে আনি। বৃজরাণী ওর সঙ্গে চলল। চাঁদ উঠেছিল। তার উজ্জল আলোয় বাগানের ফুল আর পাতা পরম রমণীয় হয়ে উঠেছিল। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল বাগানের চারিদিকে। জুঁই আর বেলীর মধুর সুবাস মনকে মাতাল করছিল। এই সময় একটা রেশমী শাড়ি, একজোড়া স্লিপার পরে বাগানের পথে বিরজনকে বেড়াতে দেখা গেল। ওর মুখের কমনীয় কান্তি ফুলেদের যেন সাজিয়ে তুলছিল। ওকে মনে হচ্ছিল ফুলেদের দেবী। কমলাচরণ বলল—আমার এতদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক হল। সুধারসে যেমন গোলাপ ভরা থাকে, বৃজরাণীর চলচলে চোখ দুটো ঠিক তেমনি প্রেমরসে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছু না বলে ও শুধু মুচকি হাসল।

কমলা—আমার মত ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর কেউ হবে না।

বিরজন—আমার চেয়েও কি বেশী?

কমলাচরণ মাতাল হয়ে উঠেছে। গাঢ়ভাবে বিরজনকে আলিঙ্গন করল।

কিছুদিন পর্যন্ত এই নিয়মই চালু রইল। এরই মধ্যে মনোরঞ্জনের নতুন সামগ্রী হাজির হয়ে গেল। রাধাচরণ একটা সুন্দর ছবির অ্যালবাম বিরজনের কাছে পাঠাল। অ্যালবামে চন্দ্রারও কতগুলো ছবি ছিল। কোনটায় ও বসে শ্যামাকে পড়াচ্ছে। কোনটায় বসে চিঠি লিখছে। পুরুষের পোশাকেও ওর ছবি একটা ছিল। রাধাচরণ ফটো তোলায় বেশ পারদর্শী। এই অ্যালবামটা বিরজনের খুব পছন্দ হয়েছিল। তারপর আর কি? কমলাচরণেরও সখ চাপল ফটো তোলার। ভাবলো—ফটো তোলার অভ্যেস রপ্ত করে আমিও বিরজনের ছবি তুলব।

দাদার কাছে চিঠি লিখে পাঠাল ক্যামেরা আর আনুষঙ্গিক জিনিস-পত্র পাঠিয়ে দেবার জন্যে। ক্যামেরা পেয়ে কমলাচরণ ছবি তোলার

অভ্যেস শুরু করে দিল। বাড়ি থেকে বেরোত স্কুলে যাচ্ছি বলে। কিন্তু মাঝ রাস্তাতেই এক পারসী ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে বসত। তিন চার মাসের পরিশ্রমে আর চেষ্টায় এই কলায় পারদর্শী হয়ে উঠল। কিন্তু বাড়িতে একথা তখন পর্যন্ত কেউই জানত না। কয়েকবার বিরজন জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল—কোথায় থাক আজকাল? ছুটির দিনেও দেখা পাওয়া যায় না? প্রতিবারই কমলাচরণ হ্যাঁ, হুঁ করে কাটিয়ে দিয়েছে।

একদিন কমলাচরণ বাইরে কোথাও গিয়েছিল। বিরজনের মনে হল—দেখি প্রতাপচন্দ্রকে একটা চিঠি লিখে ফেলি। কিন্তু বাক্স খুলে দেখল, তাতে চিঠির কাগজ নেই। মাধবীকে ডেকে বলল—তোর দাদার ডেস্ক থেকে কাগজ নিয়ে আয়। মাধবী কাগজ আনতে গিয়ে দেখল ডেস্কের ওপর একটা ছবির অ্যালবাম খোলা পড়ে আছে। অ্যালবামটা উঠিয়ে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বলল—দিদি দেখ, এই ছবি গুলো ডেস্কের ওপর পেলাম।

বিরজন অ্যালবামটা হাতে নিয়ে প্রথম পাতা ওল্টাতেই বিস্ময়ে থ হয়ে গেল। প্রথম পাতাতে এটা তো তারই ছবি! ও পালঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কপালে অবিন্যস্ত কুন্তল, ঠোঁটে মোহিনী হাসির ঝলক যেন কোন মন মাতাল স্বপ্ন দেখছে। ছবির নীচে লেখা "প্রেম স্বপ্ন"। বিরজন অবাক হল—আমার ছবি ও কেমন করে তোলাল! আর কাকে দিয়েই বা তোলাল! কোন ফটোগ্রাফার কি ভেতরে এসেছিল! না, এমন কেন করবে ও। আশ্চর্যের কি আছে, নিজেই হয়তো তুলেছে। ইদানিং কয়েকমাস খুব পরিশ্রমও করেছে। যদি নিজেই তুলে থাকে তবে খুব প্রশংসনীয় কাজই করেছে। পরের পাতা ওল্টালো। তাতেও ওরই ছবি। ও একটা শাড়ি পরে মাথায় আধ ঘোমটা দিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে। এই ছবির নীচে লেখা—"উদ্যান-ভ্রমণ"। তৃতীয় পাতা ওল্টাতে তাতেও নিজের ছবি পেল। বাগানের মাটিতে বসে ও মালা গাঁথছে। তিনটের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সুন্দর ছবি। কারণ চিত্রকার এতে নিপুণ কুশলতায় প্রাকৃতিক

রঙ ফুটিয়ে তুলেছে। এই ছবির তলায় লেখা ছিল, "মলিন—পুষ্পরাজি"। এবার বিরজনের খেয়াল হল একদিন ও বাগানে বসে যখন মালা গাঁথছিল সেই সময় কমলাচরণ নীল কাঁটার ঝোপ থেকে হাসতে হাসতে বেরোচ্ছিল। নিশ্চয় সেই দিনই এই ছবি তুলেছে! চতুর্থ পাতা উলটিয়ে দেখতে পেল পরম মনোহর এক অপূর্ব দৃশ্য। নির্মল জলে ভরা ঢেউ তোলা এক সরোবর আর তার দুই ধারে যতদূর দৃষ্টি যায় গোলাপের ঝোপ দেখা যাচ্ছে। কোমল গোলাপ ফুলগুলো বাতাসের ঘায়ে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতি সবুজ আকাশ লাল তারায় ভরিয়ে দিয়েছে। কোন ইংরেজী ছবির অনুকরণ বলে মনে হচ্ছিল। এর পর অ্যালবামের বাকী পাতা সব ফাঁকা।

বিরজন নিজের ছবিগুলো আবার দেখল। প্রত্যেক নারী যেমন নিজের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে সেই গর্বভরা আনন্দে ও তন্ময় হয়ে রইল। অ্যালবামটাকে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে দিল। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে কমলাচরণ দেখল অ্যালবামের খোঁজ নেই। হাত থেকে পাখী পালিয়েছে। এই ছবি ওর কয়েক মাসের কঠিন শ্রমের ফসল। ইচ্ছে ছিল এই অ্যালবামটা উপহার দিয়ে ও বিরজনের হৃদয়ে আরো খানিকটা জায়গা করে নেবে। অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ল কমলাচরণ। ভেতরে গিয়ে বিরজনকে জিগগেস করতে ও সোজাসুজি অস্বীকার করল। বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে বন্ধুদের বাড়ি ছুটল যদি ওদের মধ্যে কেউ নিয়ে গিয়ে থাকে এই ভেবে! বন্ধুদের কাছেও ঠাট্টা তামাসা ছাড়া কিছুই মিলল না। অবশেষে ভগ্ন-হৃদয় কমলাচরণ যখন হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরল, সেই সন্ধ্যেবেলা বিরজন ওকে অ্যালবামের হদিশ দিল। এই ভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। প্রেমের ব্যাপারে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা দুজনের মধ্যেই। কিন্তু দুজনের প্রেমের ধরনে তফাৎ ছিল। কমলাচরণ প্রেমের উন্মাদনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল। কিন্তু এর পরিবর্তে বিরজনের প্রেম ছিল কর্তব্যের সীমানায় স্থিত। অবশ্যই এ ছিল আনন্দময় কর্তব্যকর্ম।

তিনটে বছর কেটে গেল। বিরজনের জীবনে এই তিনটি বছর

শুভময় বর্ষ। চতুর্থ বছরে বিপদের সূচনা পর্ব।

কত লোকের জীবনে সংসারের সুখ সামগ্রী এমন পরিমাণে প্রাপ্ত হয় যে প্রত্তিটি দিন হয় হোলির (দোলের) দিন আর প্রতিটি রাত আসে দীপাবলীর রাত হয়ে। আবার কিছু মানুষ এমন হতভাগ্য, যে সুখের দিন তাদের জীবনে বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। বিরজন ছিল এই হতভাগ্যদের দলে'।

বসন্তকাল। হিমেল হাওয়া বইছিল। এমন কড়া শীত পড়েছিল যে ইঁদারার (কুয়োর) জল জমে যাচ্ছিল। শহরে প্লেগের প্রকোপ দেখা দিল। হাজার হাজার মানুষ তার বলি হতে লাগল। একদিন চড়া জ্বর হল, একটু গ্ল্যাণ্ড ফুলল আর রোগী মারা গেল। গ্ল্যাণ্ড ফোলা অর্থ মৃত্যুর পরোয়ানা। ডাক্তার বৈদ্য কারো সাধ্য ছিল না মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। শ'য়ে শ'য়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে রইল। যার যেদিকে উপায় হল পালিয়ে গেল। সকলেরই ঘাড়ে বিপদ। কেউ কারো সাহায্যকারী বা হিতৈষী রইল না। মা, বাবা সন্তানদের ছেড়ে পালাল। মেয়েরা স্বামীদের সঙ্গে সম্পর্ক পরিত্যাগ করল। গলিতে, রাস্তায়, বাড়িতে যেদিকেই তাকান যায় মৃতের ছড়াছড়ি। দোকান পাট সব বন্ধ হল। বাড়িতে বাড়িতে, দরজায় তালামারা। চারিদিকে ধূলোবালি উড়ছে। পথে মানুষের দেখা মেলা ভার। কদাচিৎ যদি বা দেখা মেলে কেউ কোন কাজে বের হলে, তো সে এত দ্রুত চলে যেন মৃত্যুদূত ওর পেছনে ধাওয়া করেছে। সব পাড়া ফাঁকা হয়ে গেল। দিন দুপুরে ঘরের তালা ভাঙা হতে লাগল। আর দিনের আলোতেই ঘরে সিঁধ কাঁটা চলল। সেই নিদারুণ দুঃখের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

বাবু শ্যামাচরণ অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ। বাড়ির চারপাশে পাড়ার পর পাড়া শূন্য হয়ে গেছিল। উনি কিন্তু নির্ভয়ে নিজের বাড়িতে টিঁকে ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তাঁর এই দুর্জয় সাহসও লুপ্ত হতে লাগল। এতে বাড়িতে হুলুস্থুল বেঁধে গেল। গ্রামে যাওয়ার প্রস্তুতি হতে লাগল জোরতার। মুন্সীজী ওই জেলাতেই কয়েকটা গ্রাম কিনে

নিয়েছিলেন আর মাঝগাঁও নামে এক গ্রামে একটা সুন্দর বাড়িও তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল পেন্সন নিয়ে এখানেই থাকবেন। কাশী ছেড়ে আগ্রায় কে মরতে যাবে! গ্রামে যাবার কথা শুনে বিরজন খুব খুশী হল। গ্রাম জীবনের মনোহর দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। সবুজে সবুজে ছাওয়া গাছ। সোনা রং-এর শস্য ক্ষেত। হরিণযূথের ক্রীড়া আর পাখীর কলরব। এই দৃশ্য দেখার জন্য ওর মন লালায়িত হয়ে উঠল। কমলাচরণও শিকার করার জন্য অস্ত্র গোছগাছ করতে লাগল। কিন্তু অকস্মাৎ মুন্সীজী ওকে ডেকে বললেন—প্রয়াগ যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে নাও। ওখানে প্রতাপচন্দ্র তোমাকে সাহায্য করবে। গ্রামে অযথা সময় নষ্ট করে কি লাভ? একথা শুনে কমলাচরণের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। প্রয়াগ যেতে অস্বীকার করায় অনেকক্ষণ ধরে মুন্সীজী ওকে বোঝালেন কিন্তু রাজী হল না কিছুতে। অবশেষে উনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—তোমার ভাগ্যে বিদ্যা লেখা নেই। আমার মূর্খামি যে তার বিরুদ্ধে লড়ছি। এই বলে পুরো ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে দিতে চাইলেন।

বৃজরাণী যখন একথা শুনল, ওর বড় দুঃখ হল। যদিও বুঝতে পারত যে কমলাচরণের পড়ায় মন লাগে না, কিন্তু মাঝে মাঝে ওর এই অরুচি খারাপ লাগত না। সত্যি বলতে কি কখনও কখনও ওর মন চাইত—আজ কমলা স্কুল না গেলেই ভাল। কমলাচরণের প্রেমময় কথা ওর ভাল লাগত। যখন ও জানতে পারল যে কমলাচরণ প্রয়াগ যেতে অস্বীকার করেছে আর লালাজী যাবার জন্যে অনেক করে বোঝাচ্ছেন তখন ওর রাগ দুঃখ হল। কেননা কিছুদিন একলা থাকা ওর সহ্য হবে কিন্তু কমলা বাবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করছে তা ও সহ্য করতে পারবে না কিছুতে। মাধবীকে দিয়ে কমলাচরণকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু নিজের জায়গা থেকে না নড়ার দিব্যি খেয়ে রেখেছিল কমলাচরণ। ও ভেবেছিল ভেতরে গেলেই বিরজন নিশ্চয়ই প্রয়াগ যেতে বলবে। ও কি জানে যে মনের ওপর দিয়ে কমলার কি যাচ্ছে! কথা বলে তো মিষ্টি মিষ্টি। কিন্তু যখন প্রেমের পরীক্ষার সময় আসে

তখন কর্তব্য আর নীতির আড়ালে মুখ লুকোতে থাকে। সত্যিটা এই, যে মেয়েদের মধ্যে সত্য প্রেমের গন্ধটুকুও থাকে না।

অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরেও কমলাচরণ যখন ঘর থেকে বেরোল না বৃজরাণী নিজেই গেল ওর ঘরে। বলল—আজ কি না আসার প্রতিজ্ঞা করেছ! পথ চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে গেল।

কমলা—ভেতরে আসতে ভয় করছে।

বিরজন—আচ্ছা, তাহলে চল আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি, তাহলে আর ভয় পাবে না।

কমলা—আমার প্রয়াগে যাবার হুকুম হয়েছে।

বিরজন—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

এই বলে বিরজন কমলাচরণের দিকে তাকাল। সেই চাহনিতে যেন আঙুরের দানা লেগে আছে। কমলাচরণ হেরে গেল। এই মোহিনী চোখে জল দেখে কার সাধ্য যে নিজের জেদে অটল থাকে। কমলাচরণ ওকে আলিঙ্গন করে বলল—আমি জানতাম তুমি জিতে যাবে। এইজন্যেই ভেতরে আসছিলাম না। সারা রাত ধরে দুজনে প্রেম-বিরহের কথা কইল। বার বার পরস্পরের চোখ মিলল, যেন তারা আর কোনদিন মিলবে না। হায়! কে জানত এই শেষ মিলন! কমলাচরণের সঙ্গে মিলিত হবার সৌভাগ্য বিরজনের আর কোনদিনই হবে না!

১৭

মঝগাঁও

প্রিয়তম,

প্রেমপত্র এল। মাথায় রেখে চোখে ঠেকালাম। এমন চিঠি তুমি আর লিখো না গো! আমি যদি লিখি অসঙ্গত নয়। এখানে চিত্ত অতি ব্যাকুল হচ্ছে। কি শুনেছিলাম আর কি দেখছি! ভাঙাচোরা চালার ঝুপড়ি, মাটির দেওয়াল। বাড়ির সামনে ময়লা আবর্জনার বড় বড়

স্তূপ। কাদায় মাখামাখি মোষ। দুর্বল গরু। এসব দৃশ্য দেখে মন চায় কোথাও চলে যাই। মানুষজনকে দেখ, তাদের অবস্থা এত শোচনীয় যে বলার কথা নয়। হাড় জিরজির করছে। যেন বিপত্তির প্রতিমূর্তি আর দারিদ্র্যের জীবন্ত চিত্র। কারো দেহে একটা আস্ত কাপড় নেই আর কেমন হতভাগ্য যে রাতদিন ঘাম ঝরানোর পরও ভরপেট রুটি মেলে না। আমাদের বাড়ির পেছন দিকে একটা খাল আছে। মাধবী একদিন খেলা করতে করতে পা পিছলে খালের জলে পড়ে গেছিল। এখানে কিংবদন্তী আছে এই খালের জলে পেত্নীরা স্নান করতে আসে। আর ওরা অকারণ পথ চলতি লোকেদের সঙ্গে খুনসুটি করে।

এই রকমই, বাড়ির সামনের দরজার মুখে একটা পিপুলের গাছ আছে। ওটা নাকি মৃতদের আবাস। খালকে তো ভয় নেই। কিন্তু এই পিপুলের আবাসটি সারা গাঁয়ের মনের ওপর এমন প্রভাব বিছিয়ে আছে যে সূর্যাস্ত হতেই রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বাচ্চা আর মেয়েরা তো ওদিক মাড়ায়ই না। হ্যাঁ, একলা দোকলা, পুরুষরা কোন কোন সময় যায় বটে তবে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। এই দুই জায়গা যেন ওই নিকৃষ্ট জীবদের আখড়া। এছাড়াও শত সহস্র ভূত পেত্নীদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নিবাস পাওয়া যায়। পেত্নী এদের চোখে পড়ে। লোকে এদের স্বভাবও জেনে গেছে। বিশেষ কোন ভূতের ব্যাপারে বলা হয় যে, ও ঘাড়ে চাপলে মাসের পর মাস নামে না। আবার কোন ভূত দু-একটা পূজো নিয়েই ছেড়ে দেয়। গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে এসব নিয়ে এমন ধরনের আলাপ আলোচনা হয় যেন এগুলো প্রত্যক্ষ ঘটনা। এতদূর পর্যন্ত শোনা গেছে যে পেত্নীরা লোকালয়ে খাবারদাবারও চাইতে আসে। ওদের পরনের কাপড় প্রায়ই বকের পাখার মত সাদা হয় আর কথা খানিকটা নাকি সুরে বলে। তবে হ্যাঁ গয়নার চলন ওদের মধ্যে কম। যে মেয়েরা সেজেগুজে রঙীন শাড়ি আর গয়না পরে একলা ওদের চোখে পড়ে যায়, সেই সব মেয়েদের ওপর ওরা আক্রমণ চালায়। ফুলের গন্ধে ওদের খুব ভয়। সম্ভব হলে মেয়েরা আর বাচ্চারা নিজেদের পাশে ফুল নিয়ে শোয়।

ভূতেদের মান আর প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে করা হয়েছে। যোগীবাবা মাঝরাতে কালো কম্বল গায়ে জড়িয়ে, খড়ম পায়ে গ্রামের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়ে পথভোলা পথিকদের পথ দেখিয়ে দেন। বছরে একবার ওঁর পূজো হয়। উনি এখন না ভূতেদের মধ্যে না দেবতাদের মধ্যে গণ্য হন। উনি যথাশক্তি কোন আপদ বিপদকে গ্রামের মধ্যে পা রাখতে দেন না। ওঁর বিরুদ্ধবাদী ধোবী বাবাকে গ্রাম সুদ্ধ ভয় করে। যে গাছে উনি বাস করেন কেউ যদি সেখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেয় বা সেদিকে যায় তো তার প্রাণ সংশয়। ওঁকে ভজনা করার জন্যে দুই বোতল মদই যথেষ্ট। ওঁর পূজারী প্রতি মঙ্গলবার ওই গাছতলায় গাঁজা আর চরস রেখে যায়। লালা সাহেবও ভূত হয়ে বসে আছেন। এই মহাশয় জীবদ্দশায় পাটোয়ারী ছিলেন। কয়েক-জন ব্রাহ্মণ প্রজা ওঁকে মেরে ফেলেছিল। ওঁর, কারো ঘাড়ে চাপা এমন ভয়ানক যে প্রাণ না নিয়ে ছাড়েন না। কোন পাটোয়ারীই এখানে এক বছরের বেশী বাঁচে না। গ্রামের থেকে খানিকটা দূরে একটা গাছ আছে। মৌলবী সাহেব তার ওপর বাস করেন। বেচারী কারো পেছনে লাগেন না। তবে হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার করে ওঁর পূজো যদি না পৌঁছয় তাহলে বাচ্চাদের পেছনে লাগেন।

কি ধরনের মূর্খতা! কেমন মিথ্যা ভক্তি! এই সব ধারণা এখান-কার লোকেদের মনের মধ্যে বজ্রের মতো এঁটে গেছে। বাচ্চার অসুখ হলো তো ভূতের পূজো হতে লাগল। খেতে খামারে ভূতের জন্যে ভোগ! যেদিকেই তাকাও শুধু ভূত আর ভূত নজরে পড়ে। এখানে না দেবী আছে, না দেবতা। ভূতদেরই সাম্রাজ্য! যমরাজ এখানে চরণ রাখেন না। ভূতই জীবন হরণ করে। এই সব ধারণা কি ভাবে ঘুচবে? কিম্ অধিকম্।

তোমার

বিরজন।

২

প্রিয়, ময়গাঁও

অনেকদিন বাদে তোমার প্রেমপত্র পাওয়া গেল। সত্যিই কি চিঠি লেখার অবকাশ নেই? চিঠি কি লিখেছ, যেন বেগার ঠেলেছ। তোমার তো এমন অভ্যেস ছিল না? ওখানে কি অন্য রকম হয়ে গেছ? এখান থেকে তোমার যাওয়া দু-মাসের বেশী হল। এর মধ্যে কতগুলো ছোট বড় ছুটি পড়ল, কিন্তু তুমি এলে না। তোমাকে জোড়-হাতে বলছি হোলীর ছুটিতে অবশ্যই এস। যদি এবার কষ্ট দাও তো চিরদিনের জন্য আমার নালিশ থাকবে।

এখানে এসে মনে হয় যেন অন্য কোন জগতে এসে পড়েছি। রাত্রে শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ হা, হা, হু, হু-র কোলাহল শোনা গেল। চমকে উঠে বসলাম। জিগগেস করে জানলাম ছেলেরা বাড়ি বাড়ি থেকে জ্বালানি আর কাঠ জমা করছে। হোলী মায়ের এই হল আহার। এই বিচিত্র উপদ্রব যেখানে পৌঁছল সেখানে জ্বালানির আকাল পড়ে গেল। কারো এমন শক্তি নেই যে এই সেনা বাহিনীকে রুখতে পারে। এক নম্বরের ছাউনি লোপাট হয়ে গেল। ওতে স্বচ্ছন্দে দশ বারটা বলদ বাঁধা যেত। হোলীওয়ালারা কয়েকদিন তক্কে তক্কে ছিল। সুযোগ পেয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেল। এক কুরমীর ঝুপড়ি উপড়ে গেল। কত জ্বালানি উধাও হয়ে গেল। এখন লোকে নিজেদের জ্বালানি কাঠ ঘরের ভেতর রেখে দেয়। লালাজী জ্বালানির জন্যে একটা গাছ কিনে রেখেছিলেন। আজ রাত্রে ওটাও হোলী মায়ের পেটে চলে গেছে। দু-তিনটে বাড়ির দরজা উপড়ে গেল। পাটোয়ারী সাহেব দরজার কাছে শুয়ে ছিলেন। ওকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে খাটিয়াটা নিয়ে পালাল। চারিদিকে জ্বালানির লুঠ শুরু হয়ে গেছে। যা একবার হোলী মায়ের মুখে চলে যায় তাকে ফিরিয়ে আনা মহা পাপ। পাটোয়ারী সাহেব খুব ধমক দিলেন—আমি জমা বন্দী নষ্ট করে দেব, খসড়া মিথ্যে করে দেব। কিন্তু কোন ফল হল না। এখান-কার প্রথাই হল যে এই সময় হোলীওয়ালারা যা পারে নির্বিঘ্নে

উঠিয়ে নিয়ে যায়। রুখবে কাকে? সব যুবক ছেলেরা নিজের বাপের চোখ বাঁচিয়ে নিজেরই জিনিস উঠিয়ে নেওয়াচ্ছে। যদি এরকম না করে তবে নিজের দলে অপমানিত হতে হবে।

ফসল পেকে গেছে। তবে কাটতে এখনও দুই সপ্তাহ দেরী আছে। আমার ঘরের দরজা থেকে মাইলের পর মাইল দেখা যায়। গম আর যবের পাকা খেতের ধারে ধারে লাল আর সাদা রঙের ফুলের সারি ভারী সুন্দর লাগে। তোতা পাখীর ঝাঁক চারিদিকে ঘুরে ঘুরে ফেরে।

মাধবী এখানে কয়েকজন বন্ধু বানিয়ে ফেলেছে। পাশে এক আহীর থাকে। নাম রাধা। রাধার মা গত বছর প্লেগের গ্রাস হয়েছে। বাড়ির পুরো ভার ওরই ওপর। ওর বৌ তুলসা (তুলসী) প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে। পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত সৌন্দর্যে ভরা। এত সরল যে ইচ্ছে করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওর কথা শুনি। মাধবী ওর সঙ্গে বোন পাতিয়েছে। কাল ওদের পুতুলের বিয়ে। তুলসার মেয়ে (পুতুল) আর মাধবীর ছেলে (পুতুল)। শুনেছি ওরা বড় গরীব। আমি কিন্তু কখনও ওর মুখ ভার হতে দেখিনি। বলছিল, জ্বালানী বেচে যে, টাকা জমিয়েছে তার এক টাকা যৌতুক দেবে আর এক টাকায় বরযাত্রীদের খাওয়াবে। মেয়ের কাপড় গয়নার ভার রাধার ওপর। কেমন সরল, তৃপ্তির জীবন।

নাও, এখন বিদায় নিচ্ছি। আবোলতাবোল কথায় তোমার অযথা সময় নষ্ট হল। ক্ষমা করবে না! তোমাকে চিঠি লিখতে বসলে আমি কলম থামাতে পারি না। এখনও অনেক কথা লেখার বাকী থেকে গেল। প্রতাপচন্দ্রকে আমার নমস্কার জানিও।

তোমার

বিরজন।

মঝগাঁও

প্রিয়,

তোমার প্রেম পত্রিকা পেয়েছি। বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বাঃ! চোরের মায়ের বড় গলা! নিজের, না আমার দোষই আমার মাথায় দিচ্ছ? আমার মনকে কেউ জিগগেস করুক তো তোমার দর্শনের জন্যে আমার কত অভিলাষ? এখন এই অভিলাষ দিন দিন ব্যাকুলতার রূপ পরিগ্রহ করছে। কিছুদিন থেকেই আমার এই অবস্থা হচ্ছে। যখন এখান থেকে গেলে, আমার ধারণা ছিল না যে ওখানে গিয়ে আমাকে এমন অবহেলা করবে। যাক, তুমিই সত্যি (বলছ) আর আমি মিথ্যে (বলছি)। খুব ভাল লাগছে যে, আমার দুটো চিঠিই তোমার ভাল লেগেছে। কিন্তু অযথাই প্রতাপচন্দ্রকে দেখিয়েছ। অসাবধানে লেখা হয়েছে। সম্ভবত ভুল-ভ্রান্তি থেকে গেছে। আমার বিশ্বাস হয় না যে প্রতাপ ওগুলোকে মূল্যবান মনে করেছে। যদি ও আমার চিঠিগুলোকে এত মূল্যবান মনে করে যে, ওগুলোর সাহায্যে ও গ্রাম্য জীবনের ওপর ভাল রচনা লিখতে পারে, তাহলে নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করব।

কাল এখানে দেবীর পুজো ছিল। উনুন জ্বলেনি, হাল, যাঁতা, জল তোলা চাকা সব বন্ধ ছিল। দেবীর এই রকমই আদেশ। ওঁর আদেশ কে লঙ্ঘন করবে? তাহলে ধোপা, নাপিত বন্ধ হয়ে যাবে। বছরের এই একটা দিন, গ্রামের লোকেরাও যাকে ছুটি বলে মনে করে। এমনিতে হোলী, দীপাবলীতেও দৈনন্দিনের দরকারী কাজগুলো বন্ধ করতে পারে না। পাঁঠা বলি হল, যজ্ঞ হল। ছাতু খাওয়ান হল। এখন বাচ্চাদেরও পূর্ণ বিশ্বাস যে এখানে প্লেগের আগমন ঘটতে পারবে না। এরা তামাশা দেখেই সব ঘুমিয়েছিল। প্রায় রাত বারোটার সময় হবে, শয়ে শয়ে মানুষ মশাল হাতে নিয়ে সারা গ্রামে ঘুরল। এর অর্থ হল যে এই এলাকার মধ্যে অসুখ পা রাখতে পারবে না। ঘোরা শেষ হলে কয়েকজন অন্য গ্রামের এলাকায় ঢুকে

কিছু ফুল, পান, লবঙ্গ ইত্যাদি জিনিস মাটির ওপর রেখে এল। অর্থাৎ নিজের গ্রামের বিপদ অন্য গ্রামে ফেলে আসল। যখন এরা নিজেদের কাজ সেরে ওখান থেকে রওনা হল তো ওই গ্রামের লোকের সাড়া পাওয়া গেল। শয়ে শয়ে লোক লাঠি নিয়ে এ গাঁয়ের লোকেদের পিছু ধাওয়া করল। দুই পক্ষে খুব মারপিট হল। গাঁয়ের কিছু লোক এতে জখম হয়ে পড়ে রইল।

আজ সকালে বাকী নিয়মগুলো, যাকে চড়াই বলে, পালন করা হল। আমাদের সদর দরজায় একটা উনুন খোঁড়া হল। আর তার ওপরে রাখা হল দুধে ভরা একটা কড়াই। কাশী নামে একজন ভর(*) আছে, ও সারা শরীরে যজ্ঞের ছাই মেখে এল। গ্রামের লোক মাচার (চটের) ওপর বসল। শঙ্খ বাজতে লাগল। কড়াইয়ের চারদিকে মালা ফুল বিছিয়ে দেওয়া হল। কড়াইয়ের দুধ যখন খুব ফুটে উঠল, কাশী দাঁড়িয়ে পড়ে 'জয় মা কালী' বলে কড়াইয়ে ঝাঁপ দিল। আমি তো ভাবলাম ও আর জ্যান্ত উঠল না। কিন্তু মিনিট পাঁচেক বাদে কাশী আবার লাফ দিল। আর কড়াইয়ের বাইরে উপস্থিত! আশ্চর্য! ওর একটা চুলও বেঁকে যায়নি! লোকে ওকে মালা পরাল। ওরা হাত জোড় করে ওকে জিগগেস করতে লাগল—মহারাজ। এ বছর খেতে ফসল কেমন হবে? বৃষ্টি কেমন হবে? অসুখ বিসুখ হবে কি না? গ্রামের লোক ভাল থাকবে তো? গুড়ের দর কেমন যাবে? এই সব নানান প্রশ্ন। কাশী সব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে কিন্তু কিছুটা রহস্যপূর্ণ ভাষায় দিল। এরপর সভা ভাঙ্গল। শুনলাম প্রতি বছরই এমন ক্রিয়া কাণ্ড হয়। কাশীর সব ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি বলে সিদ্ধ হয়। আর যদি এক আধটা মিথ্যে হয়েও যায় তো কাশী তার সমাধান যোগ্যতার সঙ্গে করে দেয়। কাশী খুব উঁচু স্তরের মানুষ। গ্রামের কোথাও চুরি হলে কাশী তার সন্ধান বলে দেয়। যে কাজ পুলিস গোয়েন্দারা পুরো করতে পারে না ও সে কাজ পুরো করে দেয়। যদিও জাতিতে ও ভর, তবুও গ্রামে ওর খুব খাতির। এদের সব ভক্তির পুরস্কার হিসেবে ও

* এই অঞ্চলের এক অন্ত্যজ জাতি—অনুবাদক।

মদের অতিরিক্ত আর কিছুই নেয় না। নাম বের করতে চাও তো ওকে এক বোতল মদ প্রণামী দিতে হবে। তোমার মামলা আদালতে উঠেছে, কাশী জিৎ-এর জন্য ক্রিয়াকর্ম করছে। ব্যস্ ওকে শুধু তুমি এক বোতল লাল জল দিলেই যথেষ্ট।

হোলীর দিন এখন কাছেই। এক সপ্তাহের বেশী নয়। আঃ! আমার এখন কেমন উত্তেজনা হচ্ছে। মনে আনন্দের হিল্লোল উঠছে। তোমাকে দেখার জন্যে চোখ আকুল হচ্ছে। এ সপ্তাহ বড় কষ্টে কাটবে। তারপর আমি আমার পিয়ার (প্রিয়ের) দর্শন পাব।

তোমার

বিরজন।

৪

মঝগাঁও

প্রিয়,

তুমি পাষাণ-হৃদয়, স্নেহহীন, নির্দয়, অকরুণ আর মিথ্যেবাদী! আমি তোমাকে আর কি গাল দেব। বলবই বা কি? যদি তুমি এখন আমার সামনে হতে তো এই বজ্রহৃদয়তার পাল্টা উত্তর দিতাম। আমি বলছি, তুমি দাগাবাজ। আমার করবেটা কি? না আসতে চাও তো এস না। আমার প্রাণ নিয়ে নিতে চাও তো নিয়ে নাও। কাঁদানর ইচ্ছে কাঁদাও। কিন্তু আমি কেন কাঁদব? আমার বালাই কাঁদুক। যখন তোমার এটুকু খেয়াল নেই যে, দু ঘন্টার যাত্রা ওর একটু খবর নিয়ে আসি, তখন আমার কি দায় পড়েছে যে কাঁদব আর প্রাণ খোয়াব?

এমন রাগ হচ্ছে যে চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিই, আর আবার তোমার সঙ্গে কথা না বলি। হায়! তুমি আমার ইচ্ছেকে কেমন ধুলোয় মিশিয়ে দিলে! হোলী! হোলী! কারো মুখ থেকে এই শব্দ বেরোল কি আমার হৃদয়ে হিল্লোল উঠতে লাগল। কিন্তু হায়, হোলী কেটে গেল আর আমি হতাশ হয়ে পড়ে রইলাম। আগে এ শব্দ শুনে

আনন্দ হ'ত। এখন শুধু দুঃখ হচ্ছে। যার যা কপাল! গাঁয়ে গরীব-গুবরোও না খেয়ে না পরে ফাগ খেলল আনন্দ করল, রঙ্ ওড়ালো আর আমি হতভাগিনী নিজের চারপেয়েতেই সাদা শাড়ি পরে পড়ে আছি। দিব্যি রইল যদি তাতে একছিটেও লাল রঙ্ পড়ে থাকে। দিব্যি রইল, যদি আবীর গুলাল ছুঁয়েও থাকি। আমার আতর মাখান আবীর, কেওড়া গোলা গুলাল, যত্নে সাজা পান সব তোমার নিষ্ঠুরতায় কাঁদছে। মাধবী যখন খুব জেদ করল তখন একটা শুধু লাল টিপ লাগিয়েছিলাম। কিন্তু আজ থেকে এই সব দোষারোপের অন্ত (শেষ) হচ্ছে। যদি আবার কোন দোষারোপের শব্দ মুখ দিয়ে বেরোয় তাহলে আমার জিভ কেটে নেব।

পরশু সন্ধ্যে থেকেই গ্রামে হুল্লোড় পড়ে গেছে। তরুণদের একটা দল হাতে বড় খঞ্জনী নিয়ে অশ্লীল কথা বলতে বলতে দরজায় দরজায় ঘুরতে লেগেছে। আমি জানতাম না যে আজ এখানে এত গালাগালি খেতে হয়। লজ্জাহীন কথা ওদের মুখ দিয়ে এমন বেধড়ক বের হচ্ছিল যেন ঝরঝর করে ফুল ঝরে পড়ছে। লজ্জা সঙ্কোচের নাম গন্ধ নেই। বাপ ছেলের সামনে আর ছেলে বাপের সামনে গালাগাল দিচ্ছে। বাপ হুঙ্কার দিয়ে ছেলের বৌকে বলছে,—আজ হোলী! বউ ঘরে মাথা নীচু করে শুনছে আর হেসে মরছে। আমাদের পাটোয়ারী সাহেব তো দেখা গেল একেবারে মহাপুরুষ। নিজে মদে চুর, মাথায় একটা ময়লা মতো টুপি পরে এই দলের নায়ক হয়েছিলেন। ওঁর মেয়ে বউরাও ওঁর অশ্লীলতার তোড়ের হাত থেকে রেহাই পায়নি। গাল খাও আর হাস। মুখ যদি একটু ভার হয় তাহলে লোকে ভাববে এর মহরমের দিন জন্ম। ভাল প্রথা যাহোক!

রাত প্রায় তিনটের সময় দলটা হোলী মায়ের কাছে পৌঁছল। ছেলেরা আগুনের খেলায় মেতে ছিল। আমিও কয়েকজন স্ত্রীলোকের কাছে গেলাম, ওখানে মেয়েরা হোলীর গান গাইছিল। শেষে হোলীতে আগুন লাগাবার সময় এল। আগুন জ্বালা মাত্র দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আর সারা আকাশটা সোনার বর্ণ ধারণ করল। দূর দূর পর্যন্ত

গাছপালাগুলোয় আগুনের আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল। এবার আগুনের কুণ্ডের চারিদিকে ছেলেরা "হোলী মাতার জয়" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়তে লাগল। সকলের হাতে গম আর যবের শীষ (ছড়া), সেগুলো ওরা আগুনে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল।

আগুন যখন খুব তেতে উঠল, তখন সবাই এক কোণে দাঁড়িয়ে 'কবীর' বলতে শুরু করল। ছ' ঘণ্টা ধরে এই রকম চলল; কাঠের কুঁদো থেকে চিট-পিট, চিট-পিট শব্দ বের হচ্ছিল। পশুগুলো খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় চিৎকার করছিল। তুলসা আমাকে বলল—এবার হোলীর আগুন বাঁকা হয়ে উঠছে, ভাল নয়। আগুন যেবার সিধে ওঠে গ্রামে আনন্দের সুর বাজে। কিন্তু আগুনের বাঁকা হওয়া অশুভ। অবশেষে আগুনের শিখা ক্রমশ কম হতে লাগল। আঁচের তেজ মন্দ হল। তখন লোকে আগুনের কাছে এসে মন দিয়ে দেখতে লাগল। যেন কোন জিনিস খুঁজছে। তুলসা জানাল যে যখন বসন্তের দিন হোলীর ভিত তৈরী হয় তখন প্রথমে একটা এরণ্ড (ভ্যারেণ্ডা) গাছ পুঁতে দেয়। তারই ওপর কাঠ আর জ্বালানি স্তূপ করা হয়। এখন লোকে সেই এরণ্ড (ভ্যারেণ্ডা) গাছটাকে খুঁজছে। সবার আগে যে লোক ওই গাছটাকে আগুনের মধ্য থেকে খুঁজে বার করে এমনভাবে ছুঁড়বে যে যাতে ওটা ভেঙে দূরে গিয়ে পড়ে, তাকে বীর বলে গণ্য করা হবে। প্রথমে পাটোয়ারী সাহেব পাঁয়তারা কষতে কষতে এলেন কিন্তু দশ গজ দূর থেকে উঁকি মেরে চলে গেলেন। তারপর রাধা হাতে একটা ছোট মত লাঠি নিয়ে সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে এল আর আগুনের মধ্যে ঢুকে পুরোপুরি এমনভাবে হাত চালাল যাতে করে গাছটা দূরে গিয়ে পড়ল। লোকে ওটার খণ্ডগুলোকে লুটে নিতে লাগল। ওটার তিলক লাগাল লোকে শুভ (বস্তু) বলে মনে করে।

ওখানের কাজ সেরে পুরুষরা দেবীমার থানের দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু এমন ভেব না যে ওখানে দেবীজীকে ভক্তি জানান হবে। আজকের দিনে উনিও গালাগালি শুনতে পছন্দ করেন। ছোটবড়

সবাই ওঁকে অশ্লীল গালাগাল শোনাচ্ছিল। কয়েক দিন আগেই কিন্তু ভক্তিভরে এই দেবীজীর পূজো করেছিল ওরা। সত্যি এই যে এখন ঈশ্বরকেও গালাগাল দেওয়া ক্ষমার যোগ্য। মা-বোন তো হিসেবের মধ্যেই পড়ে না।

সকাল হতেই লালাজী মহারাজকে (রাঁধুনে বামুন) বলল—আজ সের দুই ভাঙ্ পিষিয়ে (বাটিয়ে) নাও। দু রকমের আলাদা আলাদা বানাও। নোন্‌তা আর মিষ্টি। মহারাজ বেরিয়ে কয়েকজন লোককে ধরে নিয়ে এল। ভাঙ্ পেশা হতে লাগল। অনেকগুলো পাত্র আনিয়ে সার দিয়ে রাখা হল। দুটো ঘড়ায় দু রকমের ভাঙ্। এরপর আর কি! ঘণ্টা তিন চারেক ধরে মাতালদের লাইন পড়ে গেল। লোকে খুব তারিফ করতে করতে ঘাড় নেড়ে নেড়ে মহারাজের কুশলতার প্রশংসা করছিল। যেই কেউ তারিফ করে অমনি মহারাজ দ্বিতীয় পাত্র ভরে বলছিল এটা নোন্‌তা। এটার স্বাদও চেখে দেখ। আরে, খেয়ে তো নাও। রোজ কি আর হোলী আসবে না আমার হাতের মাল পাবে? এর জবাবে এক কিষান এমন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যেন ওকে কেউ সঞ্জীবনী সুধা দিয়েছে। আর একটার জায়গায় তিন তিনটে পাত্র নিঃশেষ করে দিয়েছিল। পাটোয়ারীর জামাতা মুন্সী জগদম্বাপ্রসাদের শুভাগমন ঘটল। উনি কাছারীর আর্জি পেশকার। ওকে মহারাজ এত খাইয়েছল যে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে নর্তন কুর্দন করতে লাগলেন। সারা গ্রাম ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত। এক কিষান ওঁর দিকে চেয়ে হেসে বলল—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ, বাড়ি গিয়ে খাবার তৈরী কর, আমি আসছি। এই কথায় খুব জোর হাসাহাসি হচ্ছিল। কাশী ভর মদে মাতাল হয়ে লাঠি কাঁধে এসে জমায়েতের লোকেদের দিকে কপট রাগে তাকিয়ে গর্জে উঠল—মহারাজ ভাল নয় যে তুমি আমার বৌ-এর মজা লুটছ। এই বলে মুন্সীজীকে আলিঙ্গন করল।

মুন্সীজী বেচারী ছোটখাট চেহারার মানুষ, এদিক ওদিক ছটফট্ করছিলেন। কিন্তু নহবৎখানায় তোতার আওয়াজ কে শোনে? কেউ খাতির করছিল কেউ বা কণ্ঠলগ্ন করছিল। দুপুর পর্যন্ত এইসব রঙ্ ঢঙ্

চলল। তুলসা তখনও বসেছিল। আমি ওকে বললাম আজ আমাদের এখানে তোর নেমন্তন্ন। তুই আমি একসঙ্গে খাব। একথা শুনেই রাঁধুনী ছুটো থালায় খাবার বেড়ে আনল। তুলসা এই সময় জানলার দিকে মুখ করে বসে ছিল। আমি ওর হাত ধরে টানতেই দেখতে পেলাম ওর সুন্দর চোখ ছুটোতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পড় পড় অবস্থায় রয়েছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম—সই, সত্যি করে বল তো কেন কাঁদছিস্? আমার সঙ্গে দূরত্ব রাখিস না। এতে ও আরও ফোঁপাতে লাগল। খুব জেদ ধরতে, মাথা নীচু করে বলল—দিদি, ওকে আজ সকালে ধরে নিয়ে গেছে। না জানি ওর এখন কি দশা করছে। আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে লাগল তুলসা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে রাধার বাবা কিছু ধার নিয়েছিল। সেটা এখনও শুধতে পারেনি। মহাজন ভেবেছিল বাবাকে হাজতে পুরে দিলে টাকা উসুল হয়ে যাবে। রাধা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আজ বিপক্ষের লোকেদের সুযোগ মিলতেই ওরা কাজ হাঁসিল করেছে। হায়! মূল ধার কুড়ি টাকার বেশী ছিল না। আগে যদি জানতে পারতাম তো আজকের এই উৎসবের দিনে বেচারীর মাথার ওপর এই বিপদের বোঝা আসতে পারত না। চুপি চুপি মহারাজকে ডাকিয়ে আনিয়ে ওকে কুড়ি টাকা দিয়ে রাধাকে ছাড়াতে পাঠালাম। আমাদের সদর দরজায় একটা চট বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লালাজী মাঝখানে সতরঞ্চীর ওপর বসে ছিলেন। কিষানেরা হাঁটু পর্যন্ত ধুতি পরে, কেউ জামা গায়ে কেউ খালি গায়ে, কেউ মাথায় পাগড়ী বেঁধে কেউবা খালি মাথায়, মুখে আবীর মেখে সব আসতে লাগল। ওদের কালো রঙের ওপর আবীর রঙ্ বিশেষ জেল্লা দিচ্ছিল, ওরা একে একে সব লালাজীর পায়ে অল্প করে আবীর দিচ্ছিল। লালাজী ওঁর পরাত থেকে চিমটি ভরে আবীর নিয়ে প্রত্যেকের মাথায় লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। আর হেসে কোন একটা হাসি-ঠাট্টার কথা বলছিলেন। এতেই আগত কিষানটি কৃতার্থ বোধ করছিল আর সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে প্রসন্ন চিত্তে গিয়ে চটের উপর বসছিল, যেন কোন বহুমূল্য রত্নরাজি লাভ করেছে। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে লালাজী

এই মূর্খ দেহাতী (গ্রাম্য) লোকগুলোর সঙ্গে বসে এমন উৎফুল্ল হয়ে আলাপাচার করতে পারেন। এরই মধ্যে কাশী ভর এল। ওর হাতে একটা ছোট বাটি। বাটির মধ্যে আবীর ছিল। ও কিন্তু অন্যদের মত লালাজীর পায়ে আবীর দিল না। বরং বেশ সাহস ভরে একমুঠো আবীর নিয়ে লালাজীর মুখে বেশ করে মাখিয়ে দিল। আমি তো রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম। এই না লালাজী আবার রাগ করে বসেন। কিন্তু দেখলাম উনি খুব খুশী হয়ে ওর কপালে আবীরের ফোঁটা পরানোর বদলে সারা মুখে আচ্ছা করে মাখিয়ে দিলেন। কাশীর সঙ্গী ওর দিকে এমন চোখে চাইছিল যে নিঃসন্দেহে ও বীর আর ওদের নেতা হবার যোগ্য। এই ভাবে দু-আড়াইশ লোক এক এক করে ওঁর সঙ্গে মিলিত হল। হঠাৎ উনি বললেন—আজ রাধাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কি ব্যাপার ? কেউ ওর বাড়ি গিয়ে দেখ তো। মুন্সী জগদম্বাপ্রসাদ নিজের যোগ্যতা জাহির করার ভাল মওকা দেখে বলে উঠল—হুজুর ও দফা ১৩ নং আলিফ এ্যাক্ট-এ গ্রেফতার হয়ে গেছে। রামদীন পাণ্ডে ওয়ারেণ্ট জারী করে দিয়েছে। হরির ইচ্ছেয় রামাদীনও এখানে বসেছিল। লালাজী ওর দিকে ভৎসনা ভরে তাকিয়ে বললেন—কি পাণ্ডেজী, এই গরীবকে গারদে বন্দী করে তোমার কি ঘর ভরে যাবে ? মনুষ্যত্ব আর শিষ্টতা কিন্তু এখনও থেকে গেছে। তোমার একটুও কি দয়া হল না, আজ হোলীর দিন ওকে স্ত্রী আর সন্তানদের থেকে আলাদা করলে ? সত্যি বলছি, আমি যদি রাধা হতাম তবে জেলখানা থেকে ফিরে এসে আমার প্রথম চেষ্টা হত, যে আমাকে এই দিন দেখিয়েছে তাকে কিছুদিন আদা-জল খাওয়ানো। তোমার লজ্জা করছে না, এতবড় মহাজন হয়ে মাত্র কুড়িটা টাকার জন্যে একটা গরীব মানুষকে এমন কষ্টের মধ্যে ফেললে ? এই অতিরিক্ত লোভের জন্যে তোমার ডুবে মরা উচিত। বস্তুত লালাজীর রাগ হয়ে গেছিল। রামদীন এমন লজ্জা পেয়েছিল যে কথা ভুলে গেছিল, মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরুচ্ছিল না, শেষে চুপ করে আদালতের দিকে চলল। সমবেত সব কৃষক আগুন চোখে ওর দিকে দেখছিল। লালাজীর উপস্থিতির

ভর, নইলে পাণ্ডেজীর হাড়-মাংস ওখানেই চুর চুর হয়ে যেত।

এরপর সবাই গান ধরল। মদে মাতাল হয়ে এমনিতেই তো সব গান করে, তার ওপর লালাজীর এই ভ্রাতৃভাব-এর সম্মানে ওদের মন আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল। খুব প্রাণ ঢেলে গাইল সবাই। বড় বড় খঞ্জনীগুলো এত জোরে জোরে বাজছিল, এই ভাঙে কি সেই ভাঙে। জগদম্বাপ্রসাদ দ্বিতীয় বার নেশা করেছিল। কিছু উল্লাস ওর মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়েই ছিল, সেই সঙ্গে অন্যরা উত্তেজিত করার ফলে দ্বিগুণ উল্লাসে উনি সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। বিশ্বাস কর সত্যিই নাচছিল। আমি কখনো আচ্‌কান, টুপি, ধুতী পরা আর গোঁফওলা পুরুষ মানুষকে নাচতে দেখিনি। আধঘন্টা ধরে উনি বাঁদরের মতো লাফাতে থাকলেন। শেষে মদের নেশা ওকে মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর এক আহীর উঠল, এক আহীরণীও জমায়েত থেকে বেরোল। আর দুজনে উঠানে গিয়ে নাচতে লাগল। দুজনেই উচ্ছল তরুণ-তরুণী। ওদের কোমর আর পিঠে বিলক্ষণ নমনীয়তা ছিল। ওদের হাবভাব, কোমরের কমনীয়তা, প্রতিটি অঙ্গের কম্পন, গ্রীবার ভঙ্গি আর দেহের হিল্লোল দেখে বিস্ময় জাগছিল। এ অনেক অভ্যাস আর পরিশ্রমের কাজ।

এখানে যখন নাচ হচ্ছিল সেই সময় সামনে অনেক লোককে লম্বা লম্বা লাঠি কাঁধে নিয়ে আসতে দেখা গেল। ওদের সঙ্গে বড় বড় খঞ্জনীও ছিল। কিছু লোক হাতে ঝাঁঝর আর মঞ্জিরা নিয়েছিল। ওরা গাইতে গাইতে বাজাতে বাজাতে এসে আমাদের দরজায় থামল। হঠাৎ তিনচারজন মিলে এমন আকাশ ফাটানো শব্দে "অররর··· কবীর···" এর ধ্বনি করল যে ঘর কেঁপে উঠল। লালাজী বেরিয়ে এলেন। ওরা সেই গ্রামের লোক যেখানে নিকাশীর দিন লাঠি চলেছিল। লালাজীকে দেখা মাত্রই কয়েকজন ওঁর মুখে আবীর মাখাল। লালাজীও উত্তর দিলেন। পরে সবাই চটের ওপর বসল। এলাচ আর পান দিয়ে ওদের খাতির করা হল। আবার গান শুরু হল। এই গ্রামের লোকেরা ওদের আবীর মাখাল। ওরাও এদের

মাখাল। আগত লোকেরা চলে যেতে যেতে এই গানটা গাইছিল-

"সদা আনন্দ্ রহে এহি দ্বারে, মোহন খেলে হোরী—"

(সর্বদা আনন্দ পাশে পাশে থাকুক,

এই দ্বারে মোহন খেলিছে হোলী)

কি অপূর্ব গান! গানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাব আর রসে ভরে আছে বলে আমার মনে হয়। হোলীর ভাব কেমন সহজ আর সংক্ষিপ্ত শব্দে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই অপূর্ব সংগীত আমি বার বার গাই আর আনন্দ লুটে নিই। হোলীর উৎসব পরস্পরের মধ্যে প্রেম আর মৈত্রীর বন্ধন বাড়ানোর উৎসব। নইলে যাদের ওপর বেধড়ক লাঠি চালিয়েছিল যারা মাত্র কয়েকদিন আগে তারাই তাদের গ্রামে সরাসরি গান করতে করতে চলে আসে। এ হোলীর দিন বলেই সম্ভব হল। আজ কারো হিংসা নেই কারো ওপর। আজ প্রেম আর আনন্দের স্বরাজ। আজকের দিনে কেউ যদি দুঃখী থাকে তো সে কেবল পরদেশী প্রিয়তমের বিহনে। কাঁদে যদি কেউ তো সে যুবতী-বিধবা। এদের ছাড়া আজ সকলের জন্য আনন্দের সানন্দ অভিনন্দন।

সন্ধ্যের সময় আমাদের এখানে গ্রামের মেয়েরা হোলী খেলতে এলেন। মা ওঁদের খুব যত্ন আত্তি করে বসালেন। রঙ্ খেললেন। পান বিলি করলেন। আমি ভয়ে বাইরে আসিনি। এভাবেই ছাড় পাওয়া গেল। হঠাৎ খেয়াল হল দুপুর থেকে মাধবী গায়েব হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় গ্রামে হোলী খেলতে গেছে। কিন্তু এই মেয়েদের সঙ্গে ও ছিল না। তুলসা তখনও জানালার দিকে মুখ করে চুপচাপ বসেছিল। প্রদীপ জ্বালা হচ্ছিল। হঠাৎ ও উঠে পড়ল। তারপর আমার পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি জানালা দিয়ে তাকাতে দেখি কি, আগে আগে মহারাজ, ওর পেছনে রাধা আর সবার শেষে রামাদীন পাণ্ডে এগিয়ে আসছে। গ্রামের অনেক লোক ওদের সঙ্গে আসছে। লালাজী যেই শুনলেন যে রাধা চলে এসেছে উনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে খুব স্নেহ ভরে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক যেমন নিজের ছেলেকে কেউ বুকে জড়িয়ে ধরে। রাধা চিৎকার

করে কাঁদতে লাগল। তুলসাও আর থাকতে পারছিল না। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে লালাজীর পায়ে পড়ল। লালাজী ওকে স্নেহ ভরে ওঠালেন। আমার চোখেও এই সময় জল এসে গেছিল। গ্রামের অনেকেই কাঁদছিল। বড় করুণ সে দৃশ্য। লালাজীর চোখে কখনও জল দেখিনি। এসময়ে তাও দেখলাম। রামাদীন পাণ্ডে মাথা নীচু করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, যেন গো হত্যা করেছে। ও বলল— আমার টাকা পেয়ে গেছি। কিন্তু ইচ্ছে হচ্ছে এই টাকাটা দিয়ে তুলসার জন্য একটা গরু কিনে দিই।

রাধা আর তুলসা নিজেদের বাড়ি চলে গেল। কিন্তু একটু বাদে তুলসা মাধবীর হাত পাকড়ে হাসতে হাসতে আমার ঘরে এসে বলল— একে জিগগেস করো এতক্ষণ কোথায় ছিল।

আমি—কোথায় ছিলি? দুপুর থেকে একেবারে গায়েব?

মাধবী—এখানেই তো ছিলাম

আমি—এখানে কোথায় ছিলি? আমি তো তোকে দুপুর থেকে দেখিনি! সত্যি কথা বল, রাগ করব না।

মাধবী—তুলসার বাড়িতেই তো গেছিলাম।

আমি—তুলসা তো এখানে ছিল। ওখানে একা কি ঘুমিয়ে ছিলি?

তুলসা—(হেসে) ঘুমোবে কেন, জেগে ছিল। খাবার তৈরী করছিল, বাসন মাজছিল, ঘরের কাজ করছিল।

মাধবী—হ্যাঁ, ঘরের কাজ করছিল, বাসন মাজছিল! কেউ তোমার চাকর না!

জানতে পারলাম, আমি যখন রাধাকে ছাড়াতে মহারাজকে পাঠিয়েছিলাম, তখন থেকে মাধবী তুলসার বাড়িতে খাবার তৈরী করতে মগ্ন ছিল, ওর দরজা খুলে ওখান থেকে ঘি আটা চিনি সব নিয়ে যায়। তারপর উনুন ধরিয়ে পুরী কচুরী, গুলগুল আর মিষ্টি সিঙ্গাড়া তৈরী করে। ও ভেবেছিল এগুলো তৈরী করে চুপিচুপি চলে যাবে। যখন রাধা আর তুলসা বাড়ি আসবে তো অবাক হয়ে যাবে।

যে কে এসব তৈরী করে রেখে গেল। কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছিল আর অপরাধীও ধরা পড়ল। দেখ কেমন লক্ষ্মী মেয়ে।

এখন বিদায় নিচ্ছি। অপরাধ ক্ষমা কোর। তোমার দাসী আমি। যেমন রাখবে তেমনই থাকব। এই আবীর আর গুলাল পাঠাচ্ছি। এ তোমার দাসীর উপহার। তোমাকে আমার দিব্যি, মিথ্যে সভ্যতার উত্তেজনায় এগুলো ফেলে দিও না, তাহলে আমার হৃদয় দুঃখী হবে।

তোমার

বিরজন

৫

মঝগাঁও

প্রিয়,

তোমার চিঠি অনেক কাঁদাল। এবার আর থাকা যাচ্ছে না। আমাকে ডেকে নাও। একবার দেখেই চলে আসব। সত্যি করে বলো, যদি আমি তোমার ওখানে যাই, তাহলে ঠাট্টা করবে না তো? না জানি কি মনে করবে। কিন্তু কেমন করে যাব? তুমি লালাজীকে লেখ। খুব যাহোক! বলবেন এ এক নতুন সুর ধরেছে।

কাল পালঙ্কে শুয়ে আছি, ভোর হয়ে গেছিল। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। এমন সময় মেয়েদের গানের সুর শোনা গেল। মেয়েরা ক্ষেতে ফসল কাটতে যাচ্ছিল। উঁকি মেরে দেখলাম দশ দশ কি বারোজন করে মেয়েদের এক একটা দল। সকলের হাতে কাস্তে। কাঁধে বোঝা বাঁধার দড়ি আর মাথায় ভাজা মটরের ছড়া, ওরা এই সময় যায় আর প্রায় বারোটা নাগাদ ফিরবে। নিজেরা নিজেরা গান গাইতে গাইতে হাসি ঠাট্টা করতে করতে চলেছিল। হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। ঝাঁঝি এল। শিল পড়তে লাগল। এত বড় বড় শিল পড়তে আমি কখনো দেখিনি। আলুর থেকে বড়! আর এমন জোরে জোরে পড়ছিল যেন বন্দুকের গুলি। খানিকক্ষণের মধ্যেই জমির ওপর এক ফুটের মতো উঁচু বিছানা বিছিয়ে গেল। চারিদিক

থেকে কৃষকরা পালাতে লাগল। গরু, ছাগল, ভেড়াগুলো সব চেঁচাতে চেঁচাতে গাছের ছায়ার খোঁজে ফিরছিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, না জানি তুলসার কি হল। ভাল করে দেখে, দেখতে পেলাম খোলা মাঠে রাধা তুলসা আর মোহিনী গরু দাঁড়িয়ে আছে। তিনটেতেই তুমুল শিলাবৃষ্টির মধ্যে পড়ে গেছে। তুলসার মাথায় একটা ছোট গোছের ঝুড়ি আর রাধার মাথায় একটা বড় মাপের বোঝা। আমার চোখ দুটো জলে ভরে এল, শেষে এই বেচারাদের কি গতি হবে! হঠাৎ একটা জোর ঝাপটা রাধার মাথার বোঝাকে ফেলে দিল। বোঝাটা পড়তে না পড়তেই তুলসা চট করে ওর ঝুড়িটা রাধার মাথায় আড়াল করে ধরল। কে জানে ওর ফুলের মতো মাথায় কত শিল পড়ল। ওর হাত কখনো পিঠের ওপর আবার কখনো মাথা সামলাচ্ছিল। এক সেকেণ্ডের বেশী এই হাল হয়েছে কি না হয়েছে রাধা বিদ্যুত বেগে গাঁঠরিটা উঠিয়ে নিয়ে টুকরিটা তুলসাকে দিল। কি গভীর প্রেম!

অনর্থকারী দুর্দৈব সব আনন্দ নষ্ট করে দিল। সকালে মেয়েরা গাইতে গাইতে গিয়েছিল। সন্ধ্যে বেলা ঘরে ঘরে শোক নেমে এল। কতজনের মাথা রক্তাক্ত হল। কতজনের ক্ষতি হল। ক্ষেতের সর্বনাশ হয়ে গেল। ফসল বরফের জলে দেবে গেল। জ্বরের প্রকোপ ভয়াল হয়েছে। সারা গ্রাম এখন হাসপাতাল। কাশী ভরের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হল। হোলীর আগুনের রহস্য প্রকাশ পেল। ফসলের এই দশা, আর এদিকে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। বড় বিপদের মোকাবিলা! মার-পিট, গালাগালি, অশ্লীল শব্দ, সব উপায়েই কাজ হাসিল করা হচ্ছে! দুপক্ষের ওপরই এই দেবীর কোপ!

তোমার

বিরজন।

৬

মঝগাঁও

আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম,

পুরো পনের দিন বাদে তুমি বিরজনের খোঁজ নিলে। চিঠিটা বার বার পড়লাম। তোমার চিঠি কাঁদান ছাড়া কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। আমিও অনেক কাঁদি। তোমাকে কোন্ কোন্ কথায় বিশ্বাস দেওয়াবো? আমার মন এমন দুর্বল যে যখনই এই সব কথার দিকে মন যায় তখন তার বিচিত্র দশা হয়। কেমন উত্তপ্ত হয়ে উঠি। বড় আরামপ্রদ, অত্যন্ত ব্যগ্র করার মত, অনেক কাঁদানোর মত এক দুরাশাভরা ব্যথা জন্ম নেয় বুকের মধ্যে। জানি তুমি আসছ না, আর আসবেও না, তবু বার বার সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি, হয়তো বা এসে পড়লে!

কাল সন্ধ্যেবেলা এখানে বড় সুন্দর এক মজার জিনিস দেখতে পেলাম। তা হল ধোপাদের নাচ। পনের বিশজনের দল। তার মধ্যে একজন যুবক সাদা পেশোয়াজ পরে, কোমরে অসংখ্য ঘণ্টা বেঁধে, পায়ে নূপুর আর মাথায় লাল টুপি চাপিয়ে নাচছিল। লোকটা যখন নাচছিল, তালে তালে মৃদঙ্গ বাজছিল। জানা গেল এরা হোলীর বকশিশ নিতে এসেছে। এরা বকশিশপ্রিয় জাত। তোমার এখানে যদি কোন কাজটাজ হয় তো ওদের বকশিশ দাও, আবার ওদের ওখানে যদি কোন কাজ পড়ে তাহলেও ওদের পারিতোষিক পাওয়া চাই। নাচার সময় এরা গান গায় না। এদের গান এদের কবিতা। পেশোয়াজওলা লোকটা মৃদঙ্গ হাতে নিয়ে একটা 'বিরহা'র* ছড়া বলে গেল। দ্বিতীয়জন সামনে এসে তার উত্তর ছড়ায় দিল। দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে কবিতা (ছড়া) রচনা করছিল। এই জাতির মধ্যে কবিত্বশক্তি অত্যধিক। এই কবিতাগুলো যদি মনোযোগ দিয়ে শোন তাহলে এগুলোর (ছড়ার) মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবিত্বের ভাব লক্ষ্য করতে পারবে। পেশোয়াজওলা লোকটা প্রথম যে ছড়া বলেছিল, তার অর্থ হল যে, ধোপার সন্তানরা! তোমরা কার দরজায় এসে

* 'বিরহা' বাংলার তর্জা গান বা কবির লড়াই-এর মত—অনুবাদক।

দাঁড়িয়েছ? দ্বিতীয় জন তার উত্তর দিল, এখন না আছেন আকবর বাদশা, না রাজা ভোজ, এখন যিনি আছেন, তিনিই আমার প্রভু, ওঁর কাছেই এসেছি। তৃতীয় ছড়ার (বিরহার) অর্থ এই যে, যাচকের সম্মান কম হয়, অতএব কিছু চেয়ো না, গেয়ে বাজিয়ে চলতে থাক, দেনেওলা না চাইতেই দেবে। ঘণ্টাখানেক ধরে এরা ছড়া গান করল। তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না ওদের মুখ থেকে এই ছড়াগুলো এমন অনায়াসে বেরোচ্ছিল যে অবাক লাগছিল। ওরা কিন্তু এত সুন্দর ভাবে কথা বলতে পারে না। এই জাতি বড় মদ্যপ। জলের মতো এরা মদ খায়। বিয়েতে মদ, দ্বিরাগমনে মদ, পঞ্চায়েতে মদ, পূজো পাঠেও মদ।

বকশিশ চাইবে তাও মদ খাওয়ার জন্যে। ধোলাই-এর পয়সা চাইবে এই বলে যে আজ মদ খাবার পয়সা নেই। বিদায় নেবার সময় বেচু ধোপা যে ছড়াটা কেটেছিল তা কাব্যালঙ্কারে ভরপুর। এই রকম—

তোমার পরিবার এমন ভাবে বাড়ুক যেমন বাড়ে গঙ্গার জল।

এত সন্তান (পুত্র) হোক যেন আমের বোল্

গিন্নীমার সোহাগ অক্ষয় হোক, যেমন থাকে দূর্বার সবুজ রঙ্।

কেমন সুন্দর কাব্য!

তোমার
বিরজন।

৭

মঝগাঁও

প্রিয়,

এক সপ্তাহ ধরে চুপচাপ থাকার জন্যে ক্ষমা চাইছি। এই সপ্তাহে আমার একটুও অবসর মেলেনি। মাধবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। প্রথমে তো কয়েক পুরিয়া কুইনাইনই খাওয়ান হল। কিন্তু যখন এতে কোন লাভ হল না আর ওর অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল, তখন দিহলুরায় বৈদ্যকে ডাকা হল। বছর পঞ্চাশ বয়স হবে। খালি পা,

মাথায় পাগড়ী বাঁধা, কাঁধে গামছা, হাতে মোটা মত এটা সোঁটা (ছোট লাঠি) নিয়ে দরজার গোড়ায় এসে বসে পড়লেন। অবস্থায় উনি বড় জমিদার কিন্তু কেউ ওঁর গায়ে আজ পর্যন্ত একটা মেরজাই (ফতুয়া) পর্যন্ত দেখেনি। ওঁর এত সময় নেই যে নিজের শরীরের দিকে যত্ন নেন। এই এলাকার আট দশ ক্রোশ পর্যন্ত লোকে ওঁর ওপর বিশ্বাস রাখে। ওরা না হাকিমকে জানে না ডাক্তার। ওদের হাকিম ডাক্তার যা কিছু দিহ্‌লুরায়। খবর পেতেই এসে হাজির হয়েছেন। ডাক্তারের মত শুধু কেবল প্রথম ঘোড়া (যাওয়ার ব্যবস্থা) চাইবেন —তাও তেজী, যাতে ওঁর সময় নষ্ট না হয়। তোমার বাড়িতে এমন ভাবে থাকবেন যেন বোবা হয়ে গেছেন। রোগীকে দেখতে আসবেন এমন হন হন করে, যেন ঘরের বাতাস বিষে ভরা। রোগ নির্ণয় আর ওষুধের ব্যবস্থা কেবল ছ-মিনিটেই সমাপ্ত। দিহ্‌লুরায় ডাক্তার নন্‌—কিন্তু যত মানুষের ওঁর দ্বারা উপকার হয় তার সংখ্যা আন্দাজ করা কঠিন। উনি দয়া সহানুভূতির প্রতিমূর্তি। ওঁকে দেখা মাত্র রোগীর অর্ধেক রোগ দূর হয়ে যায়। ওনার ওষুধ এত সহজলভ্য এবং সাধারণ যে বিনে পয়সায় তা খুঁজে পাওয়া যায়। তিন দিনেই মাধবী চলাফেরা করতে লাগল। সত্যি বলতে কি ওই বৈদ্যের ওষুধে যেন যাদু আছে।

এখানে ইদানিং মোগলরা (সম্ভবতঃ কাশ্মীরী) হৈ-চৈ মাতিয়ে রেখেছে। শীতের সময় কাপড় দেয় আর চৈত্র মাসে দাম উসুল করে নেয়। সে সময় কোন ওজর আপত্তি শোনে না। টাকা আদায় করতে গালাগাল, মারপিট সব কিছুই এরা করতে রাজী। ছ-তিনজনকে খুব মেরেছে। রাধা কিছু কাপড় নিয়েছিল। ওর দরজায় এরা সবাই হাজির হয়ে গালাগাল দিতে লাগল। তুলসা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। এভাবে যখন ফল হল না, তখন খোঁটা থেকে মোহিনী গরুকে খুলে টানতে টানতে নিয়ে চলল। এই সময় দূরে রাধাকে আসতে দেখা গেল। রাধা এসেই এমন লাঠি চালাল যে একজন মোগলের (কাশ্মীরীর) কব্জি ঝুলে গেল। এতে মোগলীরা রেগে গিয়ে

পায়তারা কষতে লাগল। রাধাও জানের বাড়ী লড়ে বদমাইসগুলোকে শায়েস্তা করল। এর মধ্যে কাশী ভর এসে একজন মোগলের ভালো রকম ব্যবস্থা করল। দিলুহুরায়ের মোগলদের সঙ্গে মনকষাকষি। গর্ব করে বললেন—আমি এদের এত টাকা ডুবিয়েছি, এমন মার খাইয়েছি যে তার কোন হিসেব নেই। গণ্ডগোল শুনে উনিও হাজির হয়েছিলেন। তারপর তো শয়ে শয়ে লোক লাঠি নিয়ে ছুটল। ওরা মোগলদের ভাল রকম সেবা করল। আশা হচ্ছে এদিকে আসার সাহস আর ওদের হবে না।

এখন তো মে মাসও কেটে গেল। এখন কেন ছুটি হল না তোমার? নিশিদিন তোমার আসার প্রতীক্ষা। শহরে রোগের প্রকোপ কমেছে। আমরা খুব শিগগিরই ওখানে চলে যাব। আফশোষ। তুমি গ্রামে আর বেড়াতে পারবে না।

তোমার

বিরজন।

১৮

প্রতাপচন্দ্রের প্রয়াগ কলেজে পড়া তিন বছর হয়ে গেছিল। এই সময়ের মধ্যে সহপাঠী আর গুরুজনদের চোখে ও বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নিয়েছিল। কলেজের এমন কোন ব্যাপার ছিল না যেখানে ওর প্রতিভার সাক্ষর মিলত না। অধ্যাপকরা ওকে নিয়ে গর্ব অনুভব করতেন। ছাত্ররা মনে করত ও-ই তাদের নেতা। যেমন ক্রীড়া ক্ষেত্রে ওর নৈপুণ্য প্রশংসনীয় ছিল, সেই রকমই আলোচনা সভায় ওর যোগ্যতা আর সূক্ষ্ম-দর্শিতা প্রমাণিত সত্য। কলেজ সম্বন্ধিত একটা মিত্র সভা স্থাপিত করা হয়েছিল। শহরের সাধারণ ভদ্রমহোদয়েরা, কলেজের অধ্যাপক আর ছাত্ররা, সবাই ছিল এই সভার সভ্য। এবং প্রতাপ ছিল এই সভার উজ্জ্বল নক্ষত্র। এখানে আলোচনা হত দেশ আর সামাজিক বিষয় নিয়ে। প্রতাপচন্দ্র এমন ওজস্বিনী এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিত যে অধ্যাপকরাও ওর বিষয়ান্বেষণে

অবাক মানতেন। ওর বক্তৃতা আর খেলা, দুই-ই অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারত। সাধারণ পোশাকেও বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দাঁড়ালে, সভাস্থ সকলের চোখ ওর দিকে অপলক চেয়ে থাকত। ঔৎসুক্য আর উৎসাহের তরঙ্গ বয়ে যেত দর্শকদের মনে। বাক-চাতুরী, তার ইঙ্গিত ওর সুন্দর কাটা কাটা উচ্চারণ, শরীরের সুচারু সঞ্চালন এ সবই এমন প্রভাবময় হয়ে উঠত যেন শারদা স্বয়ং ওকে সাহায্য করছেন। মঞ্চে থাকাকালীন প্রতাপচন্দ্র সভাসদদের ওপর এক মোহিনী ছায়া বিস্তার করত। এক একটা কথায় শ্রোতাদের হৃদয়কে যখন বিদীর্ণ করত তারা সহসা হর্ষধ্বনিতে ওকে স্বাগত জানাত। প্রায়ই ওর বক্তৃতাগুলোর সমাপ্তি ঘটত এভাবেই। কারণ অধিকাংশ শ্রোতা ওর বাকবৈদগ্ধ্য আস্বাদনে সভাস্থলে উপস্থিত হতেন। ওর ধ্বনিময় শব্দ আর স্পষ্ট অনায়াস উচ্চারণ শ্রোতাদের ওপর এমনই প্রভাব ফেলেছিল। সাহিত্য ও ইতিহাসের অন্বেষণই ছিল ওর অধ্যয়নের বিশেষ বিষয়বস্তু। জাতিসমূহের উন্নতি এবং অবনতি তথা তাদের কারণ আর গতির ওপর প্রায়শই ও আলোচনা করত। বিশেষ করে শ্রোতাদের সাধুবাদই হত ওর এই শ্রম আর উদ্যমের প্রেরণা। আর একেই ও নিজের কঠোর পরিশ্রমের পুরস্কার বলে মনে করত। ওর উৎসাহ এবং উদ্দীপনার গতি লক্ষ্য করেই অনুমান করা যেত যে এই উন্নতিশীল (বর্ধমান) বৃক্ষ ভবিষ্যতে কেমন ফুল ফল উৎপন্ন করবে আর কেমনই বা রূপ রঙ নিয়ে আসবে। এখন পর্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও ও এ নিয়ে চিন্তা করেনি যে ওর আগামী জীবনের স্বরূপ কি হবে। কখনো ভাবত অধ্যাপক হবে এবং প্রচুর বই লিখবে। আবার কখনো উকিল হবার বাসনা হত। কখনো ভাবত যদি ছাত্রবৃত্তি পায় তো সিভিল সার্ভিসের চেষ্টা করবে। কোন একটি বিষয়ে ও মন স্থির করতে পারত না।

প্রতাপচন্দ্র কিন্তু সেই ছাত্রদের মধ্যে ছিল না যাদের সমস্ত উদ্যোগ কেবল বক্তৃতা আর বই পর্যন্ত সীমিত। ওর সংযম আর যোগ্যতার একটা বিশেষ অংশ জনগণের সেবায় ব্যয়িত হত। প্রকৃতির

অসীম ঔদার্যের কাছ থেকে ও পেয়েছিল উদার আর দয়ালু হৃদয় এবং পিতার জীবনের শিক্ষা ওকে দিয়েছিল সর্বসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা আর কাজ করার যোগ্যতা ও মননশীলতা। এই কাজে ওর সদুৎসাহ ক্রমেই পরিপূর্ণ ভাবে প্রমাণিত হচ্ছিল। অনেক সন্ধ্যাতেই ওকে কীটগন্ধ আর কাটরার দুর্গন্ধময় গলিতে ঘুরতে দেখা যেত, বিশেষ করে নীচ জাতির লোকেরা যেখানে বাস করত, যাদের ছায়া মাড়ালে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জাত যেত, প্রতাপচন্দ্র তাদের সঙ্গেই ভাঙা খাটিয়ায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথা বলে যেত। এই কারণেই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রতাপচন্দ্রের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল। অনবধানতা এবং শারীরিক সুখের প্রতি লোভ, এই দুই অপগুণ প্রতাপ-চন্দ্রের মধ্যে নামমাত্রও ছিল না। কোন অনাথ লোক প্রতাপচন্দ্রের সাহায্য থেকে কখনো বঞ্চিত হত না। কত রাত ও ঝুপড়িতে যন্ত্রণাকাতর রোগীদের শিয়রে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে। এই অভিপ্রায়ে ও জনগণের সুবিধার জন্য একটা সভা স্থাপন করেছিল। আড়াই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এই সভা (কমিটি) জনতার সেবায় এত সাফল্য লাভ করে যে প্রয়াগবাসীদের মনে ওর প্রতি জন্মেছিল এক অপরিসীম ভালবাসা।

কমলাচরণ প্রয়াগে পৌঁছলে প্রতাপচন্দ্র ওর খুব আপ্যায়ন করল। সময়, ওর চিত্তের হিংসার জ্বালাকে প্রশমিত করেছিল। বিরজনের অসুখের সময় বেনারসে পৌঁছে ওর সঙ্গে দেখা হতেই বিরজনের অবস্থার উন্নতি হতে লাগল। এই সময়ই প্রতাপচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে বিরজনের হৃদয়ে ওর জন্য যে স্থান সুরক্ষিত, সেখানে কমলাচরণের স্থান হয়নি। এই চিন্তাই ওর দ্বেষাগ্নিকে নির্বাপিত করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া সুশীলার প্রাণঘাতী-রূপে নিজেকে চিহ্নিত করে ও উদ্বিগ্ন হত। মৃত্যুপথযাত্রী সুশীলা যখন ওর কাছে তার অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা চায় সেইক্ষণ থেকেই প্রতাপচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করে, যদি সুযোগ পায় তবে তার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে নিশ্চয়ই করবে। কমলাচরণের আদর

আপ্যায়নে ও শিক্ষা-সংস্কারে ও খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করত যেমন ছোট ভাই বড় ভাইয়ের সঙ্গে করে। নিজের বেশ কিছুটা সময় ও কমলাচরণকে সাহায্য করতে ব্যয় করত। এমন সহজ ভাবে শিক্ষকের কর্তব্য পালন করত যে রসহীন বিদ্যাশিক্ষা আকর্ষক হয়ে উঠত।

কিন্তু প্রতাচন্দ্রের এত প্রযত্ন সত্ত্বেও কমলাচরণের মন এখানে সর্বদাই ব্যাকুল হয়ে থাকত। সারা হোস্টেলে ওর স্বভাবের অনুকূল এমন একজনও ছিল না যার কাছে ও নিজের মনের দুঃখের কথা ব্যক্ত করতে পারে। প্রতাপের কাছে ও নিঃসংকোচ হলেও অনেক কথাই ওকে বলতো না। ওর নিঃসঙ্গ মন বেশী ব্যাকুল হয়ে পড়লে ও বিরজনকে দোষ দিত। ওর মাথায় শিক্ষার এই বিপত্তি চাপানোর জন্য দায়ী করত ও বিরজনকেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ওর প্রতি বিরজনের কোন প্রেম-ভালবাসা নেই। ভাবত—মুখ আর কলমের প্রেম আবার প্রেম নাকি! আমি চাইলে ওর জন্যে প্রাণই কেন না দিয়ে দিই, কিন্তু ওর প্রেম কথা আর কলমের বাইরে বেরিয়ে আসবে না কোনদিন। এমন পাষাণ প্রতিমার সামনে মাথা কুটে কি লাভ, যে নরম (উত্তপ্ত, ঘামা অর্থে) হতেই জানে না! এই সব চিন্তা কমলাচরণের মনের মধ্যে এমন গেঁথে বসল যে ও বিরজনকে চিঠি লেখাই ছেড়ে দিল। বেচারী বিরজন, চিঠিতে হৃদয়কে নিংড়ে উজাড় করে দিত। কিন্তু কমলা উত্তরটুকু পর্যন্ত দিত না। যদি বা দিত তা একেবারেই রস-হীন আর হৃদয়বিদারক। এই সময়ে বিরজনের এক একটা কথা ওর চলন (ব্যবহার) ওর প্রেমের শৈথিল্যের পরিচায়ক বলে কমলার মনে হত। অবশ্যই, বিরজনের প্রীতিপূর্ণ ভালবাসার কথা; ওর পাগল করা ডাগর ডাগর দুটো চোখ, যা বিচ্ছেদের সময় সজল হয়ে উঠেছিল আর ওর কোমল পেলব হাত যা ওকে মিনতি করেছিল বরাবর চিঠি পাঠানোর জন্যে—, এ সবই কমলাচরণের বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। যদি স্মরণে থাকত তাহলে হয়তো সুখস্মৃতি রোমন্থনে ও সন্তোষ লাভই করত। কিন্তু এমন অবস্থায় মানুষের স্মরণশক্তি অনেক

সময়েই প্রতারণা করে বসে।

শেষে কমলাচরণ নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য এক উপায় উদ্ভাবন করল। প্রথম যখন ওর কিছু জ্ঞানোন্মেষ হয় তখন থেকে সুন্দর বাগানে ভ্রমণ করা ওর অভ্যাস হয়ে গেছিল। আর এর থেকেই সৌন্দর্যের উপাসনা করা ওর স্বভাব হয়ে দাঁড়াল। শরীর রক্ষার জন্য খাদ্যের অনিবার্যতার মতই সৌন্দর্যের উপাসনা কমলাচরণের জীবনে অনিবার্য হয়ে উঠল। বোর্ডিং হাউসের লাগোয়া এক শেঠের বাগানের মালীর এক কুমারী কন্যা ছিল। নাম সরযূ দেবী। সরযূ পরমা সুন্দরী নয়। তবে কমলাচরণের কাছে ওর সৌন্দর্যের চেয়ে শরীরটাই কাম্য হয়ে উঠেছিল। নিছক বিনোদন সামগ্রী বই আর কিছু নয়। যে কোন স্ত্রীলোক, যার শরীরে যৌবনের ঝলক আছে, ওর মনকে তৃপ্ত করার জন্যে ছিল যথেষ্ট।

কমলাচরণ মেয়েটির প্রেমে নিমগ্ন হল। রোজই সন্ধ্যাবেলা বাগানের পথে পথে পায়চারি করতে লাগল। অন্য সব ছেলেরা যখন মাঠে কসরৎ করতে ব্যস্ত, কমলা তখন বাগানে উঁকিঝুঁকি মারত। ধীরে ধীরে সরযূ দেবীর সঙ্গে ওর পরিচয় হল। প্রথম প্রথম ওর কাছ থেকে ফুলের তোড়া কিনে তার চারগুণ দাম দিত। সরযূ ক্রমে ওর প্রীতি-জালে জড়িয়ে পড়ল। এমন কি এই প্রীতির ফাঁদে পড়ে দু-এক বার পরস্পরের অন্ধকারের আড়ালে মিলনও হল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ছাত্ররা বেড়াতে গেছিল। কমলাচরণ একলা বাগানে পায়চারি করতে করতে বার বার মালীর কুঁড়ের দিকে তাকাতে লাগল। অকস্মাৎ সরযূ কুঁড়ে থেকে ইশারায় ওকে ভেতরে ডাকতে কমলা দ্রুত কুঁড়ের মধ্যে ঢুকল। সরযূ আজ মলমলের শাড়ি পরে সেজেছে। এই শাড়ি কমলাবাবুই তাকে উপহার দিয়েছে। মাথায় ঢেলেছে সুগন্ধি তেল, এও বাবুরই কল্যাণে, গায়ে ছিটের জামা পরেছে, পছন্দ করে বাবু সাহেবই করিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখে আজ নিজেকে পরমা সুন্দরী ঠেকছিল সরযূর। নইলে কমলার মত এমন ধনী মহাজন ওর জন্য মরবে কেন? খাটিয়ায় বসে নেশাভরা

চোখে সরযুর হাবভাব লক্ষ্য করছিল কমলা। এই মুহূর্তে সরযূদেবীকে ওর বৃজরাণীর চেয়ে কম সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল না। গায়ের রঙে একটু যা তফাৎ। তাও এমন কিছু বেশী নয়। বরং সরযুর এই প্রেমসজ্জা ওর কাছে আরও বেশী উৎসাহব্যঞ্জক মনে হচ্ছিল কারণ ও যখনই বেনারসে যাবার কথা বলত সরযূদেবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত আর বলত—আমাকেও নিয়ে চল, তোমার সঙ্গ আমি ছাড়ব না। কোথায় এই প্রেমের তীব্রতা আর আগ্রহের বাহুল্য আর কোথায় বিরজনের উদাসীন সেবা আর নির্দয়তাপূর্ণ অভ্যর্থনা।

এই মনোরম সৌন্দর্য চোখ ভরে ভালো করে দেখাও হয়নি হঠাৎ মালী এসে দরজায় ঘা মারল। সারা শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল কমলাচরণের। এখন কাটলেও বোধহয় এক ফোঁটা রক্ত শরীর চুঁইয়ে পড়বে না। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে। সরযু ফিস্‌ফিস্ করে বলল—এখন আমি কোথায় যাব? ভয়ে ওর প্রাণ এমনই উবে গেছে, মুখ দিয়ে আর টু শব্দটিও বেরোচ্ছে না। আবার মালী দরজায় ঘা দিল। বেচারী সরযু ভয়ে বিহ্বল হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দরজা খুলে দিল। তখন কমলাচরণ এক কোণে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

যেমন ভাবে বলির পাঁঠা হাড়-কাঠের মধ্যে ছটফট্ করে সেই রকম কোণায় দাড়ান কমলার হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করছিল। জীবনের আশা ত্যাগ করে ও মন প্রাণ দিয়ে শুধু ঈশ্বরকে স্মরণ করছিল—যদি এবারের মত মুক্তি পাই তো জীবনে দ্বিতীয় বার আর এমন কর্ম কখনো করব না।

ইতিমধ্যে মালীর দৃষ্টি কমলার ওপর গিয়ে পড়ল, প্রথমে তো ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তারপর সামলে নিয়ে কাছে এসে বলল—কে দাঁড়িয়ে আছে? এ কে?

এটুকু শুনেই কমলাচরণ লাফিয়ে বাইরে এল তারপর চোখ কান বুজে প্রাণপণ দৌড় লাগাল ফটকের দিকে। মালী একটা ডাণ্ডা হাতে নিয়ে—ধর ধর পালাতে না পারে—বলে চিৎকার করতে করতে পেছন পেছন ছুটল। এ কী সেই কমলাচরণ, যে মাঝে মাঝে মালীকে

পুরস্কার এবং বকশিস দিত। যার সঙ্গে মালী সরকার বা হুজুর ভিন্ন কথা কইত না। সেই মালীরই কাছ থেকে আজ কমলাচরণকে এভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে হল। পাপ, আগুনের সেই কুণ্ড যা মানুষের সম্ভ্রম আর সম্মান, সাহস আর ধৈর্যকে ক্ষণমাত্রে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

গাছ আর লতার আড়ালে আড়ালে দৌড়তে দৌড়তে কমলাচরণ ফটকের বাইরে এল। রাস্তা দিয়ে টাঙ্গা যাচ্ছিল, তার ওপর চড়ে বসল। হাঁপাতে হাঁপাতে এমনই অশক্ত হয়ে পড়েছিল যে টাঙ্গার মাচায় (বসার জায়গায়) এলিয়ে পড়ল। মালী যদিও ফটক পর্যন্ত আসেনি, তবুও চমকে ফিরে পথ চলতি প্রত্যেকটি মানুষের ওপর ভাল করে দৃষ্টিপাত করছিল কমলাচরণ। মনে হচ্ছিল সারা বিশ্ব ওর সঙ্গে যেন শত্রুতা করছে। দুর্ভাগ্য আরও বিভ্রান্ত করল ওকে। স্টেশানে পৌঁছে ভয়ের দাপটে গাড়ীতে উঠে পড়ল। টিকিট নেওয়ার কথা ওর বুদ্ধিতেই আসেনি আর এ-ও জানত না সে কোথায় চলেছে। আসলে এই সময়ে ও এই শহর থেকেই পালাতে চাইছিল, সে যেখানেই হোক। কিছুদূর গিয়েছে এমন সময় এক ইংরেজ অফিসারকে লণ্ঠন নিয়ে আসতে দেখা গেল, সঙ্গে একজন সেপাইও আছে। যাত্রীদের টিকিট দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল। কিন্তু কমলা বুঝল কোন পুলিস অফিসার। ভয়ে ওর হাত পা কাঁপতে লাগল। বুক ধড়ফড় করতে শুরু করে দিল। যতক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজটি অন্যান্য কামরাগুলো পরীক্ষা করছিল ততক্ষণ কোন রকমে ও নিজেকে শক্ত করে রেখেছিল। কিন্তু যেই ওর কামরার দরজা খুলল, কমলার হাত পা অবশ হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার ছেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্তের মত দৌড়ে গিয়ে অন্য দিকের দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ল। সেপাই আর রেলের সাহেব ওকে এই ভাবে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়তে দেখে ভাবল কোন বড় রকমের দাগী ডাকাত। ওদের আনন্দ আর ধরে না। পারিতোষিক তো আলাদা করে পাওয়াই যাবে সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি। সময় নষ্ট না করে তক্ষুনি ওরা লাল-

বাত্তি দেখাল, একটু বাদেই গাড়ী থামল। গাড়ী থামতেই গার্ড, সেপাই আর টিকিট চেকার সঙ্গে কিছু যাত্রী গাড়ী থেকে নেমে পড়ে লণ্ঠন নিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। একজন বলে উঠল—এখন ওর চিহ্ন মেলাও ভার হবে। বড় ডাকাত ছিল। যাত্রীদের মধ্যে আরেকজন কেউ বলল—এইসব লোকের ওপর কালীমায়ের বর থাকে। যা কিছুই করে দেখাক না, তা কম। গার্ড কিন্তু এগিয়েই চলল। বেতন বৃদ্ধির দুরন্ত আশা ওকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন কি ও এগোতে এগোতে কমলাচরণ যেখানে লাফ দিয়ে পড়েছিল সেখানে গিয়ে পৌছল। ইতিমধ্যে সেপাই খালের দিকে সংকেত করে বলল—দেখুন, এই সাদা রঙের জিনিসটা কি। আমার তো কোন মানুষের মতো বলে মনে হচ্ছে। অন্যান্য লোকেরা দেখে নিশ্চিত হয়ে বলল—ওখানে ডাকাতটা লুকিয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে ওকে ঘিরে ফেল যাতে কোন রকমে ব্যাটা পালাতে না পারে। একটু সাবধানে এগিয়ো, ডাকাতরা জানে রওপর খেলে যায়। গার্ড সাহেব এবার পিস্তল বাগাল। সেপাই মিঞা বাগাল তার লাঠি। কিছু যাত্রী জুতো খুলে হাতে নিল, বলা যায় না বদমাস ডাকাতটা হঠাৎ যদি আক্রমণ করে বসে তো পালাতে সুবিধা হবে। দুজন ঢিল উঠিয়ে নিল যাতে সুযোগ মতো দূর থেকেই আক্রমণ করা যায়, ডাকাতের কাছে কে যায়, প্রাণে হিম্মত কার আছে। কিন্তু লোকজন যখন কাছে গিয়ে দেখল, তো না ছিল ডাকাত না ছিল ডাকাতের ভাই। ভদ্র, গৌরবর্ণ ছিপ্ছিপে দোহারা চেহারার এক তরুণ যুবক মাটির ওপর মুখ থুপ্ড়ে পড়ে আছে। ওর নাক আর কান দিয়ে ধীরে ধীরে রক্ত বইছে।

কমলা এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল আর ওদিকে বিরজন ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠল। বিরজনের সোহাগ লুটে নিল সরযূ।

সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর জীবনে তার পতি জগতের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। তারই জন্যে সে বাঁচে, মরে তারই জন্যে। তার হাসি, তার কথা পতিকেই প্রসন্ন করার জন্যে। তার সোহাগ (সিঁদুর) তার জীবন আর সোহাগের অবসান তার জীবনের অন্ত।

কমলাচরণের অকাল মৃত্যু বৃজরাণীর কাছে তার মৃত্যুর চেয়ে কম ছিল না। স্বামীকে ঘিরে কি কি অভিলাষ ছিল তার আর কি হয়ে গেল! প্রতিটি ক্ষণ কমলাচরণের ছবি ওর চোখের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াত। খানিকক্ষণের জন্যও যদি চোখ তন্দ্রায় বুঁজে আসত তো কমলাচরণের স্বরূপ বাস্তব হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াত।

কোন কোন সময় অশরীরী আত্মার প্রভাব কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজনের উপর ভালবাসার ছায়া বিস্তার করে। কমলাচরণের শোক শান্ত হতে না হতে শ্যামাচরণের পালা এল। শাখা কেটে গাছকে মিইয়ে যেতে না দেখে দুর্দৈব এবার মূলই উপড়ে ফেলল। রামাদীন পাণ্ডে খুব দাম্ভিক প্রকৃতির মানুষ। যতদিন ডেপুটি সাহেব মঝগাঁও-এ ছিলেন ততোদিন ও গুম মেরে বসেছিল। যেই উনি শহরে ফিরলেন সেদিন থেকেই পাণ্ডেজী উৎপাত আরম্ভ করল। সারা গ্রামকে গ্রাম ছিল ওর শত্রু। যে দৃষ্টিতে মঝগাঁওবাসীরা হোলীর দিন ওকে দেখেছিল সে দৃষ্টি ওর হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। যে থানার অধীনে মঝগাঁও, তার দারোগা সাহেব একজন ঘাঘু আর কুশলী সুদখোর। হাজার হাজার টাকার মাল হজম করে নিয়ে ঢেঁকুরটি পর্যন্ত তুলতেন না। অভিযোগ তৈরী করতে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ খাড়া করতে এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে রাস্তায় চলতে চলতে মানুষকে এমন ভাবে ফাঁসিয়ে দিতেন যে কাউকে দিয়েই তার রেহাই পাবার উপায় থাকতো না। বড় অফিসাররা ওঁর এই চাতুরীর বিষয়টি জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ওর চাতুরী আর কর্ম-দক্ষতার কাছে কারো কর্তৃত্ব খাটত না। রামাদীন দারোগা সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নিজের হৃদরোগের জন্য ওষুধ চাইল। তার এক সপ্তাহ বাদেই মঝগাঁও-এ ডাকাত পড়ল। এক মহাজন শহরে যাচ্ছিল।

রাত্রে ···নম্বরদারের ওখানে ছিল। ডাকাতরা ওকে বাড়ি ফিরতে দিল না। সকালে দারোগা সাহেব তদন্তে এসে একই দড়িতে সারা গ্রামকে বেঁধে নিয়ে গেলেন।

দৈবক্রমে মোকদ্দমা বাবু শ্যামাচরণের এজলাশে পেশ করা হল। আগে থেকেই সত্যি বৃত্তান্তের পুরোটাই ওঁর জানা ছিল আর এই দারোগা সাহেবও অনেক দিন থেকে ওঁর নজরে আটকে ছিলেন। উনি এমন চুলচেরা বিচার করলেন যে দারোগা সাহেবের কীর্তি ফাঁস হয়ে গেল। ছ'মাস পর্যন্ত মামলা চলল বেশ জেদের সঙ্গেই। সরকারী উকিলরা প্রচণ্ড চেষ্টা চালাল। কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণ। ফল হল এই যে, ডেপুটি সাহেব সব অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে দিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা দারোগা সাহেবকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল।

যখন ডেপুটি সাহেব রায় শুনিয়ে ফিরলেন, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী কর্মচারী বলল—হুজুর, দারোগা সাহেবের থেকে সাবধান থাকবেন। আজ খুব ক্ষেপে ছিল। আগেও দু-তিনজন অফিসারকে ধোঁকা দিয়েছে। আপনাকেও নিশ্চয়ই বাধা দেবে। ডেপুটিসাহেব শুনে হেসে ওকে ধন্যবাদ জানালেন। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন মনে করলেন না। কারণ ব্যাপারটা ওঁর কাছে ভীরুতারই নামান্তর বলে মনে হল। রাধা আহীর খুব অনুরোধ করল ওঁর সঙ্গে থাকার জন্য, কাশী ভরও সঙ্গে থাকবে বলে লেগে থাকল। উনি কিন্তু কাউকেই আমল দিলেন না। আগের মতই নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন।

জালিম খাঁ কথার রাজা, ও জীবনের মায়া ত্যাগ করে শ্যামাচরণের পেছনে লেগে থাকল। একদিন উনি ভ্রমণ সেরে শিবপুর থেকে খানিক রাত্রে ফিরছিলেন, এমন সময় পাগলা-গারদের কাছে কিছু দেখে ঘোড়া হঠাৎ হকচকিয়ে উঠল। গাড়ী থেমে গেল। মুহূর্ত মধ্যে জালিম খাঁ একটা গাছের আড়াল থেকে পিস্তল চালাল। পটকার শব্দ হল এবং বাবু শ্যামাচরণের বক্ষস্থল ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গেল। পাগলা-গারদের সেপাই দৌড়ল। জালিম খাঁ ধরা পড়ল, কারণ সহিস ওকে

পালাতে দেয়নি।

এই দুর্ঘটনা আত্মীয় পরিজনের সর্বনাশ করল। প্রেমবতী যদিও খুব সুশীলা এবং হাস্যময়ী রমণী, তবুও পর পর দুটি দুর্ঘটনা ওর স্বভাব আর ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটাল। কথায় কথায় বিরজনের ওপর রেগে যেত আর কটূক্তি করে ওকে জ্বালাত। ওর একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মে গেছিল যে, এই সব বিপত্তি এই বৌ-ই ডেকে এনেছে। এই হতভাগী যবে থেকে ঘরে এসেছে বাড়ির (পরিবারের) সর্বনাশ হয়েছে। এর প্রভাব অতি অশুভ। কয়েকবার ও খোলাখুলি বিরজনকে বলেও দিয়েছিল—তোমার চক্‌চকে, চটকদার রূপ আমাকে ঠকিয়েছে। আমি কি জানতাম তোমার চরণ এমন অশুভ। এসব কথা বিরজন নীরবে শুনত আর বুক বেঁধে থাকত। যবে থেকে ঘরে অমঙ্গল ঢুকেছে, ভাল কথা ওর কানে আর সেঁধোয় নি। আর সেঁধোবেই বা কেমন করে। অষ্টপ্রহরের এই তাপ (সন্তাপ) ওর শোকের, দুঃখের অশ্রুকেও শুকিয়ে দিয়েছিল। চোখের জল তখনই বয় যখন কোন হিতৈষী থাকে আর সে দরদ দিয়ে দুঃখের কথা শোনে। খোঁচা দেওয়া বাক্য আর ব্যঙ্গের আগুনে দুঃখের অশ্রু জ্বলেই যায়।

একদিন একলা বসে বসে বিরজনের মন এমন খারাপ হয়ে গেছিল যে ও খানিকক্ষণের জন্য বাগানে চলে এল। বিরজন ভাবছিল, হায় এই বাগানে কত শত আনন্দের দিন কেটেছে। এর একটা গাছ মৃত স্বামীর প্রেমের স্মারক। এমনও অনেক দিন গেছে যখন এই ফুল আর পাতাগুলোকে দেখে চিত্ত প্রফুল্ল হত। আর এর সুরভিত বাতাস হৃদয়কে প্রেমোদিত করে তুলত। এ সেই জায়গা, যেখানে অনেক সন্ধ্যা শুধু প্রেমালাপে কেটেছে। সে সময়ে ফুলের কলিগুলো ওদের কোমল অধর দিয়ে ওকে যেন স্বাগত জানাত। কিন্তু হায় আজ তারা আনত মুখে অধর রুদ্ধ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছে। এটা কি সেই স্থান নয় যেখানে বসে সুন্দরী মালিনী ফুলের মালা গাঁথত। কিন্তু সেদিন কি সেই সরলা মালিনীর জানা ছিল যে আজ একই জায়গায় বসে তাকে অশ্রুর মুক্তো বিন্দু দিয়ে মালা গাঁথতে হবে। এই সব নানান

কথা ভাবতে ভাবতে বিরজনের দৃষ্টি কুঞ্জবনের ওপর গিয়ে পড়ল। এই কুঞ্জবন থেকেই কমলাচরণ একদিন হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসেছিল। ও যেন কুঞ্জবনের পাতাগুলোর সঞ্চালনের মধ্যে কমলার পোশাকের ঝলক দেখতে পাচ্ছে। এই সময় বিরজনের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। যেন গঙ্গার বুকে অস্তগামী সূর্যের হলদে আর ম্লান কিরণের প্রতিবিম্ব পড়েছে। হঠাৎ প্রেমবতী উদয় হয়ে কানে বিষ ঢেলে বলে উঠল—এখন কি আপনার বেড়াবার শখ হয়েছে?

বিরজন দাঁড়িয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল—মা, নারায়ণ যাকে পায়ে ঠেলেছেন আপনি তাকে কেন পায়ে দলছেন?

অবশেষে সংসারের সমস্ত কিছুর ওপর প্রেমবতী বিরক্ত হয়ে উঠল। এক মাসের মধ্যে সব কিছু বেচে দিয়ে মঝগাঁও চলে গেল। বৃজরাণী ওখানেই পড়ে রইল। বিরজনের মুখদর্শন করতেও ও ঘৃণা বোধ করত। এই বিশাল বাড়িটায় বিরজন এখন একা। শুধু সারাক্ষণের সঙ্গী মাধবী ছাড়া ওর আর কেউ হিতৈষী রইল না এখানে। নিজের মেয়ে থাকলে তার বিপত্তিতে যতটা শোক হত, পাতানো মেয়ের জন্য সুবামার ততটাই শোক হল। কত যে কান্নাকাটি করল। আর বিরজনকে বোঝানোর জন্য, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রায়শই ও ওর কাছে আসা যাওয়া করতে লাগল। বিরজন যখন একলাই আছে, ওর ইচ্ছে সে ওর কাছেই এসে সুখে থাকুক। অনেকবার তাকে আনতে গেল কিন্তু কোন ভাবেই বিরজনকে রাজী করান গেল না। ও মনে মনে ভাবত, এই পৃথিবী থেকে শ্বশুরের বিদায় নেবার এখনও তিন মাসও হয়নি। এর মধ্যেই যদি বাড়ি শূন্য হয়ে যায় তাহলে লোকে বলবে যে ওঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী বৌ লড়াই করে মরল। বিরজনের না আসতে চাওয়ার জেদে সুবামার মন ভেঙে গেল।

মঝগাঁও-এ প্রেমবতী হুলুস্থুলু বাধিয়ে রাখল। প্রজাদের কটু কথা বলতে লাগল। গোমস্তার মাথায় জুতোর বাড়ি মারল। চূড়ান্ত অপমান করতে লাগল তাকে অহরহ। পাটোয়ারীকে গালমন্দ করল। রাধা অহীরের গরু জোর করে ছিনিয়ে নিল। অত্যাচার এতদূর গিয়ে

পৌঁছাল যে গ্রামবাসী ঘাবড়ে গেল। ওরা বাবু রাধাচরণের কাছে নালিশ জানাল। সব কথা শুনে রাধাচরণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে দু-দুটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মায়ের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক এ সময়ে ওর মন ভোলান দরকার। সেবতীকে লিখল মায়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে। এখন সেবতীর কোলে চাঁদের মত এক শিশু। আর প্রাণনাথ দু মাসের ছুটিতে দ্বারভাঙ্গা থেকে বাড়িতে এসেছে। রাজা সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে ওখানে গিয়েছিল সে। এই অবস্থায় সেবতী যাবে কেমন করে। তৈরী হয়ে নিতে বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। কখনো বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ল। কখনো শাশুড়ী রুগ্না হলেন। কখনও বা যাত্রা করার মতো শুভদিন মিলল না। অবশেষে জ্যৈষ্ঠ মাসে অবকাশ এবং সুযোগ দুইই মিলল। তাও অনেক ঝামেলা করে।

সেবতী এসেছে। কিন্তু প্রেমবতীর ওপর তার কোন প্রভাব পড়ল না। মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদলও না বা তার সন্তানের দিকে ফিরেও একবার চাইল না। প্রেমবতীর হৃদয়ে আজ স্নেহ, মমতা, ভালবাসার নাম মাত্রও নেই। যেমন আখ থেকে রস নিংড়ে নিলে শুধু তার ছিবড়েটুকু পড়ে থাকে, তেমনই যে মানুষের হৃদয় থেকে স্নেহ, ভালবাসা চলে গেছে সে তখন একটা অস্থি-চর্মের পিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। দেবদেবীর নামও আজকাল প্রেমবতী মুখে আনে না। ঠাকুরের নাম মুখে চলে এলে ওর চেহারা পাল্টে যায়। জন্মাষ্টমী হল। লোকে ঠাকুরজীর ব্রত উদ্‌যাপন্ করল। চাঁদা করে নাচ গানের ব্যবস্থা করল। এদিকে প্রেমবতী কিন্তু ঠাকুর-জীর জন্মক্ষণটিতেই ঘরের বিগ্রহকে খেতে ফেলে দিল। একাদশীর ব্রত ভঙ্গ হল, দেবতাদের পুজো গেল। প্রেমবতী আর সেই আগের প্রেমবতী নেই।

সেবতী যেন তেন প্রকারে মাস দুই কাটাল। ওর মন সদাই উদ্বিগ্ন হত। কোন সখী বা বান্ধবীও এখানে নেই যার সঙ্গে বসে গল্প করে মনের ভার হালকা করবে বা সময় কাটাবে। বিরজন তুলসাকে নিজের সখী করে নিয়েছিল। কিন্তু সেবতী বিরজনের মতো সরলা

স্বভাবের নয়। এই ধরনের মেয়েদের (এই শ্রেণীর) সঙ্গে মেলামেশা করা নিজের সম্মানহানিকর বলে মনে করত। তুলসা বেচারী বেশ কয়েক বার এল ওর সঙ্গে সখীত্ব পাতাতে কিন্তু যখন দেখল সেবতী মন খুলে ওর সঙ্গে মেশে না তখন ও আসা ছেড়ে দিল।

তিন মাস এ ভাবেই কাটল। একদিন সেবতী বেশ বেলা পর্যন্তই ঘুমিয়েছিল। আগের রাতে প্রাণনাথ খুব কাঁদিয়েছে। ঘুম ভাঙ্‌তে দেখল প্রেমবতী ওর বাচ্চাকে নিয়ে চুমু খাচ্ছে। কখনও চোখে চেপে রাখছে, কখনও আবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরছে। সামনে উনুনের ওপর কড়াইয়ে হালুয়া ফুটছে। বাচ্চাটা সেই দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করছে, যেন বলতে চাইছে ওখানে গিয়ে বসে হালুয়া খাবে। আজ ওর মুখ প্রসন্নতায় পদ্মের মতো বিকশিত হয়ে উঠেছে। যেন ওর তীব্র দৃষ্টি একথা জেনে ফেলেছে যে প্রেমবতীর শুষ্ক হৃদয়ে স্নেহ প্রীতি আবার বাসা বেঁধেছে। সেবতীর বিশ্বাস হল না। খাটে বসেই পুলকিত নয়নে তাকিয়ে ছিল। এ কী স্বপ্ন! এর মধ্যে প্রেমবতী আদর করে বলল—ওঠ মা! বেলা অনেক হল। সেবতীর লোম খাড়া হয়ে উঠল, দু চোখ জলে ভরে গেল। আজ দীর্ঘ দিন পর মার মুখ থেকে ভালবাসার কথা শুনছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে মার গলা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। প্রেমবতীর চোখ দিয়েও অশ্রুর ধারা বইছিল। শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হল। যখন দুজনেরই অশ্রু-ধারা থামল, প্রেমবতী বলল—সিত্তো! তোমার আজ এসব কথা আশ্চর্য মনে হচ্ছে! হ্যাঁ আশ্চর্য লাগবারই কথা। কেমন করে কাঁদি, চোখের জল যখন আমার শুকিয়ে গেছে? বুক্‌টা শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে, স্নেহ কোথা থেকে আনব আমি? এসব গ্রহের ফের। চোখের জল ওঁর সঙ্গেই চলে গেছে আর স্নেহ, আমার বমলার সঙ্গে। আজ জানি না কোথা থেকে এই দু-ফোঁটা বেরিয়ে এল। মা-গো! আমার সব অপরাধ ক্ষমা করিস।

একথা বলতে বলতেই প্রেমবতী চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগল। ভয়ে সেবতীর হতচকিত অবস্থা। তাড়াতাড়ি ওকে বিছানায়

শুইয়ে দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল। সেদিন থেকেই প্রেমবতীর প্রেমবতীর এমন দশা হল যে যখনই দেখ কাঁদছে। সেবতীর সন্তানকে এক মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া করে না। বাড়ির ঝি চকরদের সঙ্গে কথা বলে না তো, যেন মুখ দিয়ে ফুল ঝরছে। আবার সেই আগের সুশীলা প্রেমবতী যেন ফিরে এসেছে। মনে হচ্ছে ওর হৃদয় থেকে যেন একটা ভারী আবরণ হঠাৎ উন্মোচিত হয়েছে। যখন খুব চেপে শীত পড়ে, সকালের নদী বরফে ঢেকে যায়, তাতে বসবাসকারী জলচরেরা বরফের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, নৌকা ফেঁসে যায়। মন্দগতি, রজতবর্ণ প্রাণ সঞ্জীবনী জলস্রোতের স্বরূপ কিছুমাত্র দেখা যায় না। যদিও বরফের পর্দার আড়ালে তা মধুর নিদ্রায় অলস পড়ে থাকে। তবু গ্রীষ্মের দাবদাহের সময়ে বরফ গলে যায়। নদী তার বরফের চাদর তুলে নেয়। আবার মাছ আর জলচরেরা সাঁতার কাটে, নৌকার পাল পত্‌পত করে ওড়ে। তীরে মানুষ আর পাখীদের ভিড় লেগে যায়।

প্রেমবতীর এ অবস্থা কিন্তু খুব বেশীদিন টি'কল না। এই সচেতনতা ছিল, শুধুমাত্র মৃত্যুর সংবাদ। এই চিত্তবৈকল্য এখন পর্যন্ত ওকে জীবন কারাবাসে রেখেছিল, অন্যথা প্রেমবতীর মতো সহৃদয়া স্ত্রীলোকের এমন বিপত্তি সইত না।

সেবতী চারিদিকে তার পাঠাল প্রেমবতীকে এসে দেখে যাবার জন্য। কিন্তু কেউই এল না। প্রাণনাথের ছুটি মিলল না। বিরজন অসুস্থ ছিল। বাকী থাকল রাধাচরণ। ও নৈনিতালে 'বায়ু পরিবর্তন' করতে গেছিল। ছেলেকে দেখারই ওর আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু যখন চিঠি এল যে এই সময় ওর পক্ষে আসা সম্ভব নয় তখন প্রেমবতী দীর্ঘ শ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করল। আর এমন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল যে জেগে ওঠার সৌভাগ্য আর হল না।

২০

মানবহৃদয় এক রহস্যময় বস্তু। কখনো লাখ টাকার দিকে ফিরেও তাকায় না, আবার কখনো কানাকড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কখনো

শত শত নিরীহ মানুষের হত্যায় শোক পর্যন্ত করে না, আবার কখনো একটা শিশুর মৃত্যু দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। যদিও প্রতাপচন্দ্র আর কমলাচরণের মধ্যে সহোদর ভাই-এর মত প্রেম ভালবাসা ছিল, তবুও কমলার আকস্মিক মৃত্যুতে যে শোক ওর হওয়া উচিত ছিল তা হল না। শুনে ও চমকে ঠিকই উঠেছিল, আর কিছুক্ষণের জন্য ছ চোখ স্তব্ধ হয়েও গেছিল, কিন্তু সত্যিকার বন্ধুর বিয়োগব্যথায় যা সাধারণ মানুষের হয়ে থাকে, তা হল না। নিঃসন্দেহেই বিরজনকে ও বিয়ের আগে থেকেই নিজের ভাবত তবুও এই চিন্তায় ও কখনও পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। সময়ে সময়ে ওর ভাবনা এই পবিত্র সম্বন্ধের সীমা লঙ্ঘন করত। কমলাচরণের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রতাপচন্দ্রের কোন ভালবাসা ছিল না। ওকে যা কিছু খাতির যত্ন, সম্মান আর প্রেম (ভালবাসা) করত সে শুধু এই ভেবে যে বিরজন শুনে খুশি হবে। আর কিছু এই চিন্তায় যে সুশীলার মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হতে পারে। যখন বিরজন শ্বশুরবাড়ি চলে এল, তখন অবশ্য প্রতাপ কিছুদিন বিরজনকে ওর ভাবনায় ঠাঁই দেয়নি। কিন্তু যখন ওর অসুখের খবর পেয়ে বেনারস গিয়েছিল আর ওর দর্শন বিরজনের ওপর সঞ্জীবনীর মত কাজ করেছিল, সেইদিন থেকে প্রতাপের বিশ্বাস হয়ে গেছিল যে বিরজনের হৃদয়ে কমলা সেই স্থান পায়নি যেখানে সে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

প্রতাপচন্দ্র বিরজনকে পরম করুণা এবং স্নেহ ভরে এক শোক পত্র লিখল। কিন্তু চিঠি লিখতে লিখতে ও ভাবছিল—ওর ওপর এর প্রভাব কতখানি পড়বে। সাধারণত সমবেদনা প্রেমকে পরিপূর্ণ করে, এতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই ঘটবে না যদি এই চিঠি বিরজনের মনে তেমন কিছু ঘটায়। ছড়া এই মুহূর্তে ওর সৎ, ধার্মিক প্রবৃত্তি বিকৃত রূপ ধারণ ক'রে ওর মনে এই মিথ্যে ভাবনার উৎপত্তি করল যে-ঈশ্বর, আমার প্রেমের প্রতিষ্ঠা করলেন আর কমলাচরণকে আমার পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। এ যেন ভগবানের নির্দেশ, যে আমি বিরজনের কাছ থেকে আমার প্রেমের পুরস্কার গ্রহণ করি। প্রতাপ-

চন্দ্র তো একথাও জানত যে বিরজনের কাছ থেকে এমন কোন কথা আশা করা যায় না যা সদাচার আর সভ্যতার থেকে এক চুলও সরে গেছে! হায় মূর্খতা! কিন্তু ওর বিশ্বাস ছিল যে, সদাচার আর সতীত্বের সীমার মধ্যে যদি ওর কামনাগুলোকে পূরণ করা যায়, তাহলে বিরজন অধিক সময় পর্যন্ত ওর সঙ্গে নিষ্ঠুরতা করতে পারবে না।

এক মাস ধরে এই একই চিন্তা ওকে ব্যাকুল করে তুলল। এমন কি ওর মনে বিরজনের সঙ্গে একবার গোপনে দেখা করার প্রবল ইচ্ছাও জন্মালো। ও এটা ভাল করেই জানত যে বিরজনের হৃদয়ে সেই সময়ের আঘাত আজও বর্তমান। আর ওর কোন কথা বা ব্যবহার যদি ওর মনের এই অপচেষ্টার ব্যাপারটিকে তিল মাত্রও প্রকাশ করে তবে বিরজনের চোখে ও সর্বদার জন্য নীচু হয়ে যাবে! কিন্তু, যেমন কোন তস্কর অর্থরাশি দেখে ধৈর্য ধরতে পারে না, সে রকমই প্রতাপ নিজের মনকে রুখতে পারল না। সুযোগ মানুষের ভাগ্যকে অনেকখানিই নিয়ন্ত্রণ করে। সুযোগ তাকে ভাল বা মন্দ দুই ভাবেই প্রভাবিত করে। যতদিন কমলাচরণ বেঁচে ছিল প্রতাপের মনের এত উদ্ধত হবার সাহস হয়নি। তার মৃত্যু যেন ওকে সেই সুযোগই দিয়ে গেছে। এই স্বার্থপরতার স্পর্ধা এতদূর চড়ল যে ওর যেন মনে হল বিরজন ওকে এই মুহূর্তে স্মরণ করছে। নিজের ব্যগ্রতার মাপকাঠিতে ও বিরজনের ব্যগ্রতা অনুমান করতে লাগল। আর সেই অনুমান থেকেই ও বেনারস যাবার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলল।

রাত্রি তখন দুটো। চারিদিকে ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। সারা শহরের বুকে নিবিড় নিদ্রা যেন নিশ্ছিদ্র চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। কান পাতলে মাঝে মধ্যে বৃক্ষের শন্ শন্ শব্দ মাত্র শোনা যাচ্ছে। বৃক্ষ আর গৃহগুলো ধোঁয়ার কালো আস্তরণে আপাদমস্তক ঢেকে আছে। আর সেই ধোঁয়ার কালিমায় রাস্তার লণ্ঠনের আলোগুলোকে এমন ভাবে দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যেন মেঘের বুকে লুকোন তারা। প্রতাপচন্দ্র রেলগাড়ী থেকে নামল। এক অনাগত দুর্ভাবনায় ওর হাত পা কাঁপছে, আতঙ্কে বুকটা ধড়ফড় করছে। জীবনে এই প্রথম প্রতাপচন্দ্রের

পাপবোধ অনুভূত হল। তবে দুঃখ যে, হৃদয়ের এই দশা অধিক সময় স্থায়ী হয় না। এবং তা এই দুর্গন্ধময় পথকে পূর্ণ পরিক্রমণ করে তবেই ক্ষান্ত হয়। যে লোক কখনও সুরা পান করেনি, তার সুরার দুর্গন্ধে ঘৃণা জন্মায়; যখন প্রথমবার পান করে তো ঘন্টার পর ঘন্টা তার মুখ বিস্বাদ হয়ে থাকে। তার বিস্ময় লাগে যে কেন লোকে এমন বিষাক্ত এবং বিস্বাদ বস্তুতে আসক্ত হয়! কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার এই ঘৃণা দূর হয়ে যায় আর এই লাল রসে আসক্ত হয়ে পড়ে। পাপের স্বাদ, মদিরার চেয়ে অধিক ভয়ংকর!

অন্ধকারের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ধীরে ধীরে হাঁটছিল। ওর পা গতি-হীন। কারণ পাপের বোধ তাতে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। ওর মুখে সেই নিষ্পাপ আনন্দের কোন লক্ষণই নেই যা ওর চলার গতিকে ত্বরান্বিত করে। চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কিছু ভাবছে, আবার খানিক বাদে এগোচ্ছে। কোন প্রেতাত্মা ওকে যেন পাপের গহ্বরে টেনে নিয়ে চলেছে!

প্রতাপের মাথা দপ্ দপ্ করছিল। আতঙ্কে হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল। ভাবনা চিন্তায় সারাটা পথ উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলতে চলতে ঘন্টা খানেকের মধ্যে ও শ্যামাচরণের বিশাল ভবনের সামনে এসে হাজির হল। অন্ধকারের মধ্যে বিশাল বাড়িটাকে ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। যেন পাপের পিশাচ মূর্তি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়ল। পা দুটোতে যেন হঠাৎ কেউ শেকল বেঁধে দিল। আধঘন্টা ধরে একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ওর ভাবনা হল।···ফিরে যাবে, না ভেতরে ঢুকবে! যদি কেউ দেখে ফেলে তো অনর্থ বেধে যাবে! বিরজনই বা দেখে কি মনে করবে? এমন যেন আবার না হয় যে আমার এই ব্যবহার চিরদিনের জন্যে ওর চোখে আমাকে ছোট করে দেয়। কিন্তু এই সব সন্দেহের ওপর পিশাচের প্রভাব প্রবলতর হল। ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে পড়লে মানুষের ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্যের জ্ঞান লোপ পায়। নিজেকে শক্ত করল প্রতাপ। এই কাপুরুষতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিল বার বার। এবার বাড়ির

পেছনে গিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে বাগানে ঢুকল। বাগান থেকে বাড়িতে যাবার জন্য একটা ছোট দরজা ছিল। দৈবক্রমে তা এ সময়ে খোলাই ছিল। এটা সুলক্ষণ বলেই ওর মনে হল। বস্তুত এটা হল অধর্মের দ্বার। ভেতরে যেতে যেতে ওর সারা দেহ কাঁপছিল। হৃৎপিণ্ড এমন দাপাদাপি করছিল যেন এখুনি বুক থেকে লাফিয়ে পড়বে। দম বন্ধ হয়ে আসছিল প্রতাপের। ধর্ম তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল কিন্তু মনের প্রবল বেগের কাছে তা পরাস্ত হল। দরজার ভেতর প্রবেশ করে উঠোনে তুলসী-মঞ্চের কাছে চোরের মতো দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—বিরজনের সঙ্গে দেখা হবে কেমন করে! বাড়ির সব দরজা কি বন্ধ? বিরজন কি চলে গেছে এখান থেকে?···আকস্মাৎ একটা ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর ঝলক নজরে পড়ল। নিঃশব্দ পায়ে ও সেখানে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।

পরনে সাদা শাড়ী, চুল খোলা, হাতে কলম নিয়ে মাটিতে বসে আছে বিরজন, আর দরজার দিকে তাকিয়ে কাগজে কি লিখছে। যেন কোন কবি ভাবনার সাগর ছেঁচে মুক্তো কুড়িয়ে আনছে। মাঝে মাঝে কলমটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরছে। কিছু ভেবে নিয়ে আবার লিখছে। খানিক লিখে আবার দরজার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকছে। অনেকক্ষণ ধরে প্রতাপ এই বিচিত্র দৃশ্য দেখতে লাগল। মন ওকে বার বার বাধা দিচ্ছিল, এ যেন বিবেকের অন্তিম প্রচেষ্টা। এবার বিবেকের (ধর্মের) পরাস্ত হওয়ার অর্থ কদাচারের (পিশাচের) বিজয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবেকের (ধর্মের) জয় হল। পাপকর্ম থেকে প্রতাপকে বাঁচাল ধর্ম। না হলে এই পাপের গহ্বর থেকে জীবনে কোন দিনই আর বেরিয়ে আসার সৌভাগ্য তার হত না। বরং এ কথাই বলা উচিত হবে, এই মুহূর্তে পাপকর্ম থেকে ওকে বিরত করার হোতা ধর্ম ছিল না, হোতা ছিল অপরিমিত লজ্জার ভীতি। কোন কোন সময় মানুষের সৎবুদ্ধি যখন পরাজিত হয় তখন অপরিসীম লজ্জার ভীতিই তাকে কর্তব্যচ্যুতি থেকে রক্ষা করে। বিরজনের স্বর্ণাভ মুখে

এমন এক দীপ্তি ছড়িয়ে ছিল যা ওর হৃদয়ের পবিত্রতা আর বুদ্ধির প্রাখর্যের পরিচায়ক। ওর মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্য আর দৃষ্টির পবিত্রতার আগুনে প্রতাপের সব অপচেষ্টা ভস্মীভূত হল। ওর লুপ্ত জ্ঞান ফিরে এল আর নিজের আত্মিক পতনের অনুতাপে ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল।

ইন্দ্রিয় যত নিকৃষ্ট ভাবনা ওর হৃদয়ে উপ্ত করেছিল, এই পবিত্র দৃশ্য এমন ভাবে তা লোপ করল, যেমন আলোর আগমনে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। প্রতাপের ইচ্ছে হল, বিরজনের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চায়। কোন মহাত্মা সন্ন্যাসীর সামনে গিয়ে আমাদের মনের যে অবস্থা হয়, তেমনি প্রতাপের হৃদয়ে আপনা থেকেই প্রায়শ্চিত্তের ভাবনার উদয় হল। দুর্বুদ্ধি এতদূর টেনে এনেছিল তাকে কিন্তু আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। ফিরে দাঁড়িয়ে এত দ্রুত বাগানে এসে প্রাচীর ডিঙোল যেন কেউ ওকে পিছন থেকে তাড়া করছে।

অরুণোদয়ের সময় হয়ে গেছিল। আকাশে এখনো তারা ঝলমল করছে। চাককীর ঘর্ ঘর্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। পায়ের শব্দ বাঁচিয়ে লোকর চোখ এড়িয়ে প্রতাপ গঙ্গার দিকে চলল। হঠাৎ মাথায় হাত দিতে দেখল টুপি নেই। পকেটে হাত দিতে বুঝল ঘড়িটা উধাও হয়েছে। বুক চিরে এক হৃদয়বিদারক শব্দ বেরিয়ে এল—আহ্!

কখনো কখনো মানবজীবনে এমন সব ঘটনা ঘটে যায়, যা ক্ষণ-মাত্রেই মানুষের রূপ পরিবর্তিত করে। হয়তো কখনো মাতা পিতার এক পলক তির্যক দৃষ্টি (কঠিন অনুশাসন) পুত্রকে যশের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়। আবার কোন সময় স্ত্রীর সাধারণ একটি শিক্ষা স্বামীর জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন করে। গর্বিত পুরুষ নিজের সঙ্গীদের দৃষ্টিতে অপমানিত হয়ে সংসারের ভার লাঘব করতে চায়। মানুষের জীবনে এই ক্ষণগুলি ঈশ্বরের দান। জীর্ণ-সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়ে প্রতাপ যখন গঙ্গার ধারে এসে বসল, তার জীবনেও এই পরম ক্ষণটি এল, অনুতাপ আর লজ্জায় ওর দু চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকল। মনো-বিকারের প্রেরণাগুলো ওর অধোগতির কোন ত্রুটিই রাখেনি। তবু

কিন্তু এই তাড়না ওর ক্ষেত্রে এক কঠোর কৃপাময় গুরুর কার্য সম্পাদনই করেছে। কাজেই একথা কি প্রমাণিত সত্য নয় যে, কোন কোন সময়ে বিষও অমৃতের কাজ করে?

ধিকি ধিকি জ্বলা আগুনকে হাওয়ার দমক যেমন দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেয়, সেই রকমই হৃদয়ের লুকিয়ে থাকা উৎসাহকে উসকে দেবার জন্য কোন বাহ্য ঘটনার প্রয়োজন হয়। আপন দুঃখানুভূতি এবং অপরের বিপর্যয়ের দৃশ্যে অনেক সময় সেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয় যা সৎসঙ্গ, অধ্যয়ন আর যশ-প্রবৃত্তির দ্বারাও সম্ভব হয় না। যদিও প্রতাপ-চন্দ্রের মনে উত্তম ও নিঃস্বার্থ জীবন অতিবাহিত করার চিন্তা আগে থেকেই ছিল, তবুও মনোবিকারের তাড়না সেই কাজকে মুহূর্তমধ্যে পূর্ণ করল যা পূর্ণ হতে হয়তো অনেক বছর লাগত। স্বাভাবিক অবস্থায় জাতির তথা দেশের সেবা হয়তো ওর কাছে গৌণ কর্ম হয়েই থাকত কিন্তু এই চৈতন্য দেশসেবাকে ওর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করে তুলল। সুবামার মনের অভিলাষ পূর্ণ হবার বীজ মুহূর্তেই উপ্ত হয়ে গেল। এই সকল ঘটনার অন্তরালে কি কোন অজ্ঞাত প্রেরণাদায়িনী শক্তি ছিল? কে বলতে পারে সেকথা?

২১

যখন থেকে মুন্সী সঞ্জীবনলাল তীর্থযাত্রায় বেরোলেন আর প্রতাপ প্রয়াগে চলে গেল তখন থেকেই সুবামার জীবনে বড় রকমের একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ও ঠিকাদারীর কাজে প্রভূত উন্নতি করতে লাগল। মুন্সী সঞ্জীবনলালের সময়ে ব্যবসায় এত উন্নতি কখনও হয়নি। সুবামা রাতের পর রাত বসে বসে ইঁট পাথরে মাথা খাটাতে লাগল। চুন সুরকির চিন্তায় থাকল সব সময় মগ্ন হয়ে। পাই পাই-এর হিসেবে ও এখন পাকা ব্যাপারী। কখনো কখনো কুলিদের কাজ নিজেই দেখাশোনা করত। এই ধরনের কাজে ওর এমন স্পৃহা জন্মাল যে দান-ধ্যান আর ব্রতপাঠে ওর আগের মত আর ভালবাসা রইল না। প্রতিদিন আয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সুবামা

কোন প্রকার ব্যয় বৃদ্ধি করল না। প্রতাপচন্দ্র ধনবান হবে, জীবনভর আনন্দে দিন কাটাবে এই চিন্তায় সুবামা প্রতিটি পাই পয়সা দাঁতে চেপে রাখত।

গুণবান পুত্রগর্বে সুবামা গর্বিত। প্রতাচপন্দ্রের জীবনের গতি সুবামার মনে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করল যে, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে পুত্র কামনা করেছিল নিশ্চয় তা পূর্ণ হবে। কলেজের অধ্যক্ষ আর অধ্যাপকদের কাছ থেকে গোপনে সুবামা প্রতাপচন্দ্রের খবরাখবর সংগ্রহ করত এবং তাঁরা প্রতাপচন্দ্র সম্পর্কে যা বলতেন সুবামার কাছে তা এক সুখকর কাহিনীর মতই হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ই প্রয়াগ থেকে প্রতাপচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার টেলিগ্রাম সুবামার মাথায় বজ্রপাত হানল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তৃতীয় দিনে প্রতাপচন্দ্রের বইপত্র পোশাক-আসাক ও অন্যান্য জিনিস সুবামার কাছে পৌঁছতে, এগুলো যেন ওর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল।

*   *   *

প্রেমবতীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই প্রাণনাথ পাটনা থেকে এবং রাধাচরণ নৈনিতাল থেকে রওনা দিল। ওর জীবদ্দশায় এলে দেখা হয়ে যেত, কিন্তু মরার পর এসেও তার শবদেহ দর্শনের সৌভাগ্যটুকুও তাদের হল না। মৃত্যুকালীন আচার নিয়ম বেশ ধুমধামের সঙ্গে যথাযথই পালন করা হল। গ্রামে তার জের চলল প্রায় দু সপ্তাহ ধরে। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে গেলে পর রাধাচরণ মোরাদাবাদ চলে গেল। এরপর প্রাণনাথ যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগল। ওর ইচ্ছে ছিল সেবতীকে প্রয়াগে পৌঁছে পাটনায় ফিরে যায়। কিন্তু সেবতী জেদ ধরল, এতদূর যখন এসেছে তখন বিরজনের কাছে অবশ্যই যাওয়া উচিত না হলে ও বড় দুঃখ পাবে। ভাববে ওকে অসহায় জেনে এরাও পরিত্যাগ করেছে।

এই নিরানন্দ ভবনে সেবতীর আগমন যেন ফুলের সৌরভ ভেসে আসার মত। সপ্তাহ খানেকের জন্য এই গৃহে সুদিনের শুভাগমন

ঘটল। বিরজন খুব প্রসন্ন হল আর কাঁদলও খুব। মাধবী মুন্নুকে (খোকাকে) নিয়ে খুব আদর করল। বাইরের বৈঠকখানা এতদিন বন্ধই পড়ে ছিল। আজ তারও ভাগ্য ফিরল। উচ্ছন্নে যাওয়া ছন্নছাড়া সংসারটা কয়েক দিনের মধ্যেই আবার যেন নতুন করে গড়ে উঠল।

প্রেমবতী চলে যাওয়ার পর বিরজন এই বিশাল বাড়িটায় একলা থেকে গেছিল। একমাত্র সঙ্গী মাধবী। যে গুণগুলো বিরজনের মনের অন্তরালে এতদিন চাপা পড়েছিল আজ হৃদয়ের তাপ আর মানসিক দুঃখের অভাব তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পদ্য আর কাব্য রচনার অভ্যাসে বিরজন ভরিয়ে তুলল ওর নিঃসঙ্গ দিনগুলো। কবিতা মানুষের সত্যিকার মানসিক চিন্তারই চিত্র। এই সত্য চিন্তা দুঃখেরও হতে পারে বা দুঃখভোগের সেই সময়েও সম্পন্ন হতে পারে যখন দুঃখ বা সহানুভূতি মনকে ভাবায়। ইদানীং বিরজন রাতের পর রাত বসে ভাষায় নিজের মনোভাবের মুক্তোমালা গাঁথত। তার এক একটা কাব্য পরিপূর্ণ হয়ে উঠত করুণা এবং বৈরাগ্যে। অন্যান্য কবিরা বাহ্যিক প্রশংসা আর প্রশস্তির জন্য কাব্য রচনা করে থাকে। কিন্তু বিরজন নিজের দুঃখের কথা শোনাত নিজেকেই।

সেবতীর আসার দু-তিন দিন পার হয়েছে, একদিন ও বিরজনকে বলল—বেশির ভাগ সময়ই তোমায় কোন না কোন চিন্তায় ডুবে থাকতে দেখছি। আমাকে বলবে না তো, কেন? লজ্জা পেল বিরজন। নানান অজুহাত দেখাতে লাগল—না না, ও কিছু নয়। এমনিই খানিকটা আনমনা হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। সেবতী বলল—না না, তোমার একথা আমি মানতে পারছি না। আর মানবও না। কবিতার মুক্তোরাজি যে বাক্সে সংগ্রহ করা ছিল সেটা সেবতী উঠিয়ে নিয়ে এল। বাধ্য হয়েই বিরজন কবিতা পড়তে শুরু করল। কবিতার প্রথম পংক্তি শুনতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল সেবতীর। কবিতা পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। প্রাণনাথের সঙ্গ ওকে কাব্যরসিক করে তুলেছিল। কবিতা শুনতে শুনতে বার বার ওর চোখে জল ভরে আসছিল। বিরজন থামতে ওর

মনে হল যেন এক মনোহর রাগিনী এতক্ষণ এক মধুর সুরের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শেষ হওয়ার পরও যার রেশ ওর কানে বাজছে। আনন্দে বিরজনের গলা জড়িয়ে ধরল সেবন্তী। তারপর ছুটে গেল প্রাণনাথের কাছে। এ যেন কোন শিশু নতুন খেলনা পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে বন্ধুদের কাছে ছুটে চলেছে তার নতুন খেলনা দেখাতে। প্রাণনাথ তখন ওর উর্ধ্বতন অফিসারের কাছে আবেদন পত্র লিখছিল —মায়ের গুরুতর অবস্থার জন্য কাজে হাজিরা দিতে এক সপ্তাহের মত দেরী হতে পারে অতএব এ কদিনের ছুটি যেন মঞ্জুর করা হয়। সেবন্তীকে দেখে ও তাড়াতাড়ি দরখাস্তটা লুকিয়ে নিয়ে হাসতে লাগল। মানুষ কেমন ধূর্ত হয়! সে নিজেকেও প্রতারিত করতে কসুর করে না।

সেবন্তী—একটু ভেতরে চল, তোমাকে বিরজনের কবিতা শোনাব, চম্‌কে উঠবে।

প্রাণনাথ—আচ্ছা, ওর তাহলে এখন কবিতার শখ হয়েছে? ওর বৌদি তো গান গাইত, তুম শ্যাম বড়ে বেদরদ হো…(শ্যাম তুমি বড় নির্দয়)

সেবন্তী—গিয়ে আগে শোন, তারপর যত খুশি হেস। ওর কবিতা শুনে আমার তো আশ্চর্য লাগছে!

প্রাণ—তুমি যাও, একটা চিঠি লিখে আমি এক্ষুনি আসছি।

সেবন্তী—এখন এসব আমার ভাল লাগছে না। তোমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলবো।

প্রাণনাথকে টেনে নিয়ে এল সেবন্তী। প্রাণনাথ ভেবেছিল বিরজন কোন সাধারণ ভজন তৈরী করেছে হয়তো। তাই শোনাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভেতরে এসে বসতে, বিরজন লজ্জানত মুখে ওর ভাবপূর্ণ কবিতা 'প্রেমের পাগলিনী' পড়তে আরম্ভ করল। শুনতে শুনতে অবাক মানল প্রাণনাথ। চোখ খুলে গেল ওর। এ তো সাধারণ পদ্য নয়! হৃদয়বেদনার এক বিমূর্ত ধারা, যেন প্রেম আর বিরহের সকরুণ গাথা। ও শুনছিল আর মুগ্ধ হয়ে দুলছিল। এক একটি শব্দের

প্রয়োগে, ভাবের বিহ্বল প্রকাশে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিল। অনেক কবির কাব্য ও পড়েছে। কিন্তু এই উদার চিন্তা, এই নতুনত্ব, এমন ভাবোৎকর্ষ, কোন কাব্যেই ও অনুভব করেনি। ওর ভাবনায় এ সময়ে এক অপূর্ব ছবি চিত্রিত হচ্ছিল—যেন অরুণোদয়ের আগে মলয়ানিল বয়ে চলেছে, ফুলের কলি প্রস্ফুটিত হয়ে সুগন্ধ বিলোচ্ছে আর আকাশ ছেয়ে গেছে মৃদু লালিমায়। এক একটি শব্দে, নব বিকশিত পুষ্পের শোভা সঙ্গে হিম কিরণের শীতলতা অনুভূত হচ্ছিল। তার ওপর বিরজনের মধুর সুরারোপ আর ধ্বনির মাধুর্য সোনায় সোহাগ ঢেলে দিল। এ যেন সেই ছন্দ যার সৃষ্টিতে বিরজন হৃদয়কে প্রদীপের মত জ্বালিয়ে ছিল। হাসিমস্করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাণনাথ এসেছিল।··· কিন্তু যখন কবিতার সারমর্ম উপলব্ধি করল তখন মনে হল যেন বুক চিরে ওর হৃদয় বেরিয়ে গেছে। পরে একদিন বিরজনকে বলল—যদি তোমার কবিতা ছাপা হয় তাহলে খুব সম্মান পাবে।

বিরজন মাথা নিচু করে বলল—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে কারো এগুলো পছন্দ হবে।

প্রাণনাথ—এও সম্ভব না!কি! যদি কারো হৃদয়ে কিছুমাত্র রসবোধ থেকে থাকে তো তোমার কাব্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠা পাবে। এমন কোন মানুষ যদি থাকে, ফুলের সুগন্ধ যাকে আমোদিত করে, পাখীর কলরব আর জ্যোৎস্নার মনোহারিণী ছটায় যে আনন্দিত হয় তবে সে তোমার কবিতাকে নিশ্চয় হৃদয়ে স্থান দেবে। কাব্যচিন্তার প্রশংসায় আর তা মুদ্রিত হওয়ার আনন্দে প্রত্যেক কবিই যেমন শিহরিত হয়ে ওঠে বিরজনও তেমন আত্মকাব্যের প্রশস্তির আনন্দে শিহরিত হয়ে উঠল। যদিও সে এ ব্যাপারে অসম্মত হচ্ছিল কিন্তু তাতে তার সম্মতির প্রকাশ ছিল যথেষ্টই। সে সময়ে প্রয়াগ থেকে 'কমলা' নামে একটা পত্রিকা বেরোত। প্রাণনাথ 'প্রেমের পাগলিনী' কবিতাটা ওই পত্রিকায় পাঠিয়ে দিল। 'কমলা'র সম্পাদক এক কাব্য-রসিক মানুষ। কবিতার জন্য বিরজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর কাব্যজগতে বেশ হৈচৈ পড়ে গেল। কদাচিৎই কোন কবির প্রথম

কাব্যে এমন খ্যাতি জুটেছে। লোকে পড়ত আর বিস্ময়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাত। কাব্য-প্রেমীদের মধ্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে "প্রেমের পাগলিনী" কবিতার আলোচনা চলল। কারো বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে এটি কোন নবাগত কবির রচনা!

এরপর, প্রতিমাসেই 'কমলা'র পৃষ্ঠা বিরজনের কাব্যে সুশোভিত হতে থাকল। এবং জনগণের অভিমত 'ভারত-মহিলা'কে কবিদের সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করল। 'ভারত মহিলা'র নাম এখন বাচ্চাদেরও মুখে মুখে ফেরে। এমন কোন সংবাদপত্র বা পত্রিকা নেই যেটি 'ভারত মহিলা'র রচনার জন্য ইচ্ছুক নয়। কাগজ খুলেই পাঠকের চোখ ভারতমহিলাকে খুঁজে বেড়ায়। ওর দিব্যশক্তি এখন আর কাউকে বিস্মিত করে না। ও স্বয়ং কবিতার আদর্শকে এতটাই উচ্চ মার্গে পৌঁছে দিয়েছে।

তিন বছর ধরে কেউই জানতে পারেনি 'ভারত-মহিলা' কে? অবশেষে প্রাণনাথ আর চুপ করে থাকতে পারল না। বিরজনের প্রতি ওর এক অচলা ভক্তি জন্মে গেছিল। কয়েক মাস ধরেই ও বিরজনের জীবনচরিত লেখার ভাবনায় ছিল। সেবতীর মাধ্যমে বিরজনের জীবনের সব কিছুই ও জেনে নিল আর তারই সূত্র ধরে ও লিখল 'ভারত মহিলা' সম্পর্কে এক অনবদ্য ভাবগম্ভীর প্রবন্ধ। আগে কখনো প্রাণনাথ প্রবন্ধ লেখেনি। কিন্তু শ্রদ্ধা, অভ্যাসের খামতি পূরণ করে। প্রবন্ধ হল যেমন সাবলীল ও সুন্দর তেমনিই সমালোচনামূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া মাত্র চারিদিক থেকে প্রতিষ্ঠিত কবির সম্মান ও উপহার মিলতে লাগল বিরজনের। রাধাচরণ মোরাদাবাদ থেকে এল দেখা করতে। কমলা, উমাদেবী, চন্দ্রকুঁয়র আর পুরোন কত সখী প্রতিদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগল যারা এতদিন ওকে ভুলে গেছিল। বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, যারা আত্মমর্যাদার গর্বে হাকিমের কাছে পর্যন্ত মাথা নত করেনি কোনদিন, বিরজনের দরজায় ধর্ণা দিতে লাগল তার দর্শন পাবার জন্য। চন্দ্রা নিজে আসতে পারেনি। কিন্তু চিঠিতে লিখেছে—মন চাইছে তোমার

পায়ে মাথা রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা কাঁদি।

২২

কখনো কখনো বনের ফুলে সেই সুগন্ধ আর রঙ, রূপ পাওয়া যায় যা সাজানো বাগানের ফুলে পাওয়া যায় না। মাধবী তো ছিল এক মূর্খ আর গরীবের মেয়ে। কিন্তু বিধাতা ওকে নারীর সব উত্তম গুণগুলো দিয়েই সুশোভিত করে গড়ে ছিলেন। ওর মধ্যে ছিল শিক্ষা আর সদ্বস্তুকে গ্রহণ করার বিশেষ যোগ্যতা। শ্বশুরবাড়ি আসার সময়ই মাধবী আর বিরজনের মিলন ঘটেছিল। এই সাধাসিধে মেয়েটি তখন থেকেই বিরজনের প্রতি অ-সাধারণ প্রীতি দেখাতে শুরু করে। ওকে দেবী ভাবত কিনা জানা নেই। তবে কখনও বিরজনের বিরুদ্ধে ও একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। বিরজনও ওর প্রতি স্নেহশীল হয়ে ওকে নিজের কাছটিতে শোয়াত। ভাল ভাল রেশমী কাপড় পরিয়ে সাজাত। এর চেয়ে অধিক প্রীতি নিজের ছোট বোনকেও বোধহয় সে করতে পারত না। মনের সম্বন্ধ হয় মনেরই সঙ্গে। প্রতাপের যদি বৃজরাণীর প্রতি আন্তরিক টান থেকে থাকত তো বিরজনও প্রতাপের ভালবাসায় নিমজ্জিত ছিল। যখন কমলাচরণের সঙ্গে ওর বিবাহের কথা পাকা হল তখন প্রতাপচন্দ্রের চেয়ে ও কম দুঃখী হয়নি। তবে লজ্জাবশতঃ ওর মনের ভাব কখনও প্রকাশ পেত না। বিয়ে হয়ে যাবার পর সর্বদাই ও প্রতাপচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন থাকত। সর্বদাই ভাবত প্রতাপের আহত হৃদয়কে কেমন করে সান্ত্বনা দেবে। ওর জীবন তো এভাবে আনন্দেই কাটছে। না জানি প্রতাপের মনের ওপর দিয়ে কি ঝড় যাচ্ছে। মাধবী সে সময়ে এগার বছরের কিশোরী। ওর রঙ রূপের সৌন্দর্য, স্বভাব আর গুণ দেখে বিরজন অবাক হত। বিরজনের অকস্মাৎ মনে হল—আমার মাধবী কি এমন যোগ্য নয় যে প্রতাপ ওকে গলার হার করে? সেদিন থেকেই বিরজন মাধবীর সংস্কার এবং ভালবাসায় আরও প্রবৃত্ত হল। ভেবে ভেবে ওর গর্বের শেষ থাকত না যে, মাধবী যখন ষোল-সতের বছরের হয়ে যাবে তখন ও প্রতাপের কাছে গিয়ে

জোড় হাত করে বলবে—মাধবী আমার বোন। ওকে তোমার দাসী করে নাও। প্রতাপ কি আমার কথা অগ্রাহ্য করবে? না, ও এমন করতে পারে না। আনন্দ তো তখন হবে, কাকীমা যখন ওকে নিজের পুত্রবধূ করার ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। এই চিন্তাতেই বিরজন মাধবীর মনে প্রতাপের গুণগুলো আঁকতে শুরু করে দিয়েছিল। যাতে ওর অণু-পরমাণু প্রতাপের প্রেমে দ্রবীভূত হয়। ও যখন প্রতাপের কথা বর্ণনা করত, স্বাভাবিক ভাবেই তা রূপে রসে আর মাধুর্যে ভরে যেত। ধীরে ধীরে মাধবীর কোমল হৃদয় প্রতাপের প্রতি প্রেমরসের আস্বাদন করতে লাগল। নিষ্পাপ কিশোরীর হৃদয় চিরে যৌবনের উন্মেষ ঘটল।

সরলা মাধবী ভাবত—আমি কত ভাগ্যবতী। এমন স্বামী আমার হবে যার চরণ ধোওয়ার যোগ্যই আমি নই। কিন্তু উনি কি আমাকে ওনার দাসী করতে চাইবেন! যাহোক, আমি ওঁর দাসী নিশ্চয় হব, আর যদি আমার প্রেমে আকর্ষক কিছু থেকে থাকে তো অবশ্যই ওনাকে আমি নিজের করে পাব। কিন্তু বেচারীর কি জানা ছিল যে ওর এই সকল আশা একদিন শোকে রূপান্তরিত হয়ে চোখের জল হয়ে বয়ে যাবে? ওর পনের বছর পূর্ণ হতে না হতেই বিরজনের ঘর ভেঙে যাবার বিপত্তিগুলো এসে হাজির হল। আর সেই ঝঞ্ঝার দাপটে ওর কল্পনার কুসুমকানন ধ্বংস হয়ে গেল। এরই মধ্যে প্রতাপচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হবার খবর পাওয়া গেল। বিপত্তির ঝঞ্ঝা যেটুকু বা আশা রেখেছিল এই সংবাদ তাতে অগ্নি সংযোগ করে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করল।

কিন্তু মন এমনই বস্তু যে, মাধবী মনে মনে প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রী হয়ে গেছিল। ওর তনু-মন ও প্রতাপচন্দ্রেই সমর্পণ করে বসেছিল। এমনই অমূল্য ধন সে লাভ করেছে, যার সঙ্গে জগতের কোন কিছুরই তুলনা করা চলে না। অবশ্য একথা প্রতাপের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। মাত্র একবারই সে প্রতাপকে দেখেছে আর তার অমৃত সমান কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। তবু সেই ক্ষণেক দেখা ছবিকে সে মনের মুকুরে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল। যে ছবি বিরজন ওর

মনে আগেই এঁকেছিল। একথাও প্রতাপের অজ্ঞাত, যে মাধবী ওরই প্রেমাগ্নিতে দিনে দিনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। এমন কোন ব্রত নেই যা মাধবী সেদিন থেকে পালন করেনি। এমন কোন ঈশ্বর নেই যাঁর পুজো ও করত না। ঈশ্বরের কাছে ওর একটিই প্রার্থনা, প্রতাপ যেখানেই থাকুক যেন ভাল থাকে। এই প্রেমের সাধনা বালিকা মাধবীকে আরও বেশি দৃঢ়, সুশীল আর কোমল করল। সম্ভবতঃ ও মনে মনে একথাই ভেবে নিয়েছিল যে প্রতাপের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। মাধবীর এই দশা দেখে বিরজন কাঁদত, এ আগুন তো সে নিজেই জ্বালিয়েছে! হায়, এই নব কুসুম কার গলার মালা হবে! কার সর্বস্ব ধন হবে! যে বীজকে এত যত্নে এত পরিশ্রমে অঙ্কুরিত করেছে সে, স্নেহরসে যাকে সিঞ্চিত করেছে, তার ফুল কি শেষে শাখাতেই শুকিয়ে মরবে! বিরজন তো তবু কবিতা রচনায় মগ্ন হতে পারত। কিন্তু মাধবীর জীবনে এ বিলাসটুকুও ছিল না। ওর প্রিয়তমের চিন্তাই ছিল ওর প্রেমিক আর সাথী। যে প্রিয়তম সর্বতোভাবেই ওর অপরিচিত। প্রতাপ নিরুদ্দেশ হবার বেশ কয়েক মাস বাদে মাধবী স্বপ্ন দেখল ও সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। এইক্ষণেই মাধবীর আগাধ প্রেম পরিপূর্ণতা পেল, সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এক দৈববাণী যেন ওর কানে বেজে উঠল—প্রতাপ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে। সেদিন থেকে ও তপস্বিনীর জীবন গ্রহণ করল। হৃদয় থেকে সুখ আর বিলাসের আকাঙ্ক্ষাকে দূর করে দিল।

যদি কখনো বসে বসে মন খুব ব্যাকুল হয়ে উঠত, ও প্রতাপের বাড়ি চলে যেত। ওখানে ওর মন কিছুটা শান্তি পেত। প্রতাপের গৃহ ছিল ওর কাছে এক পবিত্র মন্দির। যতদিন বিরজন আর সুবামার মনে একটা জট পাকিয়ে ছিল মাধবী এ বাড়িতে কম আসা যাওয়া করত। কিন্তু যেদিন বিরজনের, পবিত্র ও আদর্শ জীবন এই জটকে খুলে দিল আর গঙ্গা যমুনার মত পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হল, সেদিন থেকেই মাধবীর আসা বেড়ে গেল। সুবামার কাছে ও সারাটাদিন বসে থাকত। এই বাড়ির প্রতিটি জায়গায় প্রতাপের

স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই আঙিনাতেই প্রতাপ কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলা করেছে। এই পুকুরেই ও কাগজের নৌকো ভাসিয়েছে। কাগজের নৌকো কালের স্রোতে ডুবে গেছে। কিন্তু কাঠের ঘোড়া আজও বর্তমান। মাধবী তার জর্জরিত অস্থিগুলোতে প্রাণ ঢেলে দিল। ওটাকে নিয়ে এসে বাগানের পুকুরের ধারে একটা পারুল গাছের ছায়ায় বেঁধে দিল। প্রতাপের শোবার ঘর এখন মাধবীর কাছে দেবতার মন্দির। এই সেই পালঙ্ক যা প্রতাপকে দীর্ঘকাল নিজের অঙ্কে আদর করে ঘুম পাড়িয়েছে! মাধবী এখন পালঙ্কটাকে ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখে। দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোকে ধুলোমুক্ত করে ঝক্‌ঝকে করে তুলল। লণ্ঠনটাকে আবার জ্বালিয়ে তুলল। মাধবীর এই অনন্ত প্রেম ভক্তিতে সুবামার সব দুঃখ দূর হয়ে গেল। সর্বদাই ওর মুখে প্রতাপের নাম উচ্চারিত হত। বিরজনের সঙ্গে সুবামার মিলন হল বটে, কিন্তু কখনও এই দুই নারীর মধ্যে প্রতাপচন্দ্রের আলোচনা হত না। বিরজন সঙ্কুচিত থাকত লজ্জায় আর সুবামা ক্রোধে। কিন্তু মাধবীর প্রেমানলে ক্রোধের পাথরও গলে যেত। কখনও প্রেমবিহ্বল হয়ে মাধবী প্রতাপের বাল্যকালের কথা জানতে চাইলে সুবামা না বলে থাকতে পারত না। ওর চোখে জল ভরে আসত। দুজনেই যখন কাঁদত আর সারাদিনেও প্রতাপের কথার শেষ হত না, এমন অবস্থায় মাধবীর মনের দশা সুবামার কাছে কি গোপন থাকতে পারে? প্রায়ই সুবামা ভাবত—এই ভাবেই কি এই তপস্বিনী প্রেমের আগুনে জ্বলবে, তাও বিনা আশাতেই? একদিন বৃজরাণী 'কমলা'র প্যাকেট খুলল। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই বিবিধ রঙে রঙীন এক প্রতিভাদীপ্ত ছবি দেখতে পেল। ছবিটা কোন মহাত্মা ব্যক্তির। ওর মনে হল এই মহাত্মাকে কোথায় যেন ও দেখেছে। ভাবতে ভাবতে ওর চিন্তা প্রতাপচন্দ্রে গিয়ে পৌঁছাল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ওর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, জোরে ডেকে উঠল—মাধবী! মাধবী ফুলের বাগানে জল দিচ্ছিল। এই কাজেই ছিল ওর আনন্দ। বিরজনের ডাক শুনে জলে ভেজা শাড়ি নিয়েই ও ছুটে এল। চুল আলুথালু, মাথায় কপালে স্বেদবিন্দু, চোখ দুটো

ভালবাসায় টলটল করছে। বিরজন বলল—আয়, তোকে একটা ছবি দেখাই।

মাধবী বলল—কার ছবি দেখি? মন দিয়ে ছবিটা দেখল মাধবী। ছবি দেখতে দেখতে ওর দু চোখ জলে ভরে এল।

বিরজন—চিনতে পারলি?

মাধবী—চিনতে পারব না কেন? এই রূপ তো স্বপ্নে আমি কয়েক বারই দেখেছি। মুখ থেকে সেই স্বর্গীয় জ্যোতি ঝরে পড়ছে!

বিরজন—দেখ। ওঁর সম্বন্ধে লিখেছেও।

মাধবী দ্বিতীয় পাতা ওল্টাতে 'স্বামী বালাজী' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখতে পেল।

কিছুক্ষণ ধরে দুজনে তন্ময় হয়ে সেই প্রবন্ধ পড়ল। তারপর তা নিয়ে দুজনে আলোচনা করতে লাগল।

বিরজন—আমি তো প্রথমেই জেনে গেছিলাম যে উনি সন্ন্যাস নিয়েছেন।

মাধবী উত্তর না দিয়ে চুপচাপ মাটির দিকে চেয়ে বসে রইল।

বিরজন—তখন আর এখনের মধ্যে কত তফাত! মুখের সৌম্য কান্তি যেন ছলকে উঠছে!

মাধবী—হুঁ।

বিরজন—ঈশ্বর ওঁকে সাহায্য করুন। অনেক তপস্যা করেছেন। (চোখে জল ভরে) কেমন সংযোগ! আমি আর উনি একসঙ্গে কত খেলা করেছি! একসঙ্গে থেকেছি! আজ উনি সন্ন্যাসী আর আমি বিয়োগিনী (বিধবা)। না জানি আমাদের খেয়াল ওঁর আছে কিনা! সন্ন্যাস যে নিয়েছে কার জন্যে তাঁর কোন চিন্তা! কাকীমার কাছেই যখন কোন খবর দেয়নি তখন আমার খেয়াল কি ওঁর থাকবে? জানিস মাধবী, ছেলেবেলায় যখন উনি কোন সময় যোগী-যোগী খেলা করতেন, তখন মিষ্টি দিয়ে ওঁকে ভিক্ষে দিতাম।

মাধবী কাঁদতে কাঁদতে,—না জানি কবে ওঁর দর্শন পাব—কথাটা বলে ফেলেই লজ্জায় মাথা নিচু করল।

বিরজন—শীগগিরই আসবেন। যাই বল,…প্রাণনাথ কিন্তু প্রবন্ধটা খুব সুন্দর লিখেছে।

মাধবী—প্রতিটি শব্দ দিয়ে যেন ভক্তি ঝরে পড়েছে।

বিরজন—বক্তৃতার কেমন প্রশংসা করেছে। ওঁর কথায় আগে থেকেই যাদু ছিল। এখন তো আর কথাই নেই। প্রাণনাথের মনে যাঁর বাণীর এমন প্রভাব পড়েছে তিনি সমস্ত পৃথিবীতেই নিজের যাদু বিছিয়ে দিতে পারেন।

মাধবী—চল কাকীমার কাছে যাই।

বিরজন—হ্যাঁ, ওঁর খেয়াল তো হয়নি আমার! দেখি কি বলেন, খুশী কি হবেন?

মাধবী—খুশী কেন হবেন না? ওঁর অভিলাষই তো এই ছিল।

বিরজন—যাঃ! মা কখনো এমন খবর শুনে খুশী হতে পারে! মাধবীর প্রতিটি অঙ্গে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি ওকে এখন জিগগেস করে—তোর পা মাটিতে পড়ছে না কেন? সোনার বরণ মুখে প্রসন্নতার লাল আভা ঝিলিক দিচ্ছে, কারণ কি? কোন ঐশ্বর্য কি মিলেছে? শোকে বিহ্বল তোর সে উদাসীনতা কোথায় গেল? প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশা আর তোর নেই। কখনও সে তোর দিকে প্রেমের দৃষ্টিটুকুও ফেলেনি। তবু কেন তুই গর্বে এমন ডগমগ? মাধবী এর কি উত্তর দেবে? কিচ্ছু না। ও শুধু মুখটা নিচু করে নেবে। লজ্জায় দৃষ্টি মাটিতে ঝুঁকে পড়বে। কখনও তার থেকে হয়তো অশ্রুবিন্দু মুক্তোর মতো ঝরে পড়বে। তবু ওর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোবে না।

প্রেমের গর্বে মাধবী পাগল। ওর হৃদয় প্রেমে উন্মত্ত। হাটের সওদা নয় ওর প্রেম। কোন কিছুর জন্য ক্ষুধার্তও নয়। প্রেমের বিনিময়ে প্রেম চায় না মাধবী। ওর এতেই গর্ব যে এমন পবিত্র আত্মার মূর্তি ওর হৃদয়ে প্রকাশমান। এই গর্বই ওর উন্মত্ততার কারণ। এ ওর প্রেমের পুরস্কার।

পরের মাসে বৃজরাণী 'স্বামী বালাজী'কে স্বাগত জানিয়ে এক

আবেগময় কবিতা লিখল। এটা ছিল এবারের সংখ্যার বিশেষ রচনা। কবিতাটি মুদ্রিত হবার পর বিদ্বদজন বিরজনের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হয়ে চমৎকৃত হল। এ সেই কল্পনারূপী পক্ষী. যা এতদিন কাব্যগগনের বায়ুমণ্ডলকেও ছাড়িয়ে যেত, এখন তা তারা হয়ে আকাশে ঝলমল করতে লাগল। প্রতিটি শব্দ যেন দৈববাণীর প্রাখর্যে ভাস্বর। যারা এই কবিতা পাঠ করল তারা বালাজীর ভক্ত হল। এ কবি সেই সাপুড়ে যার ঝুড়িতে সাপের স্থানে হৃদয় বন্ধ থাকে।

২৩

যখন থেকে বৃজরাণীর কাব্য-চন্দ্রের উদয় হল, ওর গৃহে সর্বদাই মহিলাদের ভিড় লেগে থাকত। শহরে মেয়েদের কয়েকটা সংস্থা ছিল। সেগুলো পরিচালনা করার পুরো ভার ওকে বহন করতে হত। তাছাড়া অন্যান্য শহর থেকেও মহিলারা ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তীর্থযাত্রা করতে কাশীতে যিনিই আসতেন বিরজনের সঙ্গে দেখা না করে যেতেন না। রাজা ধর্মসিংহ ওর কবিতাগুলোর একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর সংগ্রহ প্রকাশিত করেছিলেন। ওই কাব্য-সংগ্রহই ওর প্রতিভার জয়নিনাদ ঘোষণা করে। য়ুরোপ আর আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত কবিরা বিরজনকে ওর সুললিত কাব্য রচনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন, কোন এক ভারতীয়ই একথা বলে। ভারতবর্ষে হয়তো এক-আধজন কাব্যরসিক থেকে থাকবেন যাঁদের সংগ্রহে বিরজনের কাব্যগ্রন্থ স্থান পায়নি। ওর কাব্যের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম যিনি ছিলেন, তিনি স্বামী বালাজী। উনি ওঁর প্রভাবশালী বক্তৃতা এবং প্রবন্ধগুলিতে প্রায়শই বিরজনের কাব্য-বাক্যগুলির প্রয়োগ করেছেন। একবার 'সরস্বতী' পত্রিকায় ওর কাব্য সংগ্রহের সবিস্তার সমালোচনাও লিখেছিলেন।

একদিন সকালে সীতা, চন্দ্রকুমারী, রুক্মিণী আর রাণী বিরজনের বাড়িতে এল। চন্দ্রা মেয়েদের ফরাসে বসিয়ে খাতির যত্ন করল। বিরজন ওখানে ছিল না। কারণ সকালবেলাটা ও ওর কাব্যচর্চায়ই

মগ্ন থাকত। এ সময়ে ও কখনো বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করত না। বাগানে একটা সুন্দর কুঞ্জ ছিল। গোলাপের সুগন্ধে ভরা বাতাস বইত এখানে। বিরজন এই কুঞ্জে একটা পাথরের ওপর বসে কাব্য রচনা করত। কাব্যের সমুদ্র থেকে যে সব মুক্তো ছেঁচে আনত, মাধবী সেগুলোকে লেখনীর মালায় গেঁথে তুলত। আজ অনেক দিন বাদে, নগরবাসীদের অনেক অনুরোধ উপরোধে বিরজন, বালাজীকে কাশীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে লেখনী উঠিয়েছিল। বেনারসই সেই নগর একমাত্র যার স্মৃতি কখনও কখনও বালাজীকে ব্যাকুল করে তোলে। কিন্তু কাশীবাসীদের নিরন্তর আগ্রহ প্রকাশ সত্ত্বেও এখানে আসার অবকাশ ওনার মিলছিল না। সিংহল থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত উনি ছুটে গিয়েছেন! কিন্তু কাশীর দিকে কখনও ফিরেও তাকাননি। কারণ কাশী-নগরকে উনি ওঁর পরীক্ষাগার বলে মনে করতেন। এই জন্যই বিরজনের এই আমন্ত্রণ। নগরবাসীর বিশ্বাস যে এই আমন্ত্রণ ওঁকে নিশ্চয়ই কাশীতে টেনে আনবে। যখন কোন নতুন ভাবনার উদয় হয়, বিরজনের চন্দ্রানন ঝলমল করে ওঠে আর মাধবীর মুখে প্রসন্নতা ঝল্‌কে ওঠে। বাগানে অসংখ্য লাল ফুল ফুটে আছে। রাত্রের ঝরা শিশিরের সঙ্গ ফুলগুলোকে পরম রমণীয় করে তুলেছে। কিন্তু যে উজ্জ্বল ছটা ওদের দুজনের মুখের ওপর ছড়িয়ে আছে তা দেখে অন্য ফুলেরা লজ্জায় আনত হয়ে পড়েছে।

প্রায় ন'টা নাগাদ বিরজন ঘরে এল। সেবতী বলল—আজ যে বড় দেরী করলে?

বিরজন—কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করার জন্য কত তপস্যা করেছিলেন?

সীতা—বালাজী বড় নিষ্ঠুর আমি তো এমন লোকের সঙ্গে কখনো কথা বলব না।

রুক্‌মিণী—যে সন্ন্যাস নিয়েছে, ঘর-দোরের সঙ্গে তার কিসের সম্পর্ক?

চন্দ্রকুঁবর—উনি আসলে পরে সোজা মুখের ওপর বলে দেব যে,

মশায়, এসব ছলাকলা কোথায় শিখেছেন ?

রুক্‌মিণী—মহারাণী ! ঋষি মহাত্মাদের সম্মান দিয়ে কথা বল। জিভ্‌টা কি তোমার কাঁচি ?

চন্দ্রকুঁয়র—তাছাড়া কি। কতদিন আর ধৈর্য্য ধরব ? সব জায়গাতেই যাচ্ছেন। এখানে আসতেই হাঁপিয়ে ওঠেন ?

বিরজন—(হেসে) এবার খুব শীগ্‌গিরই দর্শন পাবে। আমার বিশ্বাস এই মাসে উনি অবশ্যই আসবেন।

সীতা—ধন্য ভাগ্য, যে ওনার দর্শন মিলবে। আমি যখন ওঁর বৃত্তান্ত পড়ি তখন প্রাণ চায় যে, ওঁর পা ধরে ঘন্টার পর ঘন্টা কাঁদি।

রুক্‌মিণী—ভগবান ওঁর ভাগ্যে অনেক যশ দিয়েছেন। দারা নগরের রাণী সাহেবা মারা যাচ্ছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস পড়তে না পড়তেই বালাজীর কাছে খবর গেল। তক্ষুনি উনি ছুটে এলেন। এসেই সেই মুহূর্তেই ওঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলেন। আমাদের মুন্সীজী (স্বামী) সেই সময় ওখানেই ছিলেন। বলেছিলেন যে, রাণীজী কোষাগারের চাবি বালাজীর পায়ে রেখে বললেন—আপনিই এর মালিক। উত্তরে বালাজী বললেন—ধনের আমার প্রয়োজন নেই। আপনি রাজ্যের তিনশো গোশালা খুলিয়ে দিন। মুখ থেকে বেরোতেই যা দেরী। আজ দারা নগরে দুধের নদী বইছে। এমন মহাত্মা কে হবে ?

চন্দ্রকুঁয়র—রাজা নওলক্ষার রাজযক্ষ্মা ওঁরই ওষুধে সারল। সব বৈদ্য, ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছিল। যখন বালাজী রওনা হলেন মহারাণী নয় লক্ষর মুক্তোর মালা ওঁর পায়ের ওপর রেখে দিলেন। বালাজী ওটাকে দেখলেন না পর্যন্ত।

রাণী—কেমন রস্‌কস্‌হীন মানুষ রে বাবা !

রুক্‌মিণী—হ্যাঁ, তাছাড়া আর কি ? ওঁর উচিত ছিল হারটাকে নিয়ে নেওয়া, না না, একেবারে গলায় পরে নেওয়া।

বিরজন—না, ওটাকে নিয়ে রাণীর গলায় পরিয়ে দেওয়া, কি সই, তাই না ?

রাণী—হ্যাঁ, ওই হারের জন্য আমি দাসখত লিখে দিতাম।

চন্দ্রকুঁয়র—আমার বর তো এদিকে ভারত সভার সভ্য হয়ে বসেছেন। অনেক যত্নে আড়াইশোটা টাকা রেখে দিয়েছিলেন ঘোড়া কিনবেন বলে। উনি সে টাকা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ভারত সভার সভ্যরা কি বিনা ঘোড়ায় চলেন না?

রাণী—কাল ওঁরা সার বেঁধে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারি ভাল লাগছিল।

ইতিমধ্যে সেবতী নতুন খবরের কাগজ নিয়ে এলো।

বিরজন জিগ্‌গেস করল—কোন তাজা খবর আছে?

সেবতী—হ্যাঁ, বালাজী মাণিকপুর এসেছেন। এক আহীর তার মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছিল। সেজন্য প্রয়াগের ভারত সভার সভ্যদের সঙ্গে রাত্রে রওনা হয়ে আজ মাণিকপুরে পৌঁছেছেন। আহীর খুব উৎসাহ আর সমারোহের সঙ্গে ওঁকে স্বাগত জানিয়েছে, আর সবাই মিলে পাঁচশো গরু দান করেছে। বালাজী বধুকে আশীর্বাদ করেছেন আর বরকে বুকে টেনে নিয়েছেন। পাঁচজন আহীর ভারত সভার সভ্যও হয়েছে।

বিরজন—বড় ভাল খবর। মাধবী এটাকে কেটে রেখে দিও। আর কিছু?

সেবতী—পাটনার পাসীরা (এক অন্ত্যজ জাতি—অনু) একটা মন্দির তৈরী করিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে ওখানকার ভারত সভা খুব ধুমধামের সঙ্গে উৎসব করেছে।

বিরজন—পাটনার লোকেরা বড় উৎসাহের সঙ্গেই কাজ করছে।

চন্দ্রকুঁয়র—হ্যাঁ, রাখালিনীরাও এখন থেকে সিঁদুর পরবে। পাসীরা ঠাকুরবাড়ী বানাবে।

রুক্‌মিণী—কেন ওরা কি মানুষ নয়? ঈশ্বর ওদের তৈরী করেননি? তুমিই শুধু নিজের প্রভুর পূজো করতে জান?

চন্দ্রকুঁয়র—আরে যাও। আমাকে পাসীদের সঙ্গে তুলনা করছ। এসব আমার ভাল লাগে না।

রুক্মিণী—হ্যাঁ তোমার রঙ্ ধলা তো! আর গয়না পোশাকেও সেজেছ। ব্যস্ তফাত এইটুকুতেই। আর কিছুতে?

চন্দ্রকুঁয়র—এটুকুই তফাত! মাটিকে (জমিকে) আকাশের (আশমান) সঙ্গে মেলাচ্ছ! এ আমার ভাল লাগে না। আমি কছবাহদের বংশের। সে খবর রাখ?

রুক্মিণী—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। আর না জেনে থাকলে এখন তো জেনে গেলাম। তোমার ঠাকুর সাহেব কোন পাসীর চেয়ে ভাল মল্ল যুদ্ধ করতে পারবেন? ওরা শুধু ডাঁট দেখাতেই জানে!

বিরজন—আচ্ছা হলো, এখন এই ঝগড়া থামাও তো। তোমরা দুজনে এখানে এলেই শুধু লড়তে থাক।

সেবতী—পিতা আর পুত্রের কেমন মিলন হল? এমন মনে হয় যে মুন্সী শালিগ্রাম পুত্রের জন্যই যেন সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। এসব ওঁরই শিক্ষার ফল।

রুক্মিণী—হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কি! মুন্সী শালিগ্রামকে তো এখন ব্রহ্মানন্দ বলা হয়। প্রতাপকে দেখে নিশ্চয় চিনে থাকবেন।

সেবতী—আনন্দে হয়তো আত্মহারা হয়ে গেছেন।

রুক্মিণী—এও ঈশ্বরেরই প্রেরণা। নইলে প্রতাপচন্দ্র মানস সরোবর কি করতে যাবেন?

সেবতী—ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া কি কোন কাজ হয়?

বিরজন—তোমরা আমার লালাজীকে তো ভুলেই গেছ। হৃষিকেশে প্রথমে লালাজীর সঙ্গেই প্রতাপচন্দ্রের দেখা হয়েছিল। প্রতাপ ওঁর সঙ্গে এক বছর ছিলেন সেখানে। তারপরে দুজনে মানস সরোবরের দিকে রওনা দেন।

রুক্মিণী—হ্যাঁ, প্রাণনাথের প্রবন্ধের এই বৃত্তান্তই ছিল। বালাজী তো একথাই বলেছেন যে—মুন্সী সঞ্জীবনলালের সঙ্গে মিলনের সৌভাগ্য যদি আমার না হত তাহলে আমি ভিক্ষেসিক্ষে করে পথ-চলতি সাধুদের মতই হতাম।

চন্দ্রকুঁয়র—এঁর আত্মোন্নতির জন্যে বিধাতা পুরুষ প্রথম থেকেই

সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সেবতী—তাই না এতটুকু বয়েসে ভারতের সূর্য হয়েছেন। এখন সবে পঁচিশ বছর চলছে।

বিরজন—না তিরিশ চলছে। আমার চেয়ে উনি বছর খানেকের বড়।

সেবতী—সুবামাদেবী নিশ্চয়ই ওঁর কীর্তিকথা শুনে শুনে খুব খুশী হচ্ছেন?

রুক্মিণী—আমি তো যখনই ওঁকে দেখেছি মনমরাই দেখেছি।

চন্দ্রকুঁয়র—ওঁর সারা জীবনের অভিলাষের ওপর শিশির ছড়া পড়েছে। মন খারাপ কেন হবে না ভাই?

রুক্মিণী—উনি তো দেবীর কাছে এই বরই চেয়েছিলেন।

চন্দ্রকুঁয়র—তাহলে কি দেশের সেবা গেরস্থ হয়ে করতে পারে না?

রুক্মিণী—শুধু দেশের সেবা কেন, কোন সেবাই গৃহস্থ হয়ে করা যায় না। গৃহস্থ কেবল নিজের ছেলেপিলেদের সেবা করতে পারে।

চন্দ্রকুঁয়র—করার যার সে সব কিছুতেই করতে পারে। না করার যাদের তাদের জন্য শতেক ছুতো।

আরও এক মাস কেটে গেল। বিরজনের নতুন কবিতার স্বাগত আহ্বান বালাজীর কাছে গিয়ে পৌছাল। কিন্তু এটা পরিষ্কার হল না যে উনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন কি না। কাশীর মানুষ প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বালাজী প্রতিদিন দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছেন। অবশেষে লোকে নিরাশ হয়ে পড়ল। আর বেশী নিরাশা হল বিরজনের।

একদিন, যখন কারো চিন্তাতেও ছিল না যে বালাজী আসবেন, হঠাৎ প্রাণনাথ এসে বলল—বোন! নাও, এখন প্রসন্ন হও। বালাজী আজ এখানে আসছেন।

বিরজন কিছু লিখছিল, হাত থেকে লেখনী পড়ে গেল। মাধবী উঠে দরজার দিকে ছুটল। প্রাণনাথ হেসে বলল—এখনি কি থোড়াই

এসে গেছেন যে এত উতলা হয়ে পড়েছ ?

মাধবী—কবে তাহলে আসবেন ? এদিক হয়েই যাবেন তো ?

প্রাণনাথ—এত জানা নেই, কোন্ দিক দিয়ে উনি আসবেন। আড়ম্বর আর ধুমধামে ওঁর বড় ঘৃণা। সেজন্যে আসার তারিখ প্রথমে স্থির করেননি। রাজা সাহেবের কাছে আজ সকালে একজন এসে খবর দিল যে বালাজী আসছেন। আর বলে দিয়েছেন যে ওনার জন্যে আড়ম্বর কিছু যেন না করা হয়। কিন্তু এখানকার লোক কখনো মানে সে কথা ? স্বাগত জানানো হবে, সমারোহের সঙ্গে ঘোড়সওয়ারদের মিছিল বেরোবে। এমন সমারোহ হবে যেন শহরের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকে। চারিদিকে লোক ছুটোছুটি করছে। যেই ওঁকে আসতে দেখবে, প্রত্যেক মহল্লায় টেলিফোনে খবর দেবে। কলেজ আর স্কুলের ছেলেরা উর্দি পরে ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ওর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ঘরে ঘরে পুষ্পবৃষ্টির ব্যবস্থা হচ্ছে। বাজারের সব দোকান সাজান হচ্ছে। নগরে মহা ধুমধাম পড়ে গেছে।

মাধবী—এদিক দিয়ে গেলে আমি আট্‌কে দেব।

প্রাণনাথ—আমরা কোন ব্যবস্থা তো করিনি। আট্‌কে কেন দেবে ? আর জানও তো না কোন্ দিক দিয়ে যাবেন।

বিরজন—(চিন্তা করে) আরতির করার ব্যবস্থা তো করতে হবে ?

প্রাণনাথ—এখন এটুকুও করা যাবে না। আমি বাইরে সতরঞ্চী বিছোচ্ছি।

প্রাণনাথ বাইরের ব্যবস্থায় লাগল। মাধবী ছুটল ফুল তুলতে। বিরজন রূপোর থালা মেজে ধুয়ে চক্‌চকে করে রাখল। সেবতী আর চন্দ্রা ভেতরে আরতির সমস্ত জিনিস নিয়ম মত সাজাতে লাগল। মাধবী আহ্লাদে একেবারে আটখানা। বারবার চমকে উঠে সদর দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কি জানি এসে তো পড়েননি। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছে কোথাও থেকে বাজনার শব্দ আসছে কিনা। আনন্দের উত্তেজনায় ওর বুক ধড়ফড় করছে। ফুল তুলছিল বটে। কিন্তু মন ছিল অন্য দিকে। হাতে কত কাঁটা বিঁধল। ফুলের সঙ্গে

ডাল সুদ্ধ মুচড়ে ফেলল। কতবার গাছের ডালে উল্টে পড়ল। কাঁটায় শাড়ী আটকে গেল কতবার। ওর এখনকার অবস্থা ঠিক যেন শিশুর মত।

বিরজনের মুখ কিন্তু মলিন। জলপূর্ণ পাত্রে একটু নাড়া পড়লে যেমন জল ছল্‌কে ওঠে, পুরোনো দিনের ঘটনাগুলো যেমন যেমন মনে পড়ছে, চোখে জল উছ্‌লে উঠছে—আহ! কখন এমনও দিন ছিল যখন আমি আর উনি ভাই বোনের মত ছিলাম! এক সঙ্গে খেলতাম! এক সঙ্গে থাকতাম। দেখতে দেখতে আজ চোদ্দটা বছর কেটে গেছে। ওঁর মুখ দেখার সৌভাগ্য এরমধ্যে আমার হয়নি। তখনো একটু কাঁদলে সঙ্গে সঙ্গে উনি আদর করে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতেন। নানান কথায় আমাকে ভোলাতেন। এখন কি উনি জানেন, সেই চোখ দুটোই আজ অহরহ কত কাঁদছে? এই হৃদয় কি অপরিসীম কষ্ট সয়ে যাচ্ছে? কে জানত যে, আমার ভাগ্য আমাকে এই দৃশ্য দেখাবে, একজন বিরহিনী হয়ে রইল, আর একজন সন্ন্যাসী।

হঠাৎ মাধবীর মনে হল, এমন যদি হয় বালাজীর আসার কথা সুবামার জানা না থাকে! ও বিরজনের কাছে এসে বলল—আমি একটু কাকীমার ওখানে যাচ্ছি। না জানি ওঁকে কেউ এখবর দিয়েছে কিনা?

প্রাণনাথ বাইরে থেকে আসছিল। একথা শুনতে পেয়ে বলল—ওখানে সবার আগে খবর পৌঁছেছে। ভালমতো ব্যবস্থার কথা হচ্ছে। বালাজীও সিধে বাড়ির দিকে যাবেন।

বিরজন—তাহলে আমাদের আগেই যাওয়া উচিৎ। কোথাও না আবার দেরী হয়ে যায়!

মাধবী—আরতির থালা তাহলে নিয়ে আসি?

বিরজন—কে নিয়ে যাবে? ঝিকে ডেকে দে। (চম্‌কে) আরে! তোর হাতে রক্ত কোথা থেকে এল?

মাধবী—কি জানি। ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটায় ছড়ে গেছে

হয়তো।

চন্দ্রা—এই তো নতুন শাড়ীটা এল। এরই মধ্যে ছিঁড়ে ফেলনি?

মাধবী—তোমার টোকার জন্যেই তো?

মাধবী কথাটা বলে ফেলল বটে কিন্তু ওর চোখ ভরে জল এল। চন্দ্রা এমনিতে খুব ভাল। কিন্তু যেদিন থেকে বাবু রাধাচরণ দেশ-সেবার জন্যে চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছেন, সেই থেকে চন্দ্রা বালাজীর নাম শুনলে ক্ষেপে যায়। বিরজনকে কিছু বলার সাহস ওর হয় না। তাই মাধবীর পেছনে লেগে থাকত সারাক্ষণ। বিরজন চন্দ্রার দিকে ঘুরে মাধবীকে বলল—যাও, সিন্দুক থেকে অন্য শাড়ী বের করে নাও। এটাকে ছেড়ে ফেল। ছি! ছি! সামান্য একটা ব্যাপার, তাতেই এত হাঁক-ডাক! একেবারে জ্বালা ধরিয়ে দিলে!

মাধবী—দেরী হয়ে যাবে। এভাবেই যাব।

বিরজন—না, এখনও ঘন্টা খানেকের বেশী সময় আছে। এই বলে ও স্নেহভরে মাধবীর হাত ধুইয়ে দিল। চুল বেঁধে দিয়ে সুন্দর একটা শাড়ী পরাল। গায়ে ভাল করে চাদর জড়িয়ে দিয়ে ওকে বুকে টেনে নিল। তারপর সজল চোখে ওর দিকে চেয়ে বলল—বোন! দেখো, হাত থেকে আবার ধৈর্য না ছুটে যায়!

মাধবী হেসে বলল—তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাকে সামলে রেখ। আমার নিজের মনের ওপর ভরসা নেই দিদি।

বিরজন বুঝতে পারল, আজ ওর প্রেম উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়েছে। আর কখনও কখনও এটাই হয় ওর প্রেমের পরাকাষ্ঠা। এই উন্মাদিনী বালির ওপর ভিত গাঁথছে।

মাধবী খানিকক্ষণ পরে বিরজন, সেবতী, চন্দ্রা ইত্যাদি কয়েকজন মহিলার সঙ্গে সুবামার বাড়ি গেল। ওখানকার ব্যবস্থাপত্র দেখে ও চমকে উঠল। সদর দরজার ওপর মস্তবড় চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে। সতরঞ্চী, আয়না, আর নানা রকমের জিনিস সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মাঙ্গলিকের সুর বাজছে। বড় বড় ঝুড়ি মিষ্টি আর মেওয়া ভর্তি। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরে স্বাগত জানাবার

জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। একটাও ফিটন কিংবা গাড়ী দেখা যাচ্ছিল না। কেননা বালাজী সর্বদা পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করতেন। গলায় ঝুলি বাঁধা অনেক লোককে দেখা গেল। বালাজীকে প্রণামী দেবার জন্যে যাতে টাকাপয়সা ভর্তি ছিল। রাজা ধর্মসিংহের পাঁচ ছেলেই রঙ্গীন কাপড় পরে, মাথায় কমলা রঙের পাগড়ী বেঁধে, রেশমী ঝাণ্ডা কোমরে গুঁজে বিউগল বাজাচ্ছিল। লোকেদের দৃষ্টি বিরজনের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মাথা শ্রদ্ধায় ঝুঁকে পড়ল। যখন এই মেয়েরা ভেতরে গেলেন, দেখলেন ওখানেও আঙিনা আর দালান নবাগতা বধূর মত সুসজ্জিত রয়েছে। শয়ে শয়ে মেয়েরা বসে আছেন মঙ্গলগীত গাইবার জন্য। জায়গায় জায়গায় ফুলের স্তূপ। সুবামা শুভ্র বসন পরে সন্তোষ আর শান্তির প্রতিমূর্তি রূপে দ্বারে দণ্ডায়মান। বিরজন এবং মাধবীকে দেখা মাত্রই ওর চোখ সজল হয়ে উঠল। বিরজন বলল—কাকীমা, আজ এই বাড়ির ভাগ্য আবার জেগে উঠেছে।

সুবামা কেঁদে বলল—তোমার জন্যেই আজ এসব দেখার সৌভাগ্য হল। ঈশ্বর তোমায় যেন এর ফল দেন।

দুঃখিনী মাতার অন্তস্তল থেকে এই আশীর্বাণী বেরল। এক মাতার অভিশাপ রাজা দশরথকে পুত্রশোকের মধ্যে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিয়েছিল। সুবামার এই আশীর্বাদ কি বিফলে যাবে?

দুজনে যখন কথা হচ্ছিল সেসময়ে শাঁখ আর ঘন্টার ধ্বনি বেজে উঠল। চারিদিকে সোরগোল পড়ে গেল যে বালাজী এসে পৌঁছেছেন! মেয়েরা মঙ্গলগীত আরম্ভ করল। আরতির থালা নিয়ে মাধবী একাগ্র দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অদ্বৈতাম্বরধারী তরুণদের দেখা গেল। ভারত সভার একজন সভ্য ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। ওর পেছনে অগণিত মানুষের ভিড়। সারা নগর ভেঙে পড়েছে। কাঁধে কাঁধে মিলে গিয়ে যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মত এগিয়ে আসছে। এই ভিড়ের মধ্যে বালাজীর মুখচন্দ্র এমন ভাবে দেখা যাচ্ছে যেন মেঘাচ্ছাদিত আকাশে চন্দ্রের উদয় হয়েছে। ললাটে রক্ত

চন্দনের তিলক, গলায় জড়নো গেরুয়া বরণ চাদর।

সুবামা দরজায় দাঁড়িয়েছিল। বালাজীর স্বরূপ দর্শন করতেই ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল। দরজার বাইরে বেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে বালাজীর দিকে এগিয়ে গেল। চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। আজ ও ওর হারানো দুলালকে ফিরে পেয়েছে। তাকে বুকে টেনে নেবার জন্য ও আজ উদ্‌ভ্রান্ত।

সুবামাকে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখে সবাই থেমে গেল। মনে হচ্ছিল স্বর্গ থেকে কোন দেবী যেন ধরায় নেমে এসেছেন। চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এল। বালাজী কয়েক পা এগিয়ে এসে মাকে প্রণাম করে ওর পায়ের ওপর পড়ে রইলেন। সুবামা বালাজীর মাথা কোলে টেনে নিল। আজ ও হারিয়ে যাওয়া মানিককে বুকে ফিরে পেয়েছে। সুবামার চোখের জলে বালাজীর মাথা ভিজে গেল।

এই উদ্দীপ্ত দৃশ্যে মানুষের হৃদয় জাতীয়তার গর্বে উন্মত্ত হল। পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠ থেকে একত্রে ধ্বনিত হল। 'বালাজীর জয়'। যেন মেঘের গর্জন! সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল, পুনরায় একই ভাবে হাজার হাজার কণ্ঠধ্বনি গর্জে উঠল—'জয় মুন্সী শালিগ্রামের জয়'! স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটে যাচ্ছে আর সুবামার পায়ের ধূলি মাথায় মাখছে। সাপুড়ের বীণ শুনে নাগিনী যেমন পাগল হয়ে যায় এই অশ্রুত ধ্বনি সুবামাকে তেমন বিমোহিত করে তুলল। আজ সে অমূল্য রত্ন পেয়ে রাজরাণী। আজ এই রত্নের জন্যই ওর পায়ের ধূলি লক্ষ মানুষের চোখের অঞ্জন হয়ে উঠেছে।

অপূর্ব এ দৃশ্য! বারম্বার জয়ধ্বনি তুলে মর্তের মানুষ যেন স্বর্গের অধিবাসীদের কাছে ভারতের জাগরণের শুভ সংবাদ শোনাচ্ছে। মা তার ছেলেকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। যে তার সারা জনমের কঠিন তপস্যার উপার্জন। চারিদিক থেকে অজস্র ফুল ওদের গায়ে এসে পড়ছে। সোনা আর রত্নের বৃষ্টি হচ্ছে। মাতা আর পুত্রের কোমর ফুলের সমুদ্রে ডুবে আছে। এমন মহান আর অপূর্ব দৃশ্য কেউ কি-

দেখেছে আগে ?

সুষামা বালাজীর হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে চলল। দরজায় পৌঁছতেই মেয়েরা মঙ্গলগীত গাইতে লাগল। বিরজন ফুলের মালা ওঁর গলায় পরিয়ে দিল যা মাধবী নিজের রক্তে রাঙিয়েছিল। বালাজী সজল নয়নে বিরজনের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন।

বালাজীকে দেখার জন্য কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা মাধবীর বুকে জমেছিল এতদিন, কিন্তু আজ এই শুভ মুহূর্তে ওর দৃষ্টি আনত হয়ে আছে কেন ? মাধবী তাকাতে পারছে না ওঁর মুখের দিকে, ভয় পাচ্ছে, যদি ওর চোখ ওর হৃদয়ের রহস্য প্রকাশ করে দেয়। কারণ চোখ দুটো আজ প্রেমের আকুতিতে ভরা। এতদিন পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল শুধু দর্শনের। আজ যেন মাধবীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা নব রূপে জন্ম নিল। সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার জন্য নয় বরং ঝরে পড়ার জন্য। ঝরে মাটিতে মিশে যাবার জন্য। মাধবীকে কে বোঝাবে—ওর এই আকাঙ্ক্ষাকে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এই সব বাড়তি আকাঙ্ক্ষাগুলোই ওকে ভবিষ্যতে কাঁদাবে ? কাল্পনিক প্রেমের আস্বাদনেই ও অভ্যস্ত। আজ কি তবে সে বাস্তব প্রেমের স্বাদ গ্রহণ করতে চাইছে ?

২৪

হৃদয় অভিলাষের ক্রীড়াস্থল আর কামনার আবাস। কোন এক সময় ছিল যখন মাধবী মায়ের কোলে খেলত। সে সময় হৃদয় অভিলাষ বিমুখ ছিল। যখন মাটি দিয়ে খেলার ঘর তৈরী করতে লাগল, সেই সময় হৃদয়ে বাসনার জন্ম হল। ওর ইচ্ছে পুতুলের বিয়ে দেবে। সব মেয়েরাই পুতুলের বিয়ে দেয়, ওর পুতুল কি কুমারী থাকবে ? পুতুলের জন্য গয়না তৈরী করে তাকে বিয়ে দেবে। এই ইচ্ছে ওকে কয়েক মাস কাঁদাল। কিন্তু ওর পুতুলের ভাগ্যে বিয়ে লেখা ছিল না। একদিন মেঘ করে মুষল ধারে বৃষ্টি এল। খেলাঘর বৃষ্টিতে ভেসে গেল। মাধবীর পুতুলের বিয়ে দেবার সাধ অপূর্ণই থেকে গেল।

আরো কিছুদিন কাটল মায়ের সঙ্গে বিরজনদের বাড়িতে আসা

যাওয়া করে। বিরজনের আদর ভরা মিষ্টি কথা শুনত আর খুশী হত। ওর থালায় খেত। ওর কোলে শুয়ে থাকত। এই সময়ে ওর হৃদয়ে এই ইচ্ছে জন্মাল, যে ওর বাড়ি হবে পরম সুন্দর আর তাতে রূপোর দরজা থাকবে। দেওয়ালগুলো হবে এমন মসৃণ যাতে মাছি বসলে পিছ্‌লে যায়। বিরজনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভাল ভাল রান্না করে খাওয়ায়, পালঙ্কে আরাম করে শোয়ায়, আর প্রাণ দিয়ে ওর সেবা করে, কয়েক বছর ধরে এই ইচ্ছেগুলো মাধবীর মনের মধ্যে জেগে রইল। কিন্তু সেই বাড়িও ওর খেলাঘরের মত স্বপ্নেই ভেসে গেল। ওর সকল আশা সকল ইচ্ছা নিরাশায় নিমজ্জিত হল।

কাটল আরও কিছুদিন। মাধবীর জীবনে যৌবনের সমাগম ঘটল। বিরজন ওর তরুণ চিত্তে প্রতাপচন্দ্রের চিত্র আঁকতে শুরু করল। এ সময়ে প্রতাপচন্দ্রের আলোচনার অতিরিক্ত আর কোন কথাই ওকে খুশী করতে পারত না। অবশেষে ওর হৃদয়ে প্রতাপচন্দ্রের দাসী হবার কামনা জন্ম নিল। পড়ে পড়ে মনের সঙ্গে কথা বলত অনর্গল। রাতের পর রাত জেগে হৃদয়ের সুধা পান করত। এই চিন্তায় ওর হৃদয় উন্মত্ত হয়ে উঠত। কিন্তু এর মধ্যেই একদিন শুনল প্রতাপচন্দ্রের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার সংবাদ। মাধবীর শূন্যের সোনার কেল্লা মাটির খেলা-ঘরের মতই ভেঙে গেল। আশা বঞ্চিত হল, হৃদয় ভরে থেকে গেল শুধু ক্রন্দন।

এরপর নিরাশা ওর হৃদয়ের ক্ষীণ আশাটুকুকেও নির্বাপিত করল। মাধবী নিরন্তর দেবতাদের উপাসনা করতে লাগল, যত রকম ব্রত আছে পালন করতে লাগল, একটাই প্রার্থনা তার, প্রতাপচন্দ্রের ওপর সময়ের কুদৃষ্টি যেন না পড়তে পায়। এই ভাবে জীবনের কয়েকটা বছর তপস্বিনীর মত কাটল। কল্পিত প্রেমের উল্লাসে ও ভরে থাকত কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, তপস্বিনীর ব্রত ভঙ্গ হল। হৃদয়ে নতুন কামনাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল। দশ বছরের তপস্যা এক লহমার কামনায় ভেসে গেল। এই ইচ্ছেটুকুও কি শেষে মাটির খেলাঘরের মত পদদলিত হবে?

মাধবী আজ যখন থেকে বালাজীর আরতি করেছে, ওর চোখের জল বন্ধ হয়নি। সারাটা দিন কেটে গেল। একটি একটি করে তারা ফুটতে লাগল আকাশের গায়। সূর্যদেব ক্লান্ত হয়ে ডুবে গেলেন, পাখীরা নীড়ে ফিরে এল বিশ্রাম নিতে। কিন্তু মাধবীর চোখে ক্লান্তি নেই। ভাবছিল—হায়! আমি কি এভাবে শুধু কাঁদার জন্য জন্মেছি! কখনও কি অনেক হেসেছিলাম যার জন্য আজ এত কাঁদছি? কাঁদতে কাঁদতে অর্ধেকটা জীবন কেটে গেল, শেষটাও কি এভাবেই কাটবে? আমার জীবনে কি এমন একটি দিনও নেই যার স্মরণ করে আমি তৃপ্তি পাব এই ভেবে যে আমারও কখনও সুদিন ছিল। এর আগে মাধবী কখনো এমন নৈরাশ্যপীড়িত আর ছিন্ন হৃদয় হয়নি। এতদিন ও কাল্পনিক প্রেমে আকণ্ঠ ডুবে ছিল। আজ সেই হৃদয়ে নবীন কামনা জন্ম নিয়েছে। অশ্রু তারই প্রেরিত। যে হৃদয় ষোল বছর ধরে ছিল আশার আবাসস্থল—সেই এসময়ে মাধবীর ভাবনাগুলোকে অনুভব করতে পারে।

এতদিন পরে সুবামার চিত্তে নতুন ইচ্ছেগুলো মাথা উঠিয়েছে। যতদিন বালাজীকে দেখেনি, ইচ্ছে ছিল শুধু ওকে দু চোখ ভরে একবার দেখবে। ওর অশান্ত হৃদয়কে শীতল করে নেবে। আজ যখন চোখ ভরে দেখা হল তখন আরও কিছু বাড়তি ইচ্ছার জন্ম হল। কিন্তু হায়, এই ইচ্ছেগুলো জন্ম নিল শুধু মাধবীর খেলাঘরের মত মাটিতে মিশে যাবার জন্য।

সন্ধ্যেবেলা বালাজী, সুবামা আর বিরজনের মধ্যে নানান আলোচনা চলছিল। বালাজী তাঁর সন্ন্যাস জীবনের অনুভূতির কথা বললেন। সুবামা শোনাল তার নিজের দীর্ঘ কাহিনী আর বিরজন অল্প কিছু কথা বলল কিন্তু শুনল অনেক। মুন্সী সঞ্জীবনলালের সন্ন্যাস গ্রহণের খবর শুনে দুজনেই খুব কাঁদল। সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালার সময় হলে পর বালাজী সন্ধ্যাহ্নিক করতে গঙ্গার দিকে গেলেন। সুবামা রান্না করতে বসল। আজ অনেক দিন বাদে সে মন দিয়ে রান্না করছে।

সুবামা—মা, আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল যে আমার ছেলে

জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, আজ আমার সে ইচ্ছে ঈশ্বর পূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রতাপ তার বাবার আর কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। আজ সকালে যখন আমার স্বামীর নাম হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল শুনে আমার বুকটা গর্বে ফুলে উঠছিল। আমি শুধু এটুকুই চাই মা, ও সন্ন্যাস ত্যাগ করুক। দেশের কাজে ওকে আমি বাধা দেব না। আমি তো দেবীর কাছে এই বরদানই চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ ওকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে।

সুবামার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বিরজন বলল—কাকীমা: আমার মনেও আগে থেকে একথা জমে আছে। সময় এবং সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই কথা তুলব।

সুবামা—সুযোগ কখন কবে পাওয়া যাবে তার কি ঠিক আছে মা। মন হবে কোথায় রওনা দেবে। শুনেছি ছড়ি হাতে একলা বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। আমি তো বেচারী মাধবীর দশা চোখে দেখতে পারি না। ওকে দেখি আর আমার ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অনেক মেয়ে দেখেছি, বই-এও পড়েছি মেয়েদের বৃত্তান্ত। কিন্তু এমন প্রেম কোথাও দেখিনি। জীবনের অর্ধেকটা বেচারী কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিল অথচ কখনও মুখ কালো করে থাকতে দেখিনি। কিন্তু কান্নার চোখ আর হাসির মুখ কোনদিনই লুকোন যায় না। এমন ছেলের বৌ-এর লোভ আমার ছিল। ঈশ্বর সে ইচ্ছেও আমার পূরণ করে দিয়েছেন। তোমাকে সত্যি বলছি বিরজন, মাধবীকে আমি মনে মনে পুত্রবধূ রূপেই গ্রহণ করেছি। আজ থেকে নয়, অনেক বছর ধরে।

বৃজরাণী—আজ সারাদিন ওর কেঁদেই কাটল। খুব মনমরা দেখাচ্ছে।

সুবামা—তা আজকেই এসব কথা ওঠাও না। এমন না হয় যে কালই অন্য কোথাও চলে গেল। তাহলে আবার এক যুগের প্রতীক্ষা।

বৃজরাণী—(চিন্তা করে) কথা যা তোলার তা তো আমি তুলবই কিন্তু মাধবী নিজে যে উন্মাদনায় এ কাজ করতে পারবে তা আর

কারো পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

সুষামা—ও বেচারী নিজের কথা নিজের মুখে কি আর বলবে?

বৃজরাণী—ওর চোখই সব কথা বলে দেবে।

সুষামা—লাল্লু মনে মনে কি বলবে?

বৃজরাণী—বলবেন আবার কি? এ তোমার ভুল কাকী, যে তুমি ওকে কুমারী ভাবছ। ও প্রতাপচন্দ্রের স্ত্রীই হয়ে গেছে। ঈশ্বরের কাছে ওর বিয়ে ওঁর সঙ্গেই হয়ে গেছে। যদি এমন না হত, দুনিয়ায় কি আর পুরুষ ছিল না? মাধবীর মত মেয়েকে চোখে কে না ঠাঁই দেবে? ও ওর অর্ধেক জীবন কেঁদেই কাটিয়েছে। তবু আজ পর্যন্ত ও চিন্তাতেও কোন পুরুষকে স্থান দেয়নি। বার বছর বয়স থেকে তপস্বিনীর জীবন কাটাচ্ছে। ও পালঙ্কে শোয় না, কোন রঙীন কাপড় পরে না, চুল পর্যন্ত বাঁধে না। এর থেকেই কি প্রমাণিত হয় না যে ওর বিয়ে প্রতাপের সঙ্গেই হয়ে গেছে! হৃদয়ের সত্যিকার মিলনই বিবাহ: সিঁদুরের টিপ্, গ্রন্থিবন্ধন, সপ্তপদী, এসব ভণ্ডামী।

সুষামা—আচ্ছা, যেমন উচিত মনে হয়, কর। আমি কেবল লোক নিন্দের ভয় করি মা।

রাত ন'টা বেজেছিল। আকাশে তারারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাগানে একলাটি বসে মাধবী তারা দেখছিল। মনে মনে ভাবছিল, তারারা দেখতে কেমন ঝলমলে। কিন্তু অনেক দূরে রয়েছে ওরা। কেউ কি ওখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে? আমার আশাগুলোও কি ওই নক্ষত্রের মত? এমন সময় বিরজন ওর হাত ধরে নাড়া দিতে মাধবী চমকে উঠল।

বৃজরাণী—অন্ধকারে একলাটি কি করছিস বোন?

মাধবী—কিছু না, তারাগুলোকে দেখছিলাম। দেখতে ওরা কত সুন্দর, কিন্তু ওদের নাগাল পাওয়া যায় না।

বিরজনের বুকে যেন শেল হানল। ধৈর্য ধরে বলল—তারা গোনার সময় নয় এটা। যে অতিথির জন্যে আজ ভোর থেকেই তোমার আনন্দ আর ধরছে না তার সেবা কি তুমি এই ভাবেই

করবে ?

মাধবী—অতিথি সেবার যোগ্য আমি কবে থেকে হলাম ?

বৃজরাণী—আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে এবার ওঠ, তাহলে অতিথি সেবার নিয়মগুলো শেখাব।

দুজনে ভেতরে এল। সুবামা আগেই রান্না সেরে রেখেছিল। অনেক দিন বাদে মায়ের হাতের খাবার আজ বালাজীর ভাগ্যে জুটল। বড় যত্ন করে বালাজীও খেলেন। সুবামা খাওয়াচ্ছিল আর কাঁদছিল। খাওয়াদাওয়া সেরে বালাজী যখন শুলেন, বিরজন মাধবীকে বলল—কোন্ এমন রাজকাজের জন্য এখানে বসে আছিস ?

মাধবী—কিছু তো দাও, খেয়ে শুয়ে পড়ি। প্রাণ এখন এটাই চাইছে।

বৃজরাণী—এমন হতাশ হ'স না মাধবী। এত দিনের ব্রত কি এক-দিনেই ভেঙে দিবি ?

মাধবী উঠল। কিন্তু ওর মন দমে যাচ্ছে। মেঘের ঘনঘটা দেখে যেমন মনে হয় জল স্থল বুঝি এখনই একাকার হয়ে যাবে, কিন্তু হঠাৎ পশ্চিমা বাতাস বইবার ফলে এক লহমায় শ্যাওলার মত সব মেঘ সরে যায়, মাধবীর অবস্থা ঠিক তেমনি হয়েছে।

এই শুভদিনটি দেখার লালসা অনেক দিন ধরেই ওর মনে ছিল। কখন সেই দিন আসবে যেদিন ও তাঁর দর্শন পাবে। আর তাঁর অমৃত বাণী শুনে কান ধন্য হবে। এই দিনটির জন্য কত মানত করেছে সে। এরই চিন্তায় হৃদয় উদ্ভাসিত হয়েছে।

আজ ভোর থেকেই মাধবী খুব খুশী ছিল: অনেক উৎসাহ আর যত্নে মালা গেঁথেছিল। শত শত কাঁটা হাতে বিঁধিয়ে নিজের রক্তে রাঙিয়েছিল সে মালাকে। পাগলের মতো ঢলে ঢলে পড়ছিল। এই আনন্দ আর উচ্ছ্বাস এই জন্যই ছিল তো যে তার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই শুভদিনটি আজ এসেছে! যার আসার পথের দিকে চিরকাল তার চোখ অপলক চেয়ে থেকেছে। সেই সময় এখন আর তার স্মরণে আসেনা যখন এ অভিলাষ তার মনে ছিল না। কিন্তু এখন মাধবীর

মনের সে অবস্থা নেই। আনন্দেরও সীমা থাকে। যখন বাগানে নেচে নেচে ফুল তুলছিল ওর আনন্দ একটা সীমারেখার মধ্যে ছিল। কখনো যে কোন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করেনি তার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। ও বেচারী এর চেয়ে বেশী আনন্দের ভার বইতে পারছে না। যার মুখে হাসিই ছিল না, মৃদু হাসিই তার পক্ষে ঢের। এর চেয়ে বেশী হাসির আশা তার কাছে করাই বা কেন? মাধবী বালাজীর কাছে গেল। কিন্তু সে ভাবে নয় যেমন এক নব বধু আশায় পূর্ণ হয়ে শৃঙ্গার করে তার পতির কাছে যায়। সেই ঘরটিতেই উনি আছেন যাকে দেবতার মন্দির বলে ও মনে করত। আজ যখন সে মন্দিরে দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন ও কেন এমন দুর্বলের মত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

প্রায় অর্ধরাত্রি কেটে গেছে। রাস্তায় ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মাধবী নিঃশব্দ পায়ে বালাজীর ঘরের দরজা পর্যন্ত গেল। ওর বুক তোলপাড় করছে। ভেতরে ঢোকার সাহস ও হারিয়ে ফেলেছে। কে যেন ওর পা দুটোকে মাটিতে আটকে দিয়েছে। ফিরে এসে মাটিতে বসে বসে কাঁদতে লাগল। ওর মন যেন বলে উঠল—মাধবী, এ বড় লজ্জার কথা। জানি তুমি বালাজীর দাসী। ওঁর প্রতি তোমার ভাল-বাসা আছে। কিন্তু তুমি তো ওঁর স্ত্রী নও। এ সময়ে তোমার ওঁর ঘরে থাকা উচিত নয়। তোমার প্রেম তোমাকে ওঁর স্ত্রী হতে দিতে পারে না। প্রেম এক জিনিস আর সোহাগ অন্য জিনিস। প্রেম হৃদয়ের একটা প্রবৃত্তি। আর বিবাহ এক পবিত্র ধর্ম। মাধবীর এই সময়ে একটা বিবাহের কথা স্মরণে এল। বর পূর্ণ সভায় বধূর হাত ধরে বলেছিল—এই নারীকে আমি আমার গৃহের কর্তৃ আর মনের দেবী বলে মনে করব। এই সভায় উপস্থিত অভ্যাগতরা, আকাশ, অগ্নি এবং দেবতা এর সাক্ষী থাকুন। আহ্! কি পবিত্র কথা। আমার জীবনে কখনও তো এমন কথা শোনার সৌভাগ্য হয়নি। আমি না অগ্নিকে আমার সাক্ষী করতে পারি। না দেবতাদের আর না আকাশকে। কিন্তু হে অগ্নি, হে আকাশের তারাবৃন্দ, আর হে দেবলোকবাসীগণ। তোমরা সাক্ষী থেক যে মাধবী বালাজীকে মনে মনে গ্রহণ করেছে। কিন্তু

কোন হীন চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেয়নি। যদি আমি ঘরের ভিতরে পা রাখি তাহলে হে অগ্নিদেবতা তুমি আমাকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দাও। হে আকাশ, যদি তুমি তোমার অসংখ্য নক্ষত্র-নেত্রে আমাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখ তাহলে এই মুহূর্তে আমার ওপর ইন্দ্রের বজ্রকে নিক্ষেপ কর।

এই চিন্তাতেই মাধবী কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে বসে রইল। হঠাৎ ওর কানে বিচিত্র এক ভ্‌ক ভ্‌ক শব্দ এল। চমকে চেয়ে দেখল বালাজীর ঘর তীব্র আলোয় ভরে গেছে। আর সেই আলোর ছটা জানলা দিয়ে বেরিয়ে উঠোনে ছড়িয়ে পড়ছে। মাধবীর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। খেয়াল হল ঘরের টেবিলের ওপর রাখা লণ্ঠনটা বোধহয় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে! ঝড়ের বেগে ও বালাজীর ঘরে ঢুকল। দেখল লণ্ঠন ফেটে মাটিতে পড়ে গেছে আর মাটিতে পাতা বিছানায় সব তেল ছড়িয়ে পড়ার দরুন আগুন লেগে গেছে। বিছানার অন্য ধারে বালাজী ঘুমে অচেতন। এখনও ওর ঘুম ভাঙেনি। গালিচাটা গুটিয়ে উনি এক পাশে রেখে দিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে মাধবী সেই গালিচাটা উঠিয়ে নিল। তারপর ভয় পেয়ে সেটাকে আগুনের ওপর আচমকা ফেলে দিল। ধপ্‌ করে শব্দ হওয়ায় বালাজী চমকে চোখ খুললেন। ধোঁয়ায় আর তেলের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। এর কারণ অনুমান করে বালাজী বলে উঠলেন—খুব ভাল করেছ, নইলে ঘরে আগুন লেগে যেত।

মাধবী—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই লণ্ঠনটা বিছানায় পড়ে গেছিল।

বালাজী—খুব সময় মত তুমি এসে পড়েছিলে।

মাধবী—আমি ঘরের বাইরেই বসে ছিলাম।

বালাজী—বড় কষ্ট হল তোমার। এবার গিয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়ে গেছে।

মাধবী—চলে যাব? ঘুমোতে তো রোজই হয়। কিন্তু এই সৌভাগ্য না জানি আবার কবে আসে!

মাধবীর কথাগুলো তীব্র বেদনায় ভরা। বালাজী ওকে গভীর

দৃষ্টিতে দেখলেন। উনি যখন ওকে প্রথম দেখেন তখন ও ছিল আধফুটো এক কলি। আর আজ যেন এক শুকিয়ে যাওয়া ফুল না ছিল মুখে সৌন্দর্যের দীপ্তি, না চোখে আনন্দের ঝলক। সিঁথিতে সিঁদুর রঞ্জিত হয়নি, কপালে নেই কুমকুমের টিপ। দেহে আভরণের চিহ্নটুকু নেই। বালাজী অনুমানে বুঝলেন যে বিধাতা তরুণ বয়সেই এর সোহাগ কেড়ে নিয়েছেন। অত্যন্ত উদাস হয়ে বললেন—এমন কথা বলছ কেন মাধবী? তোমার তো বিবাহ হয়ে গেছে, না?

কথাগুলো মাধবীর হৃদয়ে যেন কাটারীর আঘাত হানল। সজল নয়নে বলল—হ্যাঁ, হয়ে গেছে।

বালাজী—আর তোমার স্বামী?

মাধবী—আমার সম্পর্কে ওঁর কোন খেয়ালই নেই। ওঁর বিয়ে আমার সঙ্গে হয়নি।

বালাজী বিস্মিত হয়ে বললেন—তোমার স্বামী কি করেন?

মাধবী—দেশের সেবা।

বালাজীর চোখের ওপর থেকে যেন একটা আবরণ সরে গেল। মাধবীর মনের কথা জানতে পেরে বললেন—এই বিবাহের কতদিন হল মাধবী? বালাজীর চোখ সজল হয়ে উঠল ওঁর মুখের ওপর জাতীয়তার গর্ব সুরার উন্মাদনার মত ছড়িয়ে পড়ল। ভারত-মাতা! আজকের এই হীন অবস্থার মধ্যেও তোমার অঙ্কে এমন এমন দেবীরা বিরাজ করছেন যাঁরা একটা আদর্শের জন্য নিজের জীবন, যৌবন আর জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষাকে তোমার চরণে অর্পণ করতে পারেন! বললেন—এমন যে স্বামী তাকে তুমি ত্যাগ কর না কেন?

মাধবী অহংকার ভরে বালাজীর দিকে চেয়ে বলল—স্বামীজী, আপনি নিজের মুখে আর এমন কথা আনবেন না। আমি গান্ধারী আর সাবিত্রীর কুলে জন্ম নিয়েছি। যাঁকে মনের মধ্যে পতি বলে মেনেছি তাঁকে ত্যাগ করতে পারি না। এমন ভাবেই যদি সারাটা জীবন আমার কেঁদে কেঁদেই কেটে যায়, তবুও স্বামীর প্রতি আমার কোন অভিযোগ থাকবে না। আমার শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে আমি ভগবানের

কাছে তাঁর মঙ্গল কামনাই করব। আমার মত সাধারণ এক নারীর কাছে এই বা কম কি, যিনি আমার হৃদয়ে এমন মহাত্মার জন্য ভালবাসার স্থান করে দিয়েছেন? একেই আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি। একবারই দূর থেকে আমার স্বামীকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই থেকে সে ছবি এক মুহূর্তের জন্যও আমার চোখ থেকে সরে যায়নি। যখন, কখনো আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, সেই ছবিই আমার শুশ্রূষা করেছে। যদি কখনও আমি বিরহে অশ্রু বিসর্জন করেছি, সেই ছবি আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে। আমার সেই ছবির পতিকে আমি ত্যাগ করব? আমি তাঁর। আর সর্বদা তাঁরই থাকব। আমার হৃদয় মন প্রাণ সব তাঁতেই সমর্পিত হয়েছে। যদি উনি বলেন তো আজই আমি আগুনে প্রবেশ করব, যেমন ফুলের শয্যায় নববধূ প্রবেশ করে। যদি আমার প্রাণ ওঁর কোন কাজে লাগে তো তা আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই ওঁর চরণে অর্পণ করব। যেমন কোন উপাসক তার ইষ্ট দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেয়।

মাধবীর মুখমণ্ডল প্রেমের জ্যোতিতে অরুণাভ হয়ে উঠেছিল। সব কিছু শুনে বালাজী স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এই নারী, যে কেবল আমারই ধ্যানে জীবন উৎসর্গ করেছে! এই চিন্তায় বালাজীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। যে প্রেম একটি নারীর জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলে। তার জন্য একজন পুরুষের ধৈর্যকে জ্বালিয়ে ফেলা এমন কোন বড় কথা নয়। প্রেমের সাগরে ধৈর্য কুটোর মত ভেসে যায়। বললেন—মাধবী, তোমাদের মত মহিয়সীরা ভারতের গৌরব। আমি বড়ই ভাগ্যবান যে তোমার প্রেমের মত অমূল্য সম্পদ আমার ভাগ্যে জুটেছে। আমার জন্যেই যদি তুমি তপস্বিনীর জীবন বেছে নিয়ে থাক তাহলে আমিও তোমার জন্য এই সন্ন্যাস আর বৈরাগ্য ত্যাগ করতে পারি। যার জন্য তুমি নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছ সে-ও তোমার জন্য মহৎ থেকে মহত্তর বলিদান দিতে ইতস্তত করবে না।

এর জন্য মাধবী প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলল—

স্বামীজী, আমি অত্যন্ত অবলা আর হীনবুদ্ধি নারী। কিন্তু তবু আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, নিজের বিলাসের চিন্তা আজ পর্যন্ত এক পলের জন্যেও আমার মনে আসেনি। যদি আপনি ভেবে থাকেন যে আমার প্রেমের উদ্দেশ্য শুধু আপনার চরণে প্রেমের শেকল পরিয়ে দেওয়া তাহলে আপনি আমার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি। আমার প্রেমের যে উদ্দেশ্য, আমি তা আজ পেয়ে গেছি। আজ আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। আজ আমি আমার প্রাণনাথের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর তার অমৃত বাণী শুনে ধন্য হচ্ছি। স্বামীজী, আমার আশা ছিল না যে, ইহজীবনে এই পবিত্র দিনটি দেখার সৌভাগ্য আমার হবে। যদি এই জগৎটা আমার রাজ্য হত তো এই আনন্দে সে রাজ্য আমি আপনার চরণে সমর্পণ করতাম। জোড় হাতে আপনার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমাকে আপনার চরণচ্যুত করবেন না। আমি সন্ন্যাস নেব আর আপনার সঙ্গে থাকব। বৈরাগিণী হয়ে বিভূতি মাখব কিন্তু আপনার সঙ্গ ত্যাগ করব না। প্রাণনাথ, আপনার অদর্শনের দুঃখ অনেক সয়েছি। এখন আর এই জ্বলন সহ্য করতে পারছি না।

কথা বলতে বলতে মাধবীর গলা ধরে এল। চোখ বেয়ে প্রেমের ধারা বইতে লাগল। ওর পক্ষে ওখানে বসে থাকা আর সম্ভব হল না। উঠে বালাজীকে প্রণাম করে বিরজনের কাছে গিয়ে বসে পড়ল। বৃজরাণী ওকে জড়িয়ে ধরে জিগ্‌গেস করল—কি কথাবার্তা হল এতক্ষণ?

মাধবী—যা তুমি চাইছিলে।

বৃজরাণী—সত্যি কি বললেন, বল্ না?

মাধবী—তা বলব না।

বৃজরাণী যেন পড়ে পাওয়া সম্পদ হঠাৎ পেয়ে গেল। বলল—ঈশ্বর অনেকদিন বাদে আমার মনোরথ পূর্ণ করলেন। আমার নিজের বাড়ি থেকেই আমি বিয়ে দেব।

মাধবী নিরাশ হয়ে মৃদু হাসল।

—আমায় ভুলে যাবি না তো? বিরজনের চোখে জল। গলার

স্বর কাঁপছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—আমাকে ছেড়ে চলে যাবি তো বোন?

মাধবী—তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না দিদি।

বৃজবাণী—যাঃ! মিথ্যে বলিস না।

মাধবী—দেখে নিও।

বৃজরাণী—দেখে আমি নিয়েছি। এখন বল্ তো, বিয়ের শাড়ী, কোন্ রঙের পারবি?

মাধবী—সাদা, যেমন বকের পাখা হয়।

বৃজরাণী—সোহাগের শাড়ী হয় লাল রঙের, বুঝলি?

মাধবী—আমার হবে সাদা। কেমন?

বৃজরাণী—তোকে চন্দ্রহার খুব মানাত। আমারটা তোকেই দিয়ে দেব।

মাধবী—হারের বদলে তুলসীর মালা দিও।

বৃজরাণী—এ আবার কেমন ছিরির কথা?

মাধবী—নিজের সাজের কথা!

বৃজরাণী—তোর কথার মাথা মুণ্ডু কিছুই তো বুঝছি না। এখনো এমন মন খারাপ করে আছিস কেন? এই অমূল্য রত্নের জন্যে কত কঠিন তপস্যা করেছিস। কতশত কষ্ট সয়েছিস। কোন্ ব্রত না পালন করতে তোর বাকী থেকেছে। আজ যখন সে রত্ন হাতের মুঠোয় পেলি খুশী নেই কেন?

মাধবী—তুমি বিয়ের কথা বলছ তো। তাই আমার দুঃখ হচ্ছে।

বৃজরাণী—কেন। এ তো খুশী হবার কথা?

মাধবী—দিদি, খুশী হওয়া আমার ভাগ্যে লেখাই নেই। যে পাখী মেঘে বাসা বাঁধতে চায় গাছের ডালেই তাকে সর্বদা বসে থাকতে হয়। আমি ঠিক করে নিয়েছি, জীবনের বাকী সময়টা এভাবে প্রেমের স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দেব।

পরের দিন স্নান ধ্যান সেরে বালাজী রাজা ধর্ম-সিংহের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আজ রাজঘাটে এক বিশাল গো-শালার শিলান্যাস হবার কথা। শহরের পথ-ঘাট, গাছ-পালা আজ যেন লাস্যময় হয়ে উঠেছে। পথের দুপাশে ছোট বড় পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজা ফুলের মালা পরে স্বাগত জানানোর জন্যে তৈরী। কারণ, আজ সেই স্বদেশ প্রেমিক এই পথ দিয়ে গমন করবেন, যিনি দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বস্ব বলিদান করেছেন।

আনন্দের দেবী সখী পরিবৃত হয়ে যেন সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বায়ু হিল্লোলিত হচ্ছিল। দুঃখ বিবাদের চিহ্ন মাত্র কোথাও নেই। স্থানে স্থানে অভিনন্দনের বাদ্য বাজছিল। পুরুষেরা সুদৃশ্য পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আর মেয়েরা ষোড়শ শৃঙ্গারে সাজ-সজ্জা করে মঙ্গল-গীত গেয়ে গেয়ে ফিরছিল। শিশুরা রঙ-বেরঙের পোশাকে সেজে মাথায় পাগড়ী বেঁধে কলরবে মেতেছিল। সকল স্ত্রী-পুরুষের মুখে খুশী যেন ঝল্‌কে উঠছে। কারণ আজ এমনই এক সত্যিকার দেশ-হিতৈষীর শুভাগমন হবে যিনি জনগণ হিতে সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন।

বালাজী যখন তাঁর সুহৃদবর্গের সঙ্গে রাজঘাটের দিকে চললেন তখন সূর্যদেব পূর্বগগনে উদিত হয়ে ওঁকে স্বাগত জানালেন। ওঁর তেজদীপ্ত মুখমণ্ডল দর্শন করতেই লোকেরা সহস্র কণ্ঠে 'ভারত মাতার জয়' ধ্বনি করে উঠল। সহস্র কণ্ঠের সেই অপূর্ব নিনাদ বায়ু-মণ্ডল ভেদ করে আকাশে ধ্বনিত হল। শঙ্খ আর ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠল। বায়ুমণ্ডলে উৎসবের সুর গুঞ্জরিত হল। প্রদীপের আলো দেখলে পতঙ্গরা যেমন নিমেষে তাকে ঘিরে ফেলে, বালাজীর দর্শনমাত্র আগতরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তাঁর চারপাশে একত্রিত হল। ভারত সভার সোয়া শো সদস্য ওঁকে অভিবাদন জানাল। ওদের সুন্দর উর্দি আর ঘোড়াগুলোকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। এই সভার প্রত্যেকটি সদস্য সত্যিকার দেশহিতৈষী। ওদের উদ্দীপনা ভরা কথায় মানুষের মন উৎসাহে পূর্ণ হয়ে উঠছিল। পথের দুধারে মানুষের সারি। অভি-

নন্দনের সুর বেজে চলেছে এক নাগাড়ে। স্থানে স্থানে নগরের ললনারা সজ্জিত হয়ে সোনার থালায় কর্পূর, ফুল আর চন্দন নিয়ে আরতি করছিল বালাজীকে। দোকানপাট যেন আজ নববধূর সাজে সজ্জিত। সারা নগরের সাজসজ্জা দেখে ফুলের বাগানও যেন লজ্জা পাচ্ছে। শ্রাবণ মাসে কালো মেঘ ওঠে। আর সে মেঘের গর্জনে যেমন হৃদয় কেঁপে ওঠে, সেই ভাবে জনতার সোল্লাস ধ্বনি (ভারত মাতার জয়) হৃদয়ে উৎসাহ আর উত্তেজনার কাঁপন ধরাচ্ছিল। চৌমাথায় পৌঁছে বালাজী এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলেন। বালকেরা রঙ্-বেরঙের লেশ লাগান কোট পরে, মাথায় কেশর রঙের পাগড়ী বেঁধে, হাতে সুন্দর লাঠি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। বালাজীকে দেখামাত্র ওরা দশ দশ জনের এক একটা দলে ভাগ হয়ে গেল। তারপর লাঠি বাজিয়ে এই উদ্দীপ্ত গানটি গাইতে লাগল।

> বালাজী তোমার আগমন শুভ হোক।
> ধন্য, ধন্য ভাগ্য এ নগরীর, ধন্য, ধন্য ভাগ্য মোদের ॥
> ধন্য, ধন্য এ নগরবাসী, যথা তোমার চরণ সঞ্চারে।
> মহিমময় তুমি বালাজী, তোমার আগমন শুভ হোক ॥

কি চিত্তাকর্ষক এ দৃশ্য! গান যদিও খুবই সাধারণ, তবু অনেক যত্নে সাধা বহু কণ্ঠের একত্র মিলনে তা এমন সুমধুর আর তেজময় যে শ্রোতারা চলৎশক্তিহীন হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মাঝে এই সংগীত এমন সুমধুর লাগছিল যেন রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বুলবুলের সানন্দ কলরব। সমস্ত দর্শকবৃন্দ চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়েছিল।—হে দীন ভারতবাসীগণ, তোমরা কি কোথাও এমন দৃশ্য উপভোগ করেছ? প্রাণভরে দেখে নাও। বারবনিতাদের চটুল নৃত্যবাদ্যে তোমরা সন্তুষ্ট হয়ে গেছ। বারাঙ্গনাদের কামলীলা অনেক উপভোগ করেছ, আর তা নিয়ে অনেক কাব্য-বিলাসও করেছ, কিন্তু সত্যিকারের এই আনন্দ আর এই সুখময় উদ্যম যা তোমরা এই সময়ে অনুভব করছ, তা আর কোথাও পেয়েছ কি? মনোমোহিনী বারাঙ্গনাদের সঙ্গীত আর সুন্দরীদের কামকৌতুক তোমার বৈষয়িক

ইচ্ছাগুলোকে উত্তেজিত করে বটে, কিন্তু তোমার সৎ উদ্যমকে দুর্বল করে দেয়। অথচ এমন দৃশ্য আর সঙ্গীত তোমার হৃদয়ে জাতীয়তাবোধ আর জাত্যভিমান সঞ্চারিত করে। যদি জীবনে একবারও এই দৃশ্য দেখে থাক, তাহলে তার পবিত্র চিহ্ন তোমাদের হৃদয় থেকে কোনদিনও মুছে যাবে না।

বালাজীর দিব্য মুখমণ্ডল আত্মিক আনন্দের দ্যুতিতে দীপ্তিময় হয়ে উঠেছিল। চোখ থেকে জাত্যভিমানের গর্ব ঝরে ঝরে পড়ছিল। পরিপূর্ণ ক্ষেত দেখে কৃষক যেমন আনন্দোন্মত্ত হয়ে ওঠে, বালাজীর এখন একই অবস্থা। গান যখন থামল, উনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দুটি বালককে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে বললেন—'ভারত মাতার জয়'।

ধীরে ধীরে লোকে রাজঘাটে একত্রিত হল। ওখানে স্বাগত জানানোর জন্যে গোশালার এক বিশাল গগনস্পর্শী ভবন উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আঙিনায় মখমলের ফরাস পাতা। গৃহদ্বার আর স্তম্ভগুলো ফুল পাতায় সুসজ্জিত। ভবনের ভেতরে এক হাজার গরু বাঁধা আছে। বালাজী নিজের হাতে ওদের মুখের নিচে খোল ভূসি ঢাললেন। স্নেহভরে ওদের গায়ে হাত বুলোলেন। একটা বড় ঘরে শ্বেত পাথরের একটা অষ্টভূজ কুণ্ড তৈরী করা হয়েছে দুধে তা পূর্ণ। বালাজী কুণ্ড থেকে এক গণ্ডূষ দুধ নিয়ে দু চোখে স্পর্শ করে পান করলেন।

আঙিনায় তখনো লোকে সুস্থির হয়ে বসেওনি, কয়েকজন দৌড়ে এসে বলল—পণ্ডিত বদলু শাস্ত্রী, শেঠ উত্তমচন্দ্র আর লালা মাখন লাল বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন, বলছেন—বালাজীর সঙ্গে আগে আমাদের দুটো কথা বলে নিতে দাও। বদলু শাস্ত্রী, কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত। কপালে চন্দ্রতিলক, সবুজ বনাতের আঙরখা আর মাথায় বাসন্তী রঙের পাগড়ী পরেন। উত্তমচন্দ্র আর মাখন লাল শহরের লক্ষপতি লোক। উপাধির জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করেন আর শহরের মুখ্য অধিকারীদের খাতির আপ্যায়ন করা নিজেদের প্রধান কর্তব্য কর্ম বলে মনে করেন। এই মহাপুরুষদের শহরের লোকের ওপর প্রভূত প্রভাব। বদলু শাস্ত্রী যখন শাস্ত্রের

বিতর্কে নামতেন, নিঃসন্দেহে প্রতিবাদী পক্ষ পরাভূত হত। বিশেষ করে, কাশীর পাণ্ডা গুণ্ডা আর ওঁর মতাবলম্বী ধার্মিকরা ওদের প্রতিবাদী-দের ঘাম বহানোর জায়গায় রক্ত ঝরাতেও কুণ্ঠিত হত না। শাস্ত্রীজী, কাশীর হিন্দুধর্মের রক্ষক আর স্তম্ভ রূপে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। উত্তমচন্দ্র ও মাখনলাল ছিলেন এই ধর্মীয় উদ্যমের প্রতিমূর্তি। এরা দীর্ঘ দিন ধরে বালাজীর সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিতর্কের সুযোগ খুঁজছিলেন। আজ ওঁদের মনোরথ পূর্ণ হবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এরমধ্যে পাণ্ডা আর গুণ্ডাদের একটা দলও এসে উপস্থিত হল।

বালাজী এই মহাপুরুষদের আগমন বার্তা শুনে বাইরে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু বেরিয়ে এসে বিচিত্র এক দৃশ্য দেখলেন। উভয় পক্ষের লোকেরা লাঠি বাগিয়ে আঙ্গরখোর আস্তিন গুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত। আর শাস্ত্রীজী ওদের আক্রমণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। শেঠজী উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন—এই সব শত্রুদের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দাও। মামলা করলে দেখা যাবে। ভয় নেই, তোমাদের একটি চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারবে না। মাখনলাল সাহেব গলা চড়িয়ে চেঁচাচ্ছিলেন—যার কণামাত্র সম্মান জ্ঞান আছে সে বেরিয়ে আসুক। সবাইকে একেবারে সরষেফুল দেখিয়ে দেব। বালাজী যখন এই রঙ্গ দেখছিলেন রাজা ধর্মসিংহ বললেন—আপনি গিয়ে বদলু শাস্ত্রীকে বুঝিয়ে বলুন যে এই অসভ্যতা যেন বন্ধ করে, অন্যথা দু-পক্ষের লোকেদেরই ক্ষতি হবে। উপরন্তু বাইরের লোকে যে উপহাস করবে তা তো আলাদাই আছে!

রাজা সাহেবের চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। বললেন—এই লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতেও নিজের অসম্মান মনে করি। ওদের নিজেদের তাকত নিয়ে বড় গর্ব। আজ কিন্তু আমি ওদের সব গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেব। ওদের অভিপ্রায় একটাই, যে করে হোক আপনাকে বাধা দেওয়া, অপমান করা। কিন্তু যতক্ষণ আমি আর আমার পাঁচ ছেলে জীবিত আছি, আপনাকে অপমান করার স্পর্ধা কারো হবে না। শুধু আপনার একটি ইশারার অপেক্ষা। পলকের মধ্যে ওদের এই অসভ্যতার পাল্টা স্বাদ পাইয়ে দেব।

বালাজী বুঝতে পারলেন যে এই বীরপুরুষটি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। রাজপুত যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন মরা এবং মারা ছাড়া তার নজরে আর কিছুই পড়ে না। শান্ত স্বরে বললেন—রাজাসাহেব, আপনি বিচক্ষণ দূরদর্শী হয়ে এমন কথা বলছেন? এমন সময়ে কথায় কাজ হয় না। এগিয়ে গিয়ে নিজের লোকেদের থামান, না হলে এর পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হবে।

কথা বলতে বলতে বালাজী হঠাৎ থেমে গেলেন। সমুদ্রের তরঙ্গের মত এদিক ওদিক দিয়ে লোক ছুটে আসছিল। হাতে লাঠি আর চোখ রক্ত রাঙা। মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ, ভ্রূকুটি কুটিল। দেখতে দেখতে এরা গুণ্ডাদের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল। এবং সে সময়েরও আর বিলম্ব নেই যখন ওরা লাঠিতে চুম্বন করে এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে··· তৎক্ষণাৎ বালাজী বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে বললেন—

ভাই সব, একি দুর্যোগ! যদি আমাকে নিজেদের বন্ধু বলে মনে কর তাহলে এই মুহূর্তে হাতের উদ্যত লাঠি নামিয়ে ফেল। আর পা-কে এক ইঞ্চিও বাড়াতে দিও না। আমি গর্বিত যে তোমাদের হৃদয়ের বীরোচিত ক্রোধ আর উত্তেজনা তরঙ্গিত হচ্ছে। ক্রোধ এক পবিত্র উদ্বেগ আর উৎসাহ।" কিন্তু আত্মসংবরণ তার চেয়েও পবিত্র ধর্ম। এখন নিজেদের ক্রোধকে দৃঢ়তার সঙ্গে দমন কর। তোমরা কি নিজের দেশের প্রতি কৌলিক কর্তব্য সম্পন্ন করে দিয়েছ যে এই ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতে কটিবদ্ধ হয়েছ? তোমরা দীপ হাতে নিয়েও অন্ধকার কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চাইছ? এরা তোমাদের স্বদেশ বান্ধব। আর এদের রক্তে তোমাদেরই রক্ত বইছে। এদের শত্রু মনে করো না। যদি এরা মূর্খ হয় তবে এদের মূর্খতা দূর করা তোমার কর্তব্য। এরা যদি তোমাদের কটু কথা বলে তাতে তোমরা রাগ করো না। যদি এরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে বিনয়ের সঙ্গে পরাজয় স্বীকার করে নাও। এবং একজন চিকিৎসকের মত নিজের জ্ঞানহীন রোগীদের ওষুধ দেবার জন্য তৎপর হও। আমার এই আদেশ লঙ্ঘন

করে যদি কেউ তোমাদের মধ্যে হাত ওঠাও তো সে দেশের শত্রু বলে চিহ্নিত হবে।

বালাজীর যুক্তিপূর্ণ বাগ্মীতায় চতুর্দিকে শান্তি নেমে এল। যেখানে যে ছিল চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে রইল। এই মহাপুরুষের কথায় কি দৈব শক্তি ছিল, যার প্রভাবে হাজার হাজার মানুষের ক্রোধাগ্নি নিমেষে নির্বাপিত হল! দক্ষ সারথি যেন তার অবাধ্য অশ্বকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিয়েছে! এই অমিত শক্তি ওঁকে কে দিয়েছে? না ছিল ওঁর মাথায় রাজমুকুট, না উনি কোন বিশাল সৈন্যবাহিনীর নায়ক! শুধু পবিত্র নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও জাতির সেবা ওঁকে এমন অমিত তেজের অধিকারী করেছে। স্বজন-পোষণ, সম্মান আর প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ প্রাণ দেয়। উনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন জাতির জন্য। বালাজীর তেজস্বী রূপ আর উদাত্ত কণ্ঠ-স্বর শুনে পাণ্ডা আর গুণ্ডাদের দেহের ক্রোধ শান্ত হয়ে গেল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন কুয়াশা কেটে যায় তেমনি বালাজীর আগমনে বিরোধী দলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে, যারা গণ্ডগোল করার উদ্দেশ্যে এসেছিল সশ্রদ্ধ চিত্তে বালাজীর চরণে আনত হয়ে ওঁর অনুগামীদের মধ্যে সামিল হয়ে গেল। বদলু শাস্ত্রী অনেক চেষ্টা করল মূর্খ পাণ্ডাদের উত্তেজিত করার। কিন্তু সব চেষ্টাই বিফল হল।

এই সময় বালাজী এক ওজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন। যার প্রতিটি কথা শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে রইল। আর ভারতবাসীর জন্য যা ভাবীকালে আলোকবর্তিকার কাজ করবে। বালাজীর বক্তৃতা সর্বদাই সারগর্ভ হয়। এই প্রতিভা সেই তেজে দীপ্তিমান যার তুলনা কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়। ওনার কথার যাদুমন্ত্রে কিছুক্ষণের মধ্যে পাণ্ডা গুণ্ডা আহীর আর পাসীরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হল। সেই অসীম তেজময়ী বক্তৃতার শেষাংশ হল—

যদি আপনারা দৃঢ়তার সঙ্গে কর্ম করে যান তাহলে অবশ্যই এক-দিন সিদ্ধির স্বর্ণ স্তম্ভ দেখতে পাবেন। কিন্তু কখনই ধৈর্যকে হাতছাড়া করবেন না। দৃঢ়তা অত্যন্ত প্রবল শক্তি। দৃঢ়তা পুরুষের সর্বগুণের রাজা। দৃঢ়তা বীরত্বের এক প্রধান অঙ্গ। একে কখনই নিজের

নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে দেবেন না। আপনাদের পরীক্ষা হবে সেদিন, যেদিন দৃঢ়তা ছাড়া আর কোন বিশ্বাসের পাত্র আপনার পথপ্রদর্শক হিসেবে মিলবে না। দৃঢ়তায় সাফল্য যদি নাও আসে তবু তার উপাসক হিসাবে জগতে নাম থেকে যাবে।

বালাজী গৃহে ফিরে এসে খবরের কাগজ খুললেন। তাঁর মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করল। আর হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল সকরুণ এক দীর্ঘশ্বাস। ভীত হয়ে ধর্মসিংহ জিগগেস করলেন—ভাল খবর তো স্বামীজী ?

বালাজী—সদিয়াতে বাঁধ ভেঙে গেছে। দশ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে।

ধর্মসিংহ—আ—হা।

বালাজী—হাজার হাজার মানুষ জলের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। বাড়ির ছাতের ওপর দিয়ে নৌকা চলাচল করছে। ভারত সভার সভ্যরা সেখানে পৌঁছে গেছেন আর যথাশক্তি দুর্গতদের রক্ষা করছেন, কিন্তু ভাবনা হচ্ছে, ওদের সংখ্যা তো তুলনায় অনেক সামান্য।

ধর্মসিংহ—(সজল নেত্রে) ভগবান! তুমিই এই অনাথদের নাথ। রক্ষাকর্তা।

বালাজী—গোপাল, গোশালা সব ভেসে গেছে। এক হাজার গ্রাম জলস্রোতের কবলে। তিন ঘণ্টা ধরে টানা বৃষ্টি। ষোল ইঞ্চি বর্ষা হয়েছে। শহরের উত্তর ভাগে সারা শহরের লোক গিয়ে জুটেছে না আছে থাকার জায়গা, না আছে খাদ্যবস্তু! শবদেহের স্তুপ চতুর্দিকে। অনেক লোক খিদের জ্বালায় পড়ে পড়ে মরছে। মানুষের বিলাপ আর করুণ কান্নায় হৃদয় মূক হয়ে আসছে। বিপদাপন্ন মানুষ বার বার বালাজীকে আকুল ভাবে ডাকছে। ওদের ধারণা, আমি সেখানে পৌঁছলেই ওদের দুঃখ দূর হয়ে যাবে!

কিছুক্ষণ বালাজী চিন্তায় মগ্ন থেকে বললেন—আমার যাওয়া দরকার। যত শীঘ্র পারি আমি যাব। আপনি সদিয়ার ভারত সভায় তার করে দিন যেন ওরা এই কাজে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

রাজাসাহেব সবিনয়ে নিবেদন করলেন—আজ্ঞা হলে আমিও সঙ্গে যাই।

বালাজী—আমি পৌঁছে আপনাকে সংবাদ দেব। আমার ধারণায় আপনার যাবার কোন আবশ্যকতা নেই।

ধর্মসিংহ—আপনি সকালে রওনা দিলেই ভাল হত।

বালাজী—ন্‌না! এক মুহূর্ত এখানে থাকা আমার পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়েছে। এখনও ওখানে পৌঁছতে আমার বেশ কয়েক দিনই লাগবে।

তৎক্ষণাৎ শহরময় এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে গেল যে সদিয়াতে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছে আর বালাজী এখন ওখানে যাচ্ছেন। এই সংবাদ শোনা মাত্র হাজার হাজার মানুষ বালাজীকে যাত্রা করিয়ে দেবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ন'টা বাজতে না বাজতেই হাজার পঁচিশ লোক জড় হয়ে গেল। সদিয়ার দুর্ঘটনার কথা প্রত্যেকের মুখে মুখে। সকলে দুর্গত, পীড়িত মানুষদের জন্য সহানুভূতি ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিল। শয়ে শয়ে মানুষ বালাজীর সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত। সদিয়া বাসীদের জন্য একটা ফাণ্ড (তহবিল) খোলার ব্যাপারে সবার মধ্যে পরামর্শ চলতে লাগল।

ওদিকে ধর্মসিংহের অন্তঃপুরে আজ শহরের সম্মানিত স্ত্রীলোকেরা সুবামাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। সুউচ্চ প্রাসাদের প্রতিটি অলিন্দে রমণীগণের সমাবেশ। প্রথমে বৃজরাণী কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে এক সুন্দর মঙ্গলগীত গাইল। ওদের পেছনে মেয়েরা সব সারি বেঁধে গাইতে গাইতে, বাজাতে বাজাতে, আরতির থালা নিয়ে সুবামার বাড়িতে এল। সেবতী আর চন্দ্রা অতিথি সৎকারের জন্য আগে থেকেই তৈরী ছিল। সুবামা সব রমণীগণের সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আশীর্বাদ করল যে, তাদের কোলেও যেন এমনই সুযোগ্য শিশু খেলা করে। তারপর রাণীজী ওঁর আরতি করলেন। মঙ্গলগীত তখনও চলছিল।

আজ মাধবীর মুখমণ্ডল ফুলের মতো প্রস্ফুটিত রয়েছে। গতকালের মত ম্লান আর চিন্তিত আজ সে নয়। আশা হল বিষের গ্রন্থি। সেই

আশাই কাল ওকে কাঁদিয়েছে। কিন্তু আজ ওর হৃদয় সম্পূর্ণভাবে আশা মুক্ত. তাই ওর মুখমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি, নয়ন উদ্ভাসিত। নিরাশায়, হতাশায়, এই নারী সারাটা জীবন কাটিয়েছে, কিন্তু আশাপূর্ণ হয়ে ও একদিনের দুঃখও সইতে পারেনি।

সুমধুর রাগিনীর আলাপ গৃহে গুঞ্জরিত হচ্ছিল কিন্তু হঠাৎই সদিয়ার দুঃসংবাদ ওখানে এসে পৌঁছাল। ধর্মসিংহকে বলতে শোনা গেল—আপনারা বালাজীকে বিদায় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকুন, এখনই উনি সদিয়ায় যাত্রা করবেন।

একথা শোনা মাত্র অর্ধরাত্রির নৈঃশব্দ্য নেমে এল। সুবামা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ও যেন বালাজীকে আটকাবে বলে স্থির করেছে। ওর সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব মেয়েরাও উঠে দাঁড়িয়ে ওর পেছন পেছন চলল। বৃজরাণী বলল—কাকী! ওঁকে কি তুমি জোর করে বিদায় করবে? এখনো তো উনি নিজের ঘরেই আছেন।

আমি ওকে যেতে দেবনা। বিদেয় আবার কিসের জন্য?

বৃজরাণী—ওঁর সদিয়ায় যাওয়া প্রয়োজন।

সুবামা—আমি কি সদিয়াকে ধুয়ে জল খাব? চুলোয় যাক সব। আমিও তো ওর কেউ হই? আমারও তো ওর ওপর কিছু অধিকার আছে?

বৃজরাণী—তোমাকে আমার দিব্যি, এসময়ে এমন কথা মুখে এনো না। হাজার হাজার দুর্গত মানুষ শুধু-মাত্র ওঁর ভরসাতেই এখনো বেঁচে আছে। উনি যদি না যান, প্রলয় বেধে যাবে।

মায়ের মমতা মনুষ্যত্ব আর স্বজাতি প্রীতিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। বৃজরাণী অত্যন্ত ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে তাকে নিবৃত্ত করল। পূর্বকথা স্মরণ করে সুবামা অবাক মানল, অনুশোচনায় কুণ্ঠিত হল,—এমন সত্যের বাইরে সে চলে গেল কেমন করে?

রাণীজী জিগ্‌গেস করলেন—বিরজন বালাজীকে জয়মালা পরাবে কে?

বিরজন—আপনি।

রাণীজী—আর তুমি কি করবে ?

বিরজন—আমি ওঁর কপালে ফোঁটা দেব।

রাণীজী—মাধবী কোথায় ?

বিরজন—ওকে বিরক্ত করবেন না। বেচারী নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। এর মধ্যে বালাজী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মেয়েরা ওঁর দিকে এগোল। সুবামা ওঁকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিছু বলতে চাইছিল সুবামা। কিন্তু স্নেহের আধিক্যে গলা বুজে এল। কিছু বলা আর হল না। ফুলের জয়মাল্য এনে ওঁকে পরিয়ে দিতে গিয়ে রাণীজীর পা কেঁপে উঠল। এগোতে আর পারলেন না। বৃজরাণী চন্দনের থালা নিয়ে এগিয়ে এল। শ্রাবণের ধারা নেমেছে ওর চোখে। এবার মাধবী এল বৃজরাণীর পেছনে। অধরে মোহিনী হাসির ঝলক আর মন ছিল প্রেমের আনন্দে বিভোর। চোখে, মুখে তার লালিমা ছড়িয়ে আছে। বালাজীর দিকে ও এমন দৃষ্টিতে তাকাল, যেন দৃষ্টি দিয়ে সে অপার প্রেমের আরতি করছে। তারপর চোখ নত করে ফুলের জয়মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিল। কপালে দিল চন্দনের ফোঁটা। লোকাচারের যেটুকু কমতি ছিল, পূর্ণ হয়ে গেল। এই সময়ে বালাজী গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ করলেন। ওঁর মনে হল যেন উনি অপার প্রেমের সমুদ্রে ভেসে চলেছেন। এবার ধৈর্যের নোঙর গেল খুলে, অকস্মাৎ যেন জলের মধ্যে পা পিছলে পড়ে গেছেন এমন ভাবে মাধবীর হাতদুটোকে আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু হায়! যে তৃণকে তিনি অবলম্বন করলেন তা নিজেই প্রেমের স্রোতে তীব্র গতিতে ভেসে চলেছিল। ওঁর হাতের স্পর্শ পেতেই মাধবীর রোমে রোমে বিদ্যুৎ খেলে গেল। শরীরে স্বেদ বিন্দু ঝলমল করতে লাগল। আর যে ভাবে বাতাসের ভারে পুষ্পদলের ওপর পড়া শিশির বিন্দু ঝরে পড়ে সেই ভাবে মাধবীর চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু বালাজীর হাতে ঝরে পড়তে লাগল। এ ওর নীরব প্রেমের শুক্তি বিন্দু, যা সেই পাগলকরা চোখ বালাজীকে অর্ঘ্য দিল। আজ থেকে ওর এই চোখ আর কখনো

কাঁদবে না।

আকাশময় তারা ছড়িয়ে ছিল। চিকের আড়ালে বসে থাকা রমণীরা দুচোখ ভরে দেখছিল এই দৃশ্য। আজ সকালেই বালাজীর শুভাগমনে এই মঙ্গলগীত গাওয়া হয়েছিল

—বালাজী তোমার আগমন শুভময় হোক—

কিন্তু এই সময়ে মেয়েরা তাদের মন ভোলান সুমধুর স্বরে গাইছিল —বালাজী তোমার গমন শুভময় হোক।

আসাও ছিল শুভময়। যাওয়াও শুভময় হয়েছিল। আসার সময়ও লোকের চোখ থেকে জল ঝরেছে আনন্দে আর যাবার সময় ঝরছে বিরহে। কাল এরা নবাগত অতিথিকে স্বাগত জানাতে এসেছিল। আজ তারাই এসেছে তাঁকে বিদায় জানাতে। এর রূপ, রঙ সব কিছু ছিল আগের মতই—কিন্তু তবু কত প্রভেদ।

২৯

মাধবী শুরু থেকেই ছিল শুকিয়ে যাওয়া কুঁড়ি। নিরাশা ওকে ভস্মে পর্যবসিত করেছিল। বিশ বছরের তাপসী, যোগিনী হয়ে গেল। সেই বেচারীর জীবন কেমন হয় যার মনে কোনদিনও কোন আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়নি। আর যদি হলও তো দুর্দৈব তাকে কুসুমিত হতে দিল না। ওর প্রেম ছিল এক অপার সমুদ্র। তাতে এমন বন্যা এল যে জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা ভেসে গেল। মাধবী যোগিনীর বেশ ধারণ করল। মুক্ত হয়ে গেল সাংসারিক সকল বন্ধন থেকে। সংসার এই সব আশা আর আকাঙ্ক্ষার অপর নাম। যে সেগুলোকে নৈরাশ্য নদে প্রবাহিত করে দিয়েছে, তাকে সংসারে বোঝার চেষ্টা ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

এই প্রেমগরবে মাতোয়ারা যোগিনীর কোন স্থানেই শান্তি মিলত না। পুষ্পের সৌরভের মতো দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে ও প্রেমের কথা শুনিয়ে বেড়াত। ওর স্বর্ণাভ বর্ণে গেরুয়া বসন শোভার আধার হল। এই মূর্তিময়ী প্রেমকে চাক্ষুষ করে লোকের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে

পড়ত। যখন বীণা বাজিয়ে ও কোন গান গাইত, শ্রোতাদের মন ভাবানুরাগে পূর্ণ হয়ে যেত। যার প্রতিটি কলিই থাকত প্রেমরসে নিমজ্জিত।

বালাজীর নামে মাতোয়ারা যোগিনীর অনুরাগ ছিল গভীর, অদম্য। ওর গানের কলিতে ও প্রায়শই ওঁর কীর্তিকাহিনী শোনাত। যেদিন থেকে ও যোগিনীর বেশ ধারণ ক'রে প্রেমের জন্য লোকলজ্জাকে পরিত্যাগ করেছিল, সেদিন থেকে সরস্বতী যেন ওর জিহ্বায় ভর করেছিলেন। ওর গান শোনার জন্য লোকে শত শত ক্রোশ ছুটে যেত। মুরলীর ধ্বনি শুনে গোপীরা যেমন ঘর ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে পড়ত, তেমনি এই যোগিনীর গান শুনলেই মানুষ ব্যাকুল হয়ে ছুটত। ওর গান শোনা যেন আনন্দের পেয়ালা পান করা।

এই যোগিনীকে কেউ কোনদিন হাসতে কিম্বা কাঁদতে দেখেনি। কোন কথায় ওর না ছিল আনন্দ আবার না ছিল কোন কথায় বিষাদ। যে মনে কামনা নেই সে মন কাঁদবে বা হাসবে কেন? ওর মুখমণ্ডল যেন আনন্দের প্রতিমূর্তি। ওর দিকে দৃষ্টি পড়লেই দর্শকের চোখ পরিপূর্ণ হ'ত পবিত্র এক স্বর্গীয় আনন্দে।

সমাপ্ত

দুটি গল্প

বরানুগমন

আজ বাবু দেওকীনাথ, তাঁর পনের বছরের বিয়ে করা স্ত্রীকে ত্যাগ করে নতুন করে বিয়ে করতে চলেছেন। ইতিমধ্যেই আত্মীয় স্বজনরা সব এসে জড়ো হয়েছেন। কিন্তু কেউই একথা জিগগেস করার কষ্টটুকু পর্যন্ত করছেন না যে, এই অসহায়ার প্রতি বাবু দেওকীনাথের এত ক্রোধ কেন? কেনই বা তাঁর কাছে ও খারাপ হল? দ্বারে নহবত বাজছে। অন্দর মহলে মেয়েরা বিয়ের গান গাইছে। চাকর-বাকররা রঙদার উর্দি পরে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। বরযাত্রীরা যে যার সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত। কিন্তু এই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে যে এক সরল মেয়ের জীবনকে হত্যা করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারো কোন পরোয়া নেই।

আজ থেকে পনের বছর আগে যখন দেওকীনাথের বিয়ে ফুলবতীর সঙ্গে হয় তখন সে ছিল সুন্দরী, সদস্বভাবা, মধুরভাষিণী এবং শিক্ষিতা। দেওকীনাথও ছিলেন রুচিসম্পন্ন ভদ্র ব্যক্তি, ধীর স্বভাব এবং সুরসিক। কিন্তু বিয়ের প্রথম রাতেই বর-কনের মধ্যে এমন কিছু মনোমালিন্য হয় যাতে পরবর্তী সময়ে দুজনের মধ্যে ভীষণ রকমের একটা ব্যবধান গড়ে ওঠে। এবং সময়ের গতির সাথে সঙ্গে তা বিস্তৃত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধান এমন অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে, আজ দেওকীনাথকে নতুন করে বিয়ে করতে যেতে হচ্ছে।

এই মনোমালিন্যের কারণ কি ছিল, যার থেকে দুজনের মধ্যে এই দুস্তর ব্যবধান?

কারণ, দেওকীনাথ ছিলেন প্রাচীন রীতির অনুরাগী আর ফুলবতী ছিল নব্য চেতনায় আলোক প্রাপ্তা। প্রাচীন রীতি চায় আব্রু (পর্দা), চায় সহনশীলতা আর ধৈর্য। নব্য চেতনা চায় স্বাধীনতা। চায়

ব্যক্তিত্বের সম্মান। পারিবারিক অনুশাসনে অনুরক্ত দেওকীনাথ চাইতেন—ফুলবতী তাঁর মায়ের সেবা করুক। অনুমতি বিনা ঘরের বাইরে পা না রাখুক। দীর্ঘ ঘোমটা টেনে ঘোরাফেরা করুক অন্দর মহলের চৌহদ্দির মধ্যে। কিন্তু ফুলবতীর এগুলোর একটাও পছন্দ হত না। ফলতঃ দুজনের মধ্যে জেদাজেদি শুরু হল। শেষে প্রচণ্ড ঝগড়াও হয়ে গেল। বীর্য আহত হল। স্বামী তাঁর স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকজনেদের অপমান করলেন। স্ত্রীও তার শোধ তুলতে চোখা চোখা জবাব দিল। স্বামী স্ত্রীকে ধমকালেন। তাইতে অপমানিত বোধ করে স্ত্রী বাপের বাড়ির পথ ধরল। ফুলবতীর বাপের বাড়িও দূরে ছিল না। দশ মিনিটের মধ্যেই সে সেখানে পৌঁছে গেল। মাসের পর মাস দুজনে রেগেই রইল। তারপর ফুলবতীকে শান্ত করিয়ে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে আসা হল। কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি—না দেওকীনাথ নিজের ব্যবহার শোধরাতে পারলেন, না ফুলবতী শোধরাতে পারল তার চাল-চলন। এবার দুজনের মধ্যে বছরের পর বছর কথা বন্ধ রইল। শেষে বন্ধুবান্ধবদের অনেক বোঝানয়, দেওকী-নাথ তৃতীয়বার স্ত্রীকে মেনে নিয়ে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু এবারের ঘটনার পেছনে এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার ছিল যার থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ পাকাপাকি হয়ে গেল। না ইনি ডাকলেন, না উনি এলেন। আর তাই স্বামী বাবাজী নতুন বিয়ের সানাই বাজিয়ে বুকের জ্বালা জুড়বার ব্যবস্থা করলেন। ফুলবতীর জন্য এটা নিশ্চয় স্বাধীনতা! কিন্তু এ যদি তার যথার্থ স্বাধীনতাই হত, তাহলে দেওকীনাথ কি তাঁর এই নতুন বিয়ের জন্য এত তৎপর হতেন?

দেওকীনাথের মা সিন্দুকে গয়নাগুলো গুছিয়ে তুলছিলেন। নতুন বধূ লাভের আনন্দে তিনি এখন মেতে আছেন। এর ওপর আবার শুনতে পেয়েছেন যে মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমতী, সেবাপরায়ণা এবং লজ্জাশীলা। আর কি চাই! সেই লক্ষ্মী প্রতিমা ঘরে আসা মাত্রই ঘরের চেহারাই হয়ে যাবে অন্যরকম! প্রতিবেশিনীরা কিন্তু খোঁচা মারতে ছাড়ল না—নতুন বৌ খুব লেখাপড়া জানা হবে নিশ্চয়।

উত্তরে শাশুড়ী ঠাকরুণ মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বললেন—আমার মেম সাহেবের দরকার নেই। অমন লেখাপড়া জানায় দণ্ডবৎ! আমার চাই এখন গেঁয়ো বউ। বুঝেছ?

মুন্সীজী দরজায় এসে বললেন—ভাই, তাড়াতাড়ি কর। গাড়ি ছেড়ে দেবে। এরপর আর কোন শুভক্ষণ নেই। ভেতর থেকে শাশুড়ী উত্তর দিলেন—আপনি নিজের কাজ দেখুনগে। আমার কোন দেরী নেই। দর্জিকে ডাকিয়ে দিন। বরকে কাপড় পরিয়ে দিক।

দর্জি এসে জোড় পরাল বরকে। মালী মুখের ওপর ফুলের ঝালর বেঁধে দিল। চাকর দিল জুতো পরিয়ে। পিসে পাগড়ী বেঁধে দিলেন মাথায়। পিসিমা চোখে কাজল টেনে দিলেন। মামাবাবু উদিত হয়ে মঙ্গল সূত্র বাঁধলেন। বর, মানুষ থেকে ক্রমে রূপান্তরিত হল বাঁদরে! পঁয়তাল্লিশ বছর হবে বয়স। কিছু কিছু চুলে পাকও ধরেছে। দু-চারটে দাঁতও ইতিমধ্যে জবাব দিয়েছে। মুখে ভাঁজ পড়ে গেছে কম-বেশী! কিন্তু সাজগোজ এমনই হয়েছে যেন উঠতি যুবক!

২

এদিকে ফুলবতীর বাবার কাছে খবর গিয়ে পৌঁছাল, দেওকীনাথ বিয়ে করতে চলেছেন। পিতা মহাশয় চিন্তাসমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন! আগে থেকে খবর পেলে, হাতে পায়ে ধরতেন। কিন্তু এখন তো বরানুগমনের জন্য সব তৈরী! এই শেষ মুহূর্তে উনি কিই বা করতে পারেন! ভাবছিলেন—আমাদের চেয়ে নীচু জাতেরাই ভাল। ওদের অন্তত লোক কুটুম্ব এবং জ্ঞাতি বন্ধুদের ভীতি আছে। আমরা ফালতু কোমর বেঁধে লড়তে নেমে যাই। হায়! ফুলবতী একথা জানতে পারলে ওর কি দশা হবে! আজ পনের বছর কেটে গেল, কি সুখটা ও পেল? বিধবার জীবন কাটাচ্ছে। তার ওপর আবার এই নতুন বিপত্তি! এই অযাচিত নতুন আঘাত ও সইবে কেমন করে!

ফুলবতী, সেই মানের জন্য জান দেনেওয়ালী মেয়েদের মধ্যে পড়ে, যে মনের মধ্যে এক কথা রেখে পিছু হটতে জানে না। যদি ও কিছুটা

নরম হতে পারত তাহলে ওর জীবন আরাম-আয়াসেই কেটে যেত।
কিন্তু পনের বছরের ঔদাসীন্যও ওর জেদের ওপর জয়ী হতে পারেনি।
যেই এ খবর পেল ও স্থির সিদ্ধান্ত করে নিল—আমি বেঁচে থাকতে
এ বিয়ে হবে না। কিছুতেই হতে দেব না। নতুন বৌ-এর সঙ্গে
জীবনের সৌন্দর্য ভোগ করার কোন অধিকারই ও পেতে পারে
না। আমি যদি কেঁদে কেঁদে জীবন কাটাই তাহলে তোমাকেও
আমার মতই জ্বলতে হবে। তুমি আমার বুকের ওপর যাঁতা পিষতে
পারবে না। বাড়িতে ওর এই সিদ্ধান্তের আঁচটি পর্যন্ত ও কাউকে পেতে
দিল না। ওর বাবাকেও কোন কিছু জানাল না। চুপি চুপি বাড়ি থেকে
বেরিয়ে একটা টাঙ্গা ভাড়া করে শ্বশুরবাড়ি চলল। যেতে যেতে চিন্তা
করছিল—আজ জীবনের শেষ বোঝাপড়া করব। দেখিয়ে দেব যে
আজও ভারতে এমন মেয়ে আছে যে নিজের কথা রাখার জন্য হাসতে
হাসতে প্রাণ দিতে পারে। সে সুখ সম্ভোগের জন্য বেঁচে থাকে না,
বেঁচে থাকে আত্মমর্যাদার ধর্ম পালনে। ওর অবস্থা তখন প্রায়
উন্মাদিনীর মত। কখনো আপন মনেই হাসছে, কখনো কান্নায় ভেঙে
পড়ছে। আপন মনে বিড়বিড় করে কি সব এক নাগাড়ে বকে যাচ্ছিল
বোঝার উপায় ছিল না। এই অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি থেকে অনেক দূরে
ও চলে গেল। হুঁশ হতে টাঙ্গাওয়ালাকে জিগগেস করল—ভাই, এটা
কোন পাড়া ?

টাঙ্গাওয়ালা বলল—এটা কাট্‌রা।

বাঃ! তুমি এখানে কোথায় নিয়ে এলে ? আমার যে সবজী-মণ্ডী
যাবার কথা ছিল!

তা আপনি আগে বলেননি কেন ? ওদিকে দিয়েই তো এলাম।
খেয়াল করেননি ?

আমার খেয়াল ছিল না কোন।

কেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি ?

মেলা বকবক কোরো না, টাঙ্গা ঘুরিয়ে নাও।

আধঘণ্টার মধ্যেই টাঙ্গা দেওকীনাথের দরজায় এসে পৌঁছল।

বরানুগমনের জন্য সব কিছুই তৈরী। ফুলে সাজান মোটরে বর বসেও পড়েছে। বাজনা বাজছে। এই রঙ্গ দেখে ফুলবতীর বুকটাতে সাপের মত আছাড়-পাছাড় করছিল। ওর মনে হল—ইঁদারার (বড় কুয়ো) ঝাঁপ দিই, যাতে জীবনটা এখনই শেষ হয়ে যায় আর তো আমার আকাঙ্ক্ষা বলতে কিছুই রইল না, তবে আর বেঁচে থেকে কি লাভ। মরাই তার চেয়ে ভাল! প্রথমে ওর চিন্তা হল— আমি কেননা ওর বুকের ওপর চেপে বসি। ওকে আঘাত করে অন্য কাউকে বিয়ে করি ওরই মত। দেখি তখন ভদ্রলোক কি করেন আমার! কিন্তু এই চিন্তাকে ও মুহূর্ত মধ্যেই ঝেড়ে ফেলে দিল—না, মেয়েদের নামের ওপর কলঙ্কের কোন ছাপ আমি এঁকে দেব না। আমার বংশের বদনাম আমি করব না। তেমন, এই ভদ্রলোককেও বরযাত্রী নিয়ে যেতে দেব না. তাতে আমার প্রাণ যদি যায় তো যাক।

মোটর হর্ন বাজাল। ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এমন সময় ফুলবতী টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে পড়ে মোটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দেওকীনাথ ওকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন —তুমি এখানে এসেছ কেন? কে ডেকেছে তোমাকে এখানে?

ফুলবতী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল—নেমন্তন্নের আমার কোন দরকার ছিল না।

দেওকীনাথ—আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার মুখ দেখতে চাই না।

ফুলবতী—তুমি বিয়ে করতে যেতে পারবে না।

দেওকীনাথ—তুমি আমায় আটকাবে?

ফুলবতী—হয় আটকাব, নয়তো প্রাণ দেব!

দেওকীনাথ—যদি প্রাণ দিতে চাও তো কুয়োয় ঝাঁপ দাওগে, কিংবা বিষ খাও। আর তা যদি মুরোদে না কুলোয় তো আর একটা বিয়ে করে নাও, নয়তো কারো হাত ধরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়। আমি তোমাকে আটকাচ্ছি না। প্রতিজ্ঞা করছি, টুঁ শব্দটিও করব না।

খামকা আমার পিছে পড়ে আছ কেন? রেহাই দাও আমায়। তোমার জন্যে অর্ধেক জীবনটাই তো নষ্ট করে দিয়েছি। আর আমার বোঝার শক্তি নেই। কথা শোন। পথ ছাড়ো। নইলে আমি গাড়ী চালিয়ে দেব কিন্তু।

ফুলবতী—আমিও তাই চাই। আমাকে পায়ে দলে পিষে তবেই তুমি যেতে পার।

দেওকীনাথ—তুমি কি চাও, অ্যাঁ? সারাটা জীবন তোমার নাম জপ করে কাঁদতে থাকি? যে মেয়ে স্বামীর সঙ্গে শত্রুতা করে তার মুখদর্শন করাও পাপ।

ফুলবতী—আমি তোমাকে আমার মুখ দেখাতে আসিনি।

দেওকীনাথ—তাহলে ছেনালী করছ কেন? কোন জাহান্নমে গিয়ে মুখে কালি মাখলেই তো পার? তোমার মত মেয়েদের চরিত্র আমার খুব জানা আছে!

ফুলবতী রক্ত চোখে তাকিয়ে বলল—একটু মুখ সামলে কথা বল, নইলে আমার শাপ লাগবে। সব কিছু আমি সইতে পারি, কিন্তু আমার অপমান আমি সহ্য করতে পারি না কিছুতে।

দেওকীনাথ কুৎসিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়ে বললেন—যাঃ! যাঃ! এমনিতে তো তুই পরম সতী!

ফুলবতী—যে নিজেই অসৎ অন্যের কাছে তার সততা আশা করার কোন অধিকারই নেই।

দেওকীনাথ তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে এসে বললেন—সামনে থেকে সরবি কি না?

ফুলবতী জেদের সঙ্গে ঘাড় শক্ত করে বলল—ন্না।

দেওকীনাথ দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—সরে যা, নইলে চাপা দিয়ে দেব কিন্তু। তখন তোর সব তেজ গুঁড়িয়ে ধুলোয় একেবারে মিশে যাবে, বুঝলি!

ফুলবতী—তোমার সে এখতিয়ার (অধিকার) আছে। যা ইচ্ছে হয় করো। আমি তো একবার বলেই দিয়েছি, আমি সব কিছু

সহ্য করতে পারি শুধু আমার অপমান সহ্য করতে পারি না!

দেওকীনাথ—আবার বুঝিয়ে বলছি, সরে যা, নইলে চাপা দিয়ে দেব। গর্ধব কোথাকার!

ফুলবতী—তাহলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নাও। মুখ খারাপ কেন করছ? আমি মনস্থির করেই এখানে এসেছি। আমি বেঁচে থাকতে, শান্তিতে তুমি থাকতে পাবে না।

দেওকীনাথ—আমি তো তোকে বলেছিই, কারো সঙ্গে চলে গিয়ে বিয়ে করে নে। কথায় যদি না হয় আমাকে দিয়ে তোর 'না-দাবীনামা' লিখিয়ে নে? আমি চাই না তুই আমার নাম ধরে কান্নাকাটি করিস।

ফুলবতী—আমার বিয়ে তো এবার দেবতার ওখানে গিয়ে হবে। কিন্তু বেঁচে থাকতে এই অন্যায় বিপত্তি সহ্য করতে পারব না।

আর সহ্য করতে পারলেন না দেওকীনাথ। ড্রাইভারকে বললেন—গাড়ী ছাড়? যা হবার হোক, দেখা যাবে। আমাকে হুমকী দেওয়া হচ্ছে! শয়তান কোথাকার!

ড্রাইভার গাড়ী চালাতে অস্বীকার করল। জেনেশুনে একটি মহিলার ওপর গাড়ী চালিয়ে নিজের প্রাণটাকে বিপদে ফেলতেও চাইছিল না। বেঁচে-বর্তে থাকলে ভিক্ষে করে খাবে। তবু এমন চাকরীতে ওর দরকার নেই! ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে সোজা হাঁটা দিল।

ফুলবতী যেন চাবুক ওঠাল—তুমি কি আমায় মরার ভয় দেখাচ্ছ? মরণে সেই ভয় পায়, ভোগ বিলাসের লোভ যার আছে। মরার জন্যে তৈরী হয়েই তো এখানে এসেছি। আর বেঁচে থেকে আমার করারই বা কি আছে? কান্নায় কান্নায় জীবনটা ভরে গেছে। আর কাঁদার শখ নেই আমার।

দেওকীনাথের রাগ এবার চরমে উঠল। মানুষের বিবেক বুদ্ধি যখন নষ্ট হয়ে যায়, সে অন্ধ হয়ে পড়ে। এতগুলো লোকের সামনে সামান্য একটা নারীর কাছে হেনস্থা হতে তাঁর পৌরুষে বাধছিল। এবার জিঘাংসা ভরে স্থির নিশ্চয়তার জোরে হর্ন

বাজালেন।

ফুলবতী একবার চমকে উঠল। অস্তিত্ব রক্ষার প্রাকৃতিক ধারার প্রভাবে সরেও গেল এক পা। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে মোটরের সামনে শুয়ে পড়ল। ওর তূণীরে এটাই ছিল শেষ বাণ!

দ্বিতীয়বার হর্ন বাজল।

ফুলবতী নড়ল না। ওর চোখ দুটো বন্ধ। মনে হচ্ছিল, ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। যেন নিষ্প্রাণ পড়ে আছে ওর দেহ।

মোটর তৃতীয়বার হর্ন বাজাল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর ফারাও-এর মত দ্রুত এগিয়ে এল। একটা বুকফাটা আর্তনাদ শোনা গেল। গাড়ী এগিয়ে চলল সামনের দিকে, বেপরোয়া।

নরম জমির ওপর পড়ে আছে ফুলবতীর রক্তাক্ত দেহ। সেতারের চোট খাওয়া তারগুলোর মত তা কাঁপছে থরথর করে।···যে কখনো স্বামীর কটু কথাটুকু পর্যন্ত সহ্য করতে পারেনি সে কি এই চরম অপমান সহ্য করতে পারত!

দৃশ্যটা এমনই বেদনাময়, এমন ঘৃণাপূর্ণ আর ভয়াল যে, হাজার হাজার কৌতুক উপভোগকারী দর্শকের চোখে রক্ত উছলে পড়ল। সামুহিক বৃত্তিকে সর্বদা পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হয়। কারণ অনিয়ন্ত্রিত খেয়ালের বশে মানুষ সব কিছুই করে ফেলতে পারে। বন্যা যদি মানুষকে ডোবায় (ক্ষতি করে) তাহলে জমিও শস্য দেয়। কিন্তু ক্ষেতের ধারে বহতা নদীর বদান্যতায়, কর্মক্ষমতা কোথায়!

অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা ক্রোধপূর্ণ রোষ এই জনসমাবেশের ওপর দিয়ে যেন বন্যার বেগে প্লাবিত হল। 'খুনের বদলা খুন'-এর দুর্নীতিতে প্রবৃত্ত হল ওরা। এই ধরনের জমায়েতের প্রকৃতিই হল, আইনের ওপর যথেচ্ছ অধিকার ফলান।

শয়ে শয়ে লোক এক অন্ধ উন্মাদনায় মোটরের পিছনে ছুটল। দেওকীনাথকে গাড়ী থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনল। তারপর, রক্তপিপাসু পিশাচের মত চারদিক থেকে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওঁর ওপর। কয়েক মুহূর্ত মাত্র! বিয়ের সাজে বর, তার অতৃপ্ত কামনা বাসনা নিয়ে

পরিণত হলো এক অস্থিপুঞ্জে। মাথায় রক্তে রাঙা সেহরা (টোপর), গোড়ালি ছুটে। মাটির ওপর রগড়াতে রগড়াতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন দেওকীনাথ।

দুটো মৃতদেহ (লাশ) সামনাসামনি পড়ে আছে। দুজনেরই ওপর কৌতূহল বর্ষিত হচ্ছে সমানভাবে। কে হত্যাকারী! হতই বা কোন্ জন?

রাতের গভীর প্রহরে, দুটি শবদেহ পাশাপাশি যাত্রা করল। ঢোল-সাইয়ের মিঠে সুরের বদলে উঠছিল করুণ বিলাপের উচ্চ রোল।

এ ছিল এক নতুন বরানুগমন!

[মূল হিন্দী নাম 'বারাত']

সুধারস

ডাক্তার ঘোষ ছিলেন এক বিচিত্র মানুষ; একবার উনি, ওঁর চার বন্ধুকে নিজের ল্যাবরেটারিতে ডেকে পাঠান। চার বন্ধুরই বেশ নাম ডাক। ওঁদের মধ্যে তিনজন এত বয়স্ক যে ওঁদের দাঁড়ি গুম্ফ্ সাদা হয়ে গেছিল। বন্ধুদের নাম, বাবু দয়ারাম, ঠাকুর বিক্রম সিংহ, আর লালা কড়োরী মল। চতুর্থজন ছিলেন এক বিধবা রমণী, যাঁর নাম শ্রীমতী চঞ্চল কুঁয়র। বার্ধক্য ওঁদের দেহে তার ছাপ ফেলেছিল নিয়ম মতই। বার্ধক্যের ভারে নুাজ এই চার বন্ধুই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে অত্যন্ত মনমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। জীবন ওঁদের কাছে তিক্ত হয়ে উঠেছিল। আর সবচেয়ে বিড়ম্বনা এবং যন্ত্রণার বিষয় এই যে তখনও ওঁরা ছিলেন জীবিত।

এক সময়ে লালা কড়োরীমল ছিলেন এক সম্পন্ন মস্ত ব্যবসায়ী। কিন্তু সমস্ত সম্পদ সাট্টায় উড়িয়ে দিয়ে শুধুমাত্র ভদ্র ভিক্ষাবৃত্তি পুঁজি করে সেই সময় উনি দিন গুজরান করছিলেন।

ঠাকুর বিক্রম সিংহ, ভোগবিলাস এবং আমোদ-প্রমোদের ভক্ত দাস। শুধু মাত্র সম্পদই নয়, উনি ওঁর স্বাস্থ্য মায় নৈতিক বোধটুকু পর্যন্ত ভোগলিপ্সার যূপকাষ্ঠে বলিদান দিয়েছিলেন। ফলে শরীরটিকে অসংখ্য রোগের আড়তখানা তৈরী করে ক্লান্ত হৃদয়ে মৃতবৎ কোন রকমে টিঁকে ছিলেন। বাবু দয়ারাম, কোন এক সময়ে ওকালতি ছিল ওঁর পেশা। জাতীয় আন্দোলনেও নাকি উনি আংশিক ভাবে সামিল হ'ন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে ওনার বেশ বদনাম হয়। পরিশেষে, সবাই ওঁকে পরিত্যাগ করে এবং অকর্মণ্যের পঙ্গুতায় ঘরের নিভৃত

কোণে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে ওঁকে বাধ্য করে। বাকী থাকলেন শ্রীমতী চঞ্চল কুঁয়র। এমন একটা সময় ছিল যখন ওঁর রূপের জৌলুস লোকের চোখ ধাঁধাত। অনেককাল ধরে শহরের পবিত্র তীর্থস্থানগুলিতে অনায়াস যাত্রায় ওঁর সুনামও হয় যথেষ্ট। ফল স্বরূপ শহরের মান্য-গণ্য ব্যক্তিরা, এমন কি আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবর্গরাও ওঁকে সভয়ে এড়িয়ে চলত। কড়োরীমল, দয়ারাম এবং বিক্রম সিংহ—এই তিন মহাশয়, এক সময়ে চঞ্চল কুঁয়রের প্রণয়ী ছিলেন। শ্রীমতীকে ঘিরে ওঁদের মধ্যকার মনোমালিন্য একবার নাকি খুনোখুনির পরিস্থিতিও সৃষ্টি করে। কিন্তু এখন সে সব অতীত দিনের কথা, শুধু স্বপ্ন আর স্মৃতিতে বিলীন হয়ে গেছে।

যাই হোক, চার বন্ধু এসে হাজির হলে পর ডাক্তার ঘোষ ইঙ্গিতে ওঁদের আসন গ্রহন করতে বলে ঘোষণা করলেন—ভাইসব, তোমাদের বেশ ভালমতই জানা আছে যে, আমার সামান্য সময়টুকু পর্যন্ত নিজের অভিজ্ঞতা অর্জনে আমি ব্যয় করে থাকি; অর্জিত অভিজ্ঞতার একটিকে কার্যকরী করে তোলার জন্য আজ তোমাদের সাহায্যের অত্যন্তই প্রয়োজন।……জনশ্রুতির ওপর যদি আস্থা রাখা যায়, তাহলে ডাক্তার ঘোষের এই রসায়নাগারটি ছিল এক আজব-খানা। পুরোন আমলের অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে একটা ঘর। মাকড়সার জাল জানলার পর্দার কাজ সারত। ঘরের মেঝেয় ছিল বহু বছরের জমা হওয়া ধুলোর ফরাস। দেওয়ালের গায়ে লাগান বেশ কয়েকটা শাল কাঠের বড় বড় আলমারী। বাছাই করা সব বই তাতে সাজান থাকত। মাঝের একটা আলমারীতে ছিল ভৈরবের একটা মূর্তি। কিছু মানুষের ধারণা, ডাক্তার ঘোষ যখন কোন মুশকিলে পড়তেন তখন এই মূর্তির সঙ্গে সলা পরামর্শ করতেন। ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণটায় সরু, লম্বাটে ধরনের আলমারীতে একটা মানুষের কঙ্কাল থাকত। যার অংশবিশেষ মাত্র দৃষ্টিগোচর হত। ওরই কাছে দুটো আলমারীর মাঝখানে ছিল একটা আবছা আয়না। যার সুদৃশ্য ফ্রেমে ধুলোর পরত পড়ছিল। জনশ্রুতি যে, স্বাস্থ্যোদ্ধার আকাঙ্ক্ষায় যে সমস্ত রোগীরা ডাক্তার

সাহেবের কাছে আসত তাদের মধ্যে যারা মৃত, তাদের আত্মা নাকি এই আয়নার মধ্যে বাস করত। কোন সময় যদি ডাক্তার সাহেব আয়নার দিকে তাকাতেন তখন তারা আয়নার পটে দৃশ্য হয়ে ডাক্তার সাহেবের দিকে ফিরে তাকাত। ঘরের অপর এক দিকে এক সুন্দরী মেয়ের প্রমাণ মাপের একটা ছবি ছিল। কাল প্রবাহে ছবির চেহারা এবং পোশাকের রঙ্ জ্বলে গেছিল। পঞ্চাশ বছর আগে ডাক্তার সাহেব এই সুন্দরীকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বিবাহের ঠিক চোদ্দদিন পূর্বে নিজ আকাঙ্ক্ষিত ডাক্তার সাহেবের ঔষধ সেবন করে মেয়েটি ইহলোক ত্যাগ করে। ঘরের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তুটির উল্লেখ করা এখনও বাকী রয়েছে। বস্তুটি হল কালো মলাটের স্থূলকায় একখণ্ড বই ; বইটির নাম কারো জানা ছিল না। কিন্তু সবাই জানত যে এটি যাদু-বিদ্যার বই। একবার ডাক্তার সাহেবের এক চাকর ধুলো ঝাড়বার জন্য বইটাকে উঠিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক সব কাণ্ডকলাপ ঘটতে শুরু করে—সুন্দরীর ছবিটা এক পা এগিয়ে এল। আর হঠাৎ ভয়ংকর সব মূর্তি (মুখ) আয়নায় উঁকি মারতে লাগল। এটুকুতেই ক্ষান্ত হল না, ভৈরবের মূর্তির চেহারা গেল বদলে। আর তার মুখ দিয়ে থামো—থামো, আওয়াজ বেরুতে লাগল।

ডাক্তার ঘোষের মুখ থেকে তার অভিজ্ঞতার উল্লেখ শুনে চার বন্ধুই ভাবল,—হয় আমাদের বাতাসশূন্য কাঁচের নলে কোন ইঁদুরের মৃত্যুর তামাসা দেখান হবে—নয়তো বা কোন সুদূর বর্ণনাতীত বিষয়ের আলোচনা চলবে। কেননা, এরকমই অনেক অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ করার জন্য ডাক্তার সাহেব এর আগেও নিদেন পক্ষে বার কুড়ি ওঁর বন্ধুদের বিরক্ত করেছেন। এই অভিজ্ঞতা প্রয়োগের ব্যাপারটি ওঁদের কিন্তু কিছুমাত্র বেশী উৎসাহিত করে তুলতে পারল না। ডাক্তার ঘোষ ওঁদের জবাবের অপেক্ষা না করেই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঘরের অন্য কোণ থেকে সেই ভয়ংকর বইটাকে উঠিয়ে আনলেন—যা আম জনতার ভাষায়, যাদু-বিদ্যার বই নামে খ্যাত ছিল। বই খুলে তার পাতার মধ্য থেকে উনি একটা চ্যাপটানো শুকনো গোলাপ ফুল বার করলেন, যেটি

কোন এক সময় তরতরে তাজা ছিল। কিন্তু তখন এর পাপ্‌ড়িগুলো পর্যন্ত শুকিয়ে এমন মুচ্‌মুচে হয়ে গেছিল যে হাত ছোঁয়ান মাত্র ঝুর ঝুর করে তা ঝরে পড়ত।

ডাক্তার সাহেব বিষণ্ণ স্বরে থেমে থেমে বললেন—আজ এই ফুলটি শুকিয়ে গেছে এবং হাত দেওয়া মাত্রই চুরচুর হয়ে ভেঙে যাবে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে এটি তরতরে তাজা ছিল। ফুলটি সেই সুন্দরী মহিলা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন যাঁর পূর্ণাঙ্গ ছবি আপনাদের সামনে টাঙানো দেখতে পাচ্ছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ফুলটি এই বই-এর পাতায় সমাধিস্থ রয়েছে। ইচ্ছা ছিল আমাদের বিবাহের দিন এটিকে আমার পোশাকে আটকে দেব। থাক সে কথা, আপনারা কি বলেন, অর্ধশতাব্দীর ম্রিয়মান এই ফুলটি কি আবার তাজা হয়ে উঠতে পারে? শ্রীমতী চঞ্চল কুঁয়র তাচ্ছিল্য ভরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—এটা তো ঠিক তেমনই কথা হল, হঠাৎ কেউ যদি ঘোরের মাথায় জিগ্‌গেস করে বসে—মশাই, কোন বৃদ্ধা রমণীর কুঁচকানো চামড়া কি আবার যৌবনবতীর মত টান্‌টান্ আর চিকন হয়ে উঠতে পারে?

বেশ খানিকটা বিরক্ত হয়েই ডাক্তার সাহেব যেন হুকুম জারি করলেন—তবে গ্যাখো—, একথা বলেই উনি টেবিলের ওপর রাখা কাঁচের জারটার ঢাকনা খুলে হাতের শুকনো ফুলটিকে তার জলে চোবালেন। প্রথমে কিছুক্ষণ ফুলটা জলের ওপর ভেসে রইল। জলের কোন প্রভাবই এর ওপর নজরে পড়ল না। এরপর পলকের মধ্যেই আশ্চর্যজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। চেপ্টে যাওয়া শুকনো পাপড়িগুলো পাখা মেলল। ধীরে ধীরে তা গোলাপ বর্ণ ধারণ করল। মনে হল যেন এক গভীর নিদ্রা ভঙ্গ করে ফুলটা জেগে উঠছে। বোঁটা ডাঁটাল হল। পাতাগুলো হয়ে উঠল সজীব-সবুজ। এবং পঞ্চাশ বছরের মিয়োনো ফুলটা ঠিক নববিকশিত পুষ্পের মত তাজা হয়ে উঠল। পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার তখনও কিছু বাকী আছে এমন সময়, মাঝখানের কুঁক্‌ড়ে থাকা পাপ্‌ড়িগুলোর ওপর দু ফোঁটা চক্‌চকে

শিশির বিন্দু নজর কাড়ল।

ডাক্তার সাহেবের বন্ধুরা প্রায় বেপরোয়া ভাবেই বলে উঠলেন—তামাশাটা বেশ ভালই জমিয়েছ! কিন্তু এখন বলতো বন্ধু, এটা সম্ভব করলে কেমন করে? যাদুকরজের কাছে ওরা এর থেকেও কত আশ্চর্য কেরামতি দেখেছেন, এ তো ছার।

উত্তরে ডাক্তার ঘোষ বললেন—তোমরা কি 'ঘোর প্রলয়ের অন্ধকার'-এর কথা শোননি?

দয়ারাম—শুনেছি বৈকি! কিন্তু ওখানকার জল কার কবে জুটল?

ডাক্তার ঘোষ—এই জন্যেই জোটেনি, কারণ কেউ তার উচিত মত খোঁজ করেনি। এখন গবেষণা করে জানা গেছে যে, 'প্রলয়ের অন্ধকার'-এর মধ্যে সুধারসের একটা ছোট্ট নদী আছে। তার পাড়ে বড় বড় গাছ আছে যা বহু শতাব্দীর প্রাচীন হওয়া সত্বেও আজও তরতাজা। এই গবেষণার অনুরাগী জেনে আমার এক বন্ধু তার অল্প একটু জল আমাকে পাঠিয়েছে। সেই জলই ভরা আছে এই জারে।

এই সব আজগুবি কথা ঠাকুর বিক্রম সিংহের একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। খানিকটা সন্দেহ নিয়েই প্রশ্ন করলেন—তা হয়তো হবে! কিন্তু বল তো ভাই, এই জলের প্রভাব মানবদেহেও পড়তে পারে কি না?

ডাক্তার ঘোষ—এই মুহূর্তেই তোমার এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। তোমরা সবাই বিনা আয়াসে এই জল পান কর যাতে তোমাদের হৃত যৌবন আর একবার ফিরে আসে। আমার তো যোয়ান হবার কোন বাসনা নেই। কারণ বহু কষ্ট স্বীকার করে এই বৃদ্ধ দশায় এসে পৌঁছেছি। যদি তোমাদের যুবক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে তাহলে আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়, এবং এই জলের কার্যকরী গুণাগুণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। কথা শেষ করে উনি চারটে কাঁচের গেলাসে জারের জল ভর্তি করতে লাগলেন। এই জলে, জীবন-দায়ী কোন শক্তি অবশ্যই ছিল, কারণ জলের তলা থেকে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ ক্রমাগত উঠতে লাগল। ওগুলো ওপরে

উঠে ঝলমলে ফোয়ারা হয়ে ভেঙে যাচ্ছিল। এ ছাড়া মনমাতানো এক সুগন্ধ বের হচ্ছিল তার থেকে। সব মিলিয়ে এবার বন্ধুদের জলের প্রভাব সম্বন্ধে খানিকটা বিশ্বাস জন্মাল। তবু এতটা বিশ্বাস ওঁদের তখনও হয়নি যে এই জল পান করে কোন বৃদ্ধ তার হৃত যৌবন ফিরে পেতে পারে। তবু, ওঁরা সবাই জল পান করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এ বিষয়ে বন্ধুদের এত আগ্রহ দেখে ডাক্তার ঘোষ ওঁদের ব্যাপারটিকে আগাগোড়া ভালভাবে ভেবেচিন্তে দেখার জন্য আবেদন করে বললেন—আমার প্রিয় এবং বিচক্ষণ বন্ধুরা, সম্পূর্ণ একটা জীবনের অভিজ্ঞতা তোমরা ইতিমধ্যেই অর্জন করেছ। এজন্য এই সুধারসে অবগাহন করার আগে তোমরা এমন একটা জীবনের আকাঙ্ক্ষা উন্মূল করে নাও যাতে যৌবনের দুঃখ বেদনাগুলো তোমাদের জীবনকে দ্বিতীয় বার না বরবাদ করে এবং এইভাবে সুধারসের আনুকূল্যে বার্ধক্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘাঁটিটি সুকৌশলে অতিক্রম করতে পার। ভেবে দেখ, শীততাপান্বিত যুগের এত অভিজ্ঞতার পরও তোমরা যদি চরিত্র রক্ষায় নব যৌবনের দুনিয়ায় আদর্শ না হতে পার তাহলে তা কতখানি লজ্জার কথা হবে ?

ডাক্তার সাহেবের এই অর্থহীন উপদেশ শুনে ওঁদের চোখ মুখে একটা হাল্কা হাসি উছ্‌লে উঠল। এর কোন জবাব দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না ওঁদের। বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের ফলভোগ করার পরও এই লোকগুলো জেনে শুনে আবার তারই শিকার হবেন, একথা স্মরণ হওয়া মাত্র হাসিরই উদ্রেক হয়।

অত্যন্ত করুণা ভরে ডাক্তার ঘোষ ওদের বললেন—এবার তোমরা নির্ভয়ে এবং সাগ্রহে এই সুধারস পান কর। আমার অসীম আনন্দ হচ্ছে যে আমার অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তোমাদের মত যোগ্য লোক আমি পেয়েছি।

দুর্বল হাতে চারজনে গেলাস উঠিয়ে ঠোঁটে স্পর্শ করাল। যদি সত্যিসত্যিই ডাক্তার সাহেবের কথা মত এই জলের প্রাণদায়ী প্রভাব কিছু থেকে থাকত, তাহলে এই লোকগুলোর চেয়ে ঢের বেশী প্রয়োজন

সম্ভবতঃ আর কারো হতে পারত। আগন্তদের মুখাকৃতি দেখে এমন মনে হচ্ছিল যেন যৌবনের রূপই ওঁরা কোনদিন চাক্ষুষ করেননি আর জন্ম থেকেই ছিলেন এমন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ; এমনই ভঙ্গু'র, হতাশা-তাড়িত এবং পক্ককেশ। ডাক্তার সাহেবের টেবিলটার চারপাশে ওঁরা কুঁজো হয়ে বসে ছিলেন। আসন্ন যৌবনের কোন আনন্দ ওঁদের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য উৎপাদন করতে পারছিল না। ওঁদের দেহে প্রাণ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। জলপান শেষ হলে ক্লান্ত হাতে গেলাসগুলো ওঁরা টেবিলের ওপর রাখলেন।

কিন্তু এরপর একটি পলক মাত্র, ওঁদের দৈহিক অবস্থায় এক আনন্দময় পরিবর্তন লক্ষিত হল। দেহ আলোকিত হয়ে উঠল। ঔজ্জ্বল্য দেখা যেতে লাগল। বর্ণহীন গণ্ডদেশে লাগল লালিমার ছোঁয়া। ওঁরা পরস্পরের দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। অনুভব করলেন যেন কোন বৈদ্যুতিক শক্তি সেই চিহ্নগুলোকে মুহূর্তে মুছে ফেলেছ যেগুলোকে নির্দয় সময় দীর্ঘকাল ধরে ওঁদের শরীরে সযত্নে নকসা কেটেছিল। শ্রীমতী চঞ্চল কুঁয়রের এমন মনে হল যে ওঁর মধ্যে আবার যেন জীবন ফিরে আসছে। অজান্তে উনি মাথায় ঘোমটা টেনে দিলেন।

সবাই খুশিতে সোচ্চার হলেন—আর একটু সুধারস পরিবেশন করা হোক। কিছুটা যোয়ান আমরা নিশ্চয়ই হয়েছি কিন্তু এখনও অনেকটা বাকী থেকে গেছে। এস, তাড়াতাড়ি করে আর এক গেলাস খাওয়াও বন্ধু।

ডাক্তার ঘোষ এতক্ষণ নিজের অভিজ্ঞতার কার্যকারিতা বিজ্ঞের মত অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। ওঁদের কথা শুনে বললেন—সবুর কর! বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছতে তোমাদের অনেক সময় লেগেছিল। যদি যোয়ান হতে আধঘন্টা সময় লাগে, তাহলে তোমাদের এত উতলা হওয়া উচিত নয়। জল এখানে মজুত। যত ইচ্ছে তোমরা পান করতে পার।

কথাগুলো বলে ডাক্তার সাহেব গেলাস চারটে দ্বিতীয়বার ভরলেন। জারেতে এতটা জল ছিল যে শহরের অর্ধেক বৃদ্ধ তা পান করে তাঁদের

নাতি-পুতির সমান বয়সের হতে পারতেন। তখনও গেলাসের জল বুদ্‌বুদ কাটছিল, চারজনে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেবিল থেকে গেলাস উঠিয়ে নিয়ে এক চুমুকেই নিঃশেষ করে ফেললেন। নিশ্চয়ই এটা ছিল সুধারস (অমৃত।) নইলে জল গলা দিয়ে নামতে না নামতেই ওঁদের চেহারায় বিপ্লব ঘটতে লাগল কেন! ওঁদের দৃষ্টিতে তারুণ্যের ছোঁয়া লাগল। ধবধবে সাদা চুল হয়ে উঠল কুচকুচে কালো। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। টেবিলের চারপাশে জরাগ্রস্ত বয়স্কদের স্থানে বসে থাকতে দেখা গেল তিন যুবা পুরুষ আর এক ফুলের মত সুন্দর পুষ্পাঙ্গীকে। ঠাকুর বিক্রম সিংহ মদির নয়নে শ্রীমতী চঞ্চলের দিকে তাকিয়ে বললেন—পেয়ারী চঞ্চল, এখন আশ্চর্য এক লাবণ্য তোমাকে ঘিরে আছে!

ভোরের অরুণিমায় রাতের অন্ধকার যেমন দূর হতে থাকে সেই রকম শ্রীমতী চঞ্চলের বার্ধক্যপীড়িত দেহ ক্রমেই দ্যুতিময় হয়ে উঠছিল। পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে উনি এটুকু বুঝেছিলেন যে, ঠাকুর সাহেবের প্রশংসা সর্বদা সত্যি হয় না। তাই ঠাকুর সাহেবের প্রশংসায় সত্যাসত্য যাচাই করতে শ্রীমতী চঞ্চল ছুটে গিয়ে আয়নায় নিজের চেহারা পরখ করতে লাগলেন। তখনও ওঁর আশঙ্কা, বার্ধক্যের ঘৃণিত স্বরূপ না আবার নজরে পড়ে যায়! বাকী তিনজনের ধরন-ধারণ দেখে মনে হচ্ছিল অবশ্যই এই জলে (রসে) কোন হর্ষোৎপাদক দ্রব্য গুণ আছে। কিংবা এর কারণ হয়তো এটাই হবে যে, বার্ধক্যের বোঝা মাথা থেকে নেমে যাওয়ায়, খুশির প্রাবল্যে ওঁরা উন্মত্ত হয়ে গেছিলেন। বাবু দয়ারাম জাতীয় সমস্যার ওপর হঠাৎই জোর নজর দিচ্ছিলেন। কিন্তু সেই সমস্যার সম্পর্ক, বর্তমান কালের সঙ্গে ছিল, না অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ কালের সঙ্গে, তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ছিল। কখনও উনি উচ্চৈঃস্বরে দেশভক্তি, জাতির সেবা অথবা মানবিক অধিকারের ওপর জোর বক্তব্য পেশ করছিলেন, কখনও কোন গোপন বিষয় সম্বন্ধিত কথা এমন নীচুগলায় চুপিচুপি বলছিলেন যে নিজের কানেই নিজের গলার স্বর অশ্রুত থেকে যাচ্ছিল। কোন সময় আবার থেমে থেমে, খুবই বিনয় নম্র ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন,

যেন কোন বড় হাকিমের সামনে সওয়াল-জবাব দিচ্ছেন। এদিকে ঠাকুর বিক্রম সিংহ ওঁদের কালের এক চালু সুর গুনগুন করতে করতে গেলাসে তাল ঠুকে যাচ্ছিলেন। ওঁর মদির দৃষ্টি শ্রীমতী চঞ্চলের উজ্জ্বল যৌবনের দিকে নিবদ্ধ। টেবিলের অন্য দিকে লালা কড়োরীমল নগদ টাকা আর তেজারতি খাতার হিসাবের নেশায় মশগুল হয়ে ভাবছিলেন—যদি হিমালয়ের গা থেকে বরফের চাঁই কেটে আনা যায়, তাহলে লাভ থাকবে কত। যৌবনমদে মত্তা শ্রীমতী চঞ্চল, আয়নার সামনে নাগাড়ে দাঁড়িয়ে নিজের লাবণ্যময় রূপ দেখতে দেখতে খুশিতে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে আয়নার বুকের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে পরখ করার চেষ্টা করছিলেন,—কোথাও বার্ধক্যের পুরোনো ক্ষত আবার থেকে যায়নি তো। তখনও পর্যন্ত নিজের সৌন্দর্যের ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারছিলেন না উনি। মনটা খুঁতখুঁত করছিল—যৌবনে এর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী ছিলাম। শ্রীমতী চঞ্চল শেষে মাথায় ঘোমটা টেনে টেবিলের কাছে এসে বললেন—ডাক্তার সাহেব, দয়া করে আর এক গেলাস সুধারস আমাকে দিন।

ডাক্তার ঘোষ হেসে বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে নিন, এই যে, আমি গেলাস ভরে দিচ্ছি।

সুধারসে পূর্ণ গেলাসগুলো টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ওর থেকে বিচ্ছুরিত সূক্ষ্ম জলকণাগুলো হীরের কুচির মত চমক্ দিচ্ছিল। সূর্য ডুবে গেছিল। এজন্য ঘরে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল। কিন্তু মদের (সুধারসের) ভাণ্ড থেকে হাল্কা চাঁদনীর মত এক আলো বিচ্ছুরিত হয়ে ডাক্তার ঘোষ আর তাঁর বন্ধুদের দেহের ওপর পড়ছিল। ডাক্তার সাহেবের দেহের ওপর পড়া জলকণা আর তার দ্যুতি এই আলোক ধারায় আরো বেশী যেন প্রকট হয়ে উঠছিল।

তৃতীয় গেলাস পান করা মাত্র, চারজনের চালচলনে যৌবনের উন্মাদনার ঢেউ উঠতে লাগল। তখন ওঁদের উদ্ভিন্ন যৌবন। প্রসন্নতার আবেগ হৃদয়ে আর বন্দী থাকতে পারছিল না। শোক, পীড়া আর বার্ধক্যের জরা ওঁদের কাছে তখন স্বপ্নের মত। যে অবস্থাকে

ওঁরা সময়ের পরতে পরতে অতিবাহিত হতে দেখেছেন। সব জিনিসেই তখন একটা বিশেষ ঔজ্জ্বল্য ওঁদের নজরে পড়ছিল। এই আত্মিক চেতনা থেকে ওঁরা সময়ের আগেই বঞ্চিত হয়েছিলেন, যার অভাবে এই মোহিনী পৃথিবী ওঁদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে একটা অস্পষ্ট ছবির মতই অধরা থেকে গেছিল আজ পুনরায় তা ওঁদের ওপর কামনার যাদু বিস্তার করতে লাগল। ওঁরা অনুভব করলেন—এই নতুন পৃথিবীতে আমরা নবীন অস্তিত্ব। সকলেই টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন—আমরা এখন তরুণ যোয়ান হয়ে গেছি। সত্যিসত্যিই, এ ছিল যেন এক লাগামছাড়া তারুণ্যের জমায়েত। যাঁরা জীবন ও যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে উন্মত্ততায় প্রবৃত্ত করেছিল। আশ্চর্য এই যে, এ সময়ে ওঁরা ওঁদের মনোবিনোদনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন নিজেদের বার্ধক্যদশাকে, যার থেকে খানিক আগেই ওঁরা মুক্তিলাভ করেছেন। বার্ধক্যের দুর্বলতাকে নিয়ে উপহাস করতে লাগলেন। নিজেদের বৃদ্ধাবস্থার হৃতশ্রী পোশাকগুলোর দিকে তাকিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। যেন ঋতু পরিবর্তনে এসেছেন এমন এক বৃদ্ধ মানুষের নকল করে এক সাহেব ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে হাঁটতে লাগলেন এক মহাশয় বয়স্ক লোকের মত নাকের ডগায় চশমা এঁটে যাদুবিদ্যার বইটাকে মন দিয়ে পড়ার ভান করতে লাগলেন। একটা আরামকেদারায় বসে পড়ে ডাক্তার ঘোষের বার্ধক্যের দৃঢ়তার নকল করতে লাগলেন তৃতীয় সাহেব। তারপর সবাই মিলে বগল বাজাতে বাজাতে ঘরের মধ্যে নাচানাচি শুরু করে দিলেন। শ্রীমতী চঞ্চল এবার সিনেমার নায়িকার ঢঙে ডাক্তার সাহেবের কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর গোলাপী মুখমণ্ডলে মোহিনী নারীর ছলা-কলার আবেশ জড়ানো। মদির নয়নে ডাক্তার সাহেবকে উনি অনুরোধ জানালেন—ওগো ডাক্তার, উঠে দাঁড়াও, আমার সঙ্গে এবার যে তোমায় নাচতে হবে···।

ডাক্তার সাহেব বিনম্র কণ্ঠে বললেন—আমাকে মাফ কর সুন্দরী। আমি বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ। গেঁটো বাতে আমার একেবারে নাজেহাল অবস্থা। আমি মরেই আছি বলা যায়। নাচার দিন কি আর আমার

আছে ? কবেই সে পার করে এসেছি। কিন্তু এই নবীন যুবা পুরুষদের যে কেউ তোমার সঙ্গে নাচার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারে।

ইত্যবসরে ঠাকুর সিং হাঁক পাড়লেন—চঞ্চল, আমার সঙ্গে নাচো।

বাবু দয়ারাম—না, না, আমার সঙ্গেই তুমি নাচো।

লালা কড়োরীমল বললেন—বাহ্ঃ আমি হলাম গিয়ে ওর পুরোনো দোস্ত্। পঞ্চাশ বছর আগে ও আমাকে কথা দিয়েছিল, আমার সঙ্গে নাচবে ?

এরকম কথা কাটাকাটি করতে করতে তিনজনেই হুমড়ি খেয়ে প্রায় চঞ্চল কুঁয়রের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল। একজন তো অধীর হয়ে ওর হাত দুটোই ধরে ফেললেন। দ্বিতীয়জন জড়িয়ে ধরলেন ওঁর কোমর। আর তৃতীয়জন শ্রীমতী চঞ্চলের সুগন্ধি চুলের সুবাস গ্রহণ করতে বিভোর হয়ে রইলেন। ওঁদের কাণ্ডকারখানা দেখে শ্রীমতী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলেন। ক্ষণে ক্ষণে ওঁর ছলা-কলা পাল্টাতে লাগল। কখনো থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠছিলেন, কখনো বা খিল্‌খিল করে হাসছিলেন। আবার কখনো চপলা বালিকার মত ছটফট করে উঠছিলেন। মাতাল হাওয়ার মত ওঁর উষ্ণ শ্বাস ওঁদের মুখের ওপর ধীরে ধীরে পড়ায় ওঁরা সম্মোহিত হয়ে পড়ছিলেন। তিন রসিকের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে আসার জন্য চঞ্চল কুঁয়র এবার তৎপর হলেন। কিন্তু ওঁর সব চেষ্টাই বিফল হল। এক মায়াবী প্রেমিকার সান্নিধ্যের জন্য তিন প্রেমিকের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সুচারু সংঘর্ষ হয়তো কেউ খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু ঘরে টাঙানো প্রমাণ মাপের আয়নার প্রেক্ষাপটে তখন অন্য আর এক করুণ ছবি চিত্রিত হচ্ছিল। সে ছবিটি ছিল, তিন প্রাচীন আর জীর্ণাবস্থায় বৃদ্ধ, এক ন্যুব্জকটি, রূপহীনা জীর্ণা বৃদ্ধার সঙ্গ লাভের জন্য কণ্ঠলগ্ন হতে চাইছেন।

কিন্তু ওঁরা ছিলেন নবীন যুবক। ওঁদের উল্লাসই তার সাক্ষ্য বহন করছিল। শ্রীমতি চঞ্চল কুঁয়র এই প্রণয়ী প্রতিযোগীদের অশালীন ভাবভঙ্গিতে ঘৃণায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অত্যন্ত রাগত দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকালেন। সুন্দরী প্রেমিকার দেহলগ্ন হয়ে ওঁরা তিন প্রতিযোগী

তখন একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। হাতাহাতি থেকে ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। আর এই হট্টগোলের হুজ্জতিতে ধাক্কা লেগে টেবিলটা হঠাৎই গেল উল্টে। সুধারসের জারটা মাটিতে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর সেই সুধারসের ধারা চকচকে স্রোতের মত মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। একটা আধমরা প্রজাপতি মাটিতে পড়ে ধুঁকছিল। স্রোতের ধারার পরশ পেতেই ওটা ফর্‌ফর্‌ করে উড়ে গিয়ে ডাক্তার সাহেবের টুপির ওপর বসল। ডাক্তার ঘোষ এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন—ব্যস, ব্যস, বন্ধুগণ অনেক হয়েছে!

চঞ্চল কুঁয়র তুমিও ক্ষান্ত হও। ঢের লাফালাফি সব করেছ। এই হুজ্জুৎ হাঙ্গামা আমার একদম বরদাস্ত হয় না! ডাক্তার ঘোষের কথা শোনা মাত্র ওঁরা সবাই চুপ মেরে গেলেন। ওঁদের হৃদ্‌কম্পন শুরু হল। ওঁদের মনে হল—অতি প্রাচীন সময় আমাদের সজীব শ্যামলিমা থেকে আবার সেই অন্ধকার শীতল গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওঁরা ক্লান্ত চোখে ডাক্তার ঘোষের দিকে তাকালেন। পঞ্চাশ বছর আগের সেই প্রাচীন ফুলটাকে নিয়ে উনি পূর্ববৎ বসে ছিলেন। ওঁর ইঙ্গিত মাত্র উত্তেজনার তরঙ্গে উদ্বেলিত চার উন্মাদ নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। যদিও ওঁরা যেমন ছিলেন, কিন্তু এই সংঘর্ষ এবং মূঢ় উন্মাদনা ওঁদের ক্লান্ত করে দিয়েছিল।

ডাক্তার ঘোষ ফুলটির সান্ধ্যকালীন ঝিমিয়ে পড়া দশা দেখে বললেন—দুঃখের বিষয় এই যে, ফুলটা আবার মুষড়ে পড়েছে। অথচ একটু আগেও এটা কিন্তু পুরোপুরিই তাজা ছিল। জারের জলে ফেলার আগে ফুলটার যেমন দশা ছিল, দেখতে দেখতে নিজেদের অজান্তেই আগত বন্ধুদের দশা তেমন শুষ্ক, জীর্ণ হয়ে উঠল। ডাক্তার ঘোষ ফুলটার পাপড়িতে লেগে থাকা জলকণাগুলোকে নাড়িয়ে ফেলে দিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁটে সেটাকে স্পর্শ করে বললেন—আমার কাছে আজও এটা আগের মতই তাজা আর সুগন্ধি। ডাক্তার সাহেবের মুখ থেকে একথা বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপতিটা টুপি থেকে উড়ে

গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

ডাক্তার সাহেবের বন্ধুদের শরীরে আবার কম্পন শুরু হল। অদ্ভুত ধরনের এক শীতলতা, বুঝতে পারছিলেন না ওঁদের দেহের ওপর দিয়ে, না মনের ওপর দিয়ে, বয়ে যেতে লাগল। ওঁরা একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওঁদের মনে হতে লাগল, প্রতিটি মুহূর্ত, ওঁদের যৌবন কুসুমকে দলে মুচড়ে তার জায়গায় একটা একটা করে গভীর চিহ্ন এঁকে চলেছে। তাহলে, এটা ছিল কি পুরোপুরিই দৃষ্টি-বিভ্রম! আয়ু সীমার পরিবর্তনগুলোকে তবে কি মুষ্টিমেয় ক'টি মুহূর্তে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল! আর ওঁরা সবাই আগের সেই চার জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, যাঁরা ওঁদের পুরনো বন্ধু ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে বসে ছিলেন! অপরিসীম লজ্জায় ওঁরা বলে উঠেছিলেন—কি বন্ধু, আমরা কি এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলাম?—হ্যাঁ, ওঁদের যৌবন তখন বিদায় নিয়েছিল। এই সুধারসে, সুরার নেশার চেয়েও অধিক প্রভাব ছিল! এর থেকে উৎপন্ন প্রভাব কেবলমাত্র ভীতিতেই পর্যবসিত হয়েছিল। চঞ্চল কুঁয়র এক বিবশ দশায় নিজের কুঞ্চিত-মুখ জরাগ্রস্ত দুটি হাতে ঢেকে ফেললেন। ওঁর মনে এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা জেগে উঠল —সৌন্দর্য যদি না থাকল তাহলে আমার এই কুৎসিত দেহের ওপর কফিনের ঢাকনা কেন না পড়ে যায়! ডাক্তার সাহেবের সদুপদেশের এই একটি মাত্র সৌন্দর্য ওঁর মধ্যে তখনও বাকী থেকে গেছিল।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর ডাক্তার ঘোষ বললেন—বন্ধুগণ! দুঃখের বিষয়, তোমরা আবার বুড়ো হয়ে গেছ। দেখ, সুধারসে মাটি ভিজে গেছে, কিন্তু এর জন্য আমার আর কোন আক্ষেপ বা দুঃখ নেই। কারণ, অমৃতধারা যদি আমার দোরগোড়া দিয়েও তরঙ্গিণী হয়ে বয়ে যায়, তবু তা দিয়ে আমি আমার ঠোঁটটুকু পর্যন্ত ভেজাব না। চাই তাতে মুহূর্তের বদলে তার আবেশ (নেশা) বছরের পর বছর থাক না কেন। তোমাদের অসীম অনুগ্রহে যথেষ্ট শিক্ষালাভই আমার হয়েছে।

এত কিছুর পরেও ডাক্তার ঘোষের বন্ধুদের কিন্তু এই শিক্ষা হয়নি। ওঁরা অমৃতধারাতে যাবার স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন—যেখানে, ওঁরা সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ইচ্ছামত আকণ্ঠ সুধারস পান করে জীবনভর নিরবচ্ছিন্ন যৌবন-সুখ ভোগ করতে পারেন।

[মূল উর্দু নাম 'আবে-হায়াৎ]